লালত্রিকোণ

নারায়ণ সান্যাল

লাল ত্রিকোণ

boiRboi.net

দে' জ পা ব লি শিং ॥ ক ল কা তা ৭ ০ ০ ০ ৭৩

প্রথম দে'জ সংস্করণ :
বইমেলা
ফেব্রুয়ারি ১৯৮৫

দ্বিতীয় সংস্করণ
অক্টোবর ১৯৯০

প্রকাশক :
শ্রীসুধাংশুশেখর দে
দে'জ পাবলিশিং
১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট
কলকাতা ৭০০০৭৩

প্রচ্ছদ :
বিজন ভট্টাচার্য

প্রথম প্রকাশ :
ডিসেম্বর ১৯৭৫

মুদ্রাকর :
শ্রীরামেশ্বর মিশ্র
বাসন্তী প্রিন্টিং
৩৩ গোবাচাঁদ বোস রোড
কলকাতা ৭০০০০৬

boiRboi.net

দাম : ৪০ টাকা
Rupees Forty only

কৈফিয়ৎ

শরদিন্দু তাঁর 'ঝিন্দের বন্দী' উপন্যাসে নামকরণের মাধ্যমেই গ্রন্থটির বংশ-পরিচয় জানিয়েছিলেন, আমার এ উপন্যাসে সে-জাতের নামকরণ করা হয়নি, তাই গোত্রটা কৈফিয়তে স্বীকার করতে হচ্ছে। বিখ্যাত মার্কিন লেখক আর্ভিং ওয়ালেস্-এর 'সেভেন মিনিটস্' কাহিনী অবলম্বনে 'অশ্লীলতার দায়ে' উপন্যাস রচনা করছি শুনে আমার এক বন্ধুপত্নী আমাকে বলেন 'সেভেন মিনিটস্'-এর চেয়েও তাঁর কাছে ভালো লেগেছে একই লেখকের লেখা Dr. Chapman's Report. বইটি আমার পড়া নেই শুনে তিনি তাঁর আলমারি থেকে বইটি পেড়ে আমাকে পড়তে দেন। বন্ধুপত্নীর কাছে আমি কৃতজ্ঞ, কারণ ঐ গ্রন্থটিই এ উপন্যাসের মূল-প্রেরণা। কৃতজ্ঞতার দ্বিতীয় হেতু বইয়ের গায়ে তাঁর নাম লেখা ছিল না এবং বইটি তিনি ফেরত চাননি।

বইটির প্রথম পৃষ্ঠাটি উধাও হয়ে গেছে। তাই দ্বিতীয় পৃষ্ঠা থেকেই পড়তে হবে।

boiRboi.net

1. **শিশু ও কিশোর সাহিত্য** : কালোকালো,* শার্লক হেবো, কিশোর অমনিবাস, অরিগ্যামি, নাকউঁচুঃ, ডিজনেল্যাণ্ডঃ, হাতি আর হাতি। 2. **সদ্য-সাক্ষর সাহিত্য** : গ্রাম্যবার্ত্ত, পরিকল্পিত পরিবার, দশেমিলি। 3. **না-মানুষ-আশ্রয়ী** : গজমুক্তা,* তিমি-তিমিঙ্গিল, না-মানুষের ×[পাঁচালী,* কাহিনী,* 'বিশ্বকোষ' (প্রথম খণ্ড)*]। 4. **বিজ্ঞান-আশ্রয়ী** : বিশ্বাসঘাতক * হে হংসবলাকা, অবাক পৃথিবী, নক্ষত্রলোকের দেবতাত্মা, আজি হতে শতবর্ষ পরে। 5. **শিল্প-স্থাপত্য-ভাস্কর্য-আশ্রয়ী** : অজন্তা অপরূপা, কারুতীর্থ কলিঙ্গ, ভারতীয় ভাস্কর্যে মিথুন, লা-জবাব দেহলী অপরূপা আগ্রা, রোদ্যাঁ* Erotica in Indian Temples, প্রবঞ্চক * 6. **ভ্রমণ-আশ্রয়ী** : দণ্ডকশবরী, পথের মহাপ্রস্থান,* জাপান থেকে ফিরে,* 7. **স্মৃতিচারণধর্মী** : পঞ্চাশোর্ধ্বে,* ষাট-একষট্টিং। 8. **মনোবিজ্ঞান-আশ্রয়ী** : অন্তর্লীনা,* তাজের স্বপ্ন*। 9. **গোয়েন্দা-কাহিনী** (কাঁটা সিরিজ) : [সোনার+মাছের*+পথের*+ ঘড়ির + উলের + কুলের*+অ-আ-ক খুনের* + সারমেয় গেণ্ডুকের*] কাঁটা। 10. **প্রয়োগবিজ্ঞান/গবেষণামূলক** : বাস্তুবিজ্ঞান, Handbook of Estimating, নেতাজী রহস্য-সন্ধানে,* চীন-ভারত লঙমার্চ, গ্রামোন্নয়ন কর্ম-সহায়িকা, গ্রামের বাড়ি,...পয়োমুখম্। 11. **উদ্বাস্তু-আশ্রয়ী** : বকুলতলা পি. এল. ক্যাম্প, বর্ণীক, অরণ্যদণ্ডক*। 12. **ইতিহাস-আশ্রয়ী** : মধ্যকালের মন্দির, আনন্দস্বরূপিণী, লাডলি বেগম,* হংসেশ্বরী। 13. **জীবনী-আশ্রয়ী** : [আমি নেতাজীকে,*+আমি রাসবিহারীকে]×দেখেছি, লিওবার্গ*। 14. **দেবদাসী বিষয়ক** : সুতনুকা [একটি দেবদাসীর নাম+কোন দেবদাসীর নাম নয়]। 15. **উপন্যাস** : ব্রাত্য, মনামী, অলকনন্দা, সত্যকাম, নীলিমায় নীল * নাগচম্পা,* পাষণ্ড পণ্ডিত,* আবার যদি ইচ্ছা কর, অশ্লীলতার দায়ে, লক্ষ্মী ত্রিকোণ,* প্যারাবোলাস্যার, মিলনান্তক, পূরবৈয়াঁ, অচ্ছেদ্য বন্ধন, ছয়তানের ছাওয়াল।

সদ্য-প্রকাশিত :

রূপমঞ্জরী ১ : অষ্টাদশ-শতাব্দীর পটভূমিকায় সুবৃহৎ ঐতিহাসিক উপন্যাস।

না-মানুষী 'বিশ্বকোষ'* (দ্বিতীয় খণ্ড) : শুক্তপায়ী বাদে যাবতীয় মেরুদণ্ডী প্রাণী।

আবার সে এসেছে ফিরিয়া : হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত লেখক নার্সিংহোম থেকে প্রত্যাবর্তনের পর রচনা করেছেন (1989)।

BanglaBook.org

* তারকা-চিহ্নিত রচনা আমাদের প্রকাশনা। অন্যান্য গ্রন্থও আমাদের পুস্তক-বিপণীতে পাওয়া যায়।

www.boiRboi.net

একটা কর্কশ যান্ত্রিক শব্দ। মনে হল, কে যেন ওর মাথায় ক্রমাগত হাতুড়ির বাড়ি মারছে। ঘুমটা ভেঙে যায়। মাথাটা ভার। উঠে বসল করবী তার বিছানার উপর। টেলিফোনটা বাজছে। অনেকক্ষণ ধরে! প্রথমেই নজরে পড়ল ড্রেসিং-টেবিলের উপর রেডিয়াম-ডায়াল ঘড়িটার দিকে। সওয়া আটটা। এতটা বেলা পর্যন্ত ঘুমিয়েছে সে! আশ্চর্য!

—ক্রিরিং ক্রিং···ক্রিরিং ক্রিং···

হাত বাড়িয়ে রিসিভারটা তুলে নিতে বাধ্য হল, হ্যালো!

—সুপ্রভাত। বাথরুমে ছিলে নাকি?

—কে প্রমীলাদি? না, ঘুমুচ্ছিলাম।

—এত বেলা পর্যন্ত? শরীর ভাল তো?

—হ্যাঁ, শরীর ঠিকই আছে। কাল রাতে ঘুম আসছিল না, শেষ রাতে দুটো ঘুমের ট্যাবলেট খেয়েছিলাম।

প্রমীলাদি ও-প্রান্তে যে শব্দটা করলেন সেটা বাংলা বর্ণমালায় প্রকাশ করা কঠিন—'স্ত'! স্ত' বা ঐ জাতীয় কিছু—অর্থাৎ জিহ্বা এবং তালু সহযোগে একটু সহানুভূতির আভাস! অর্থাৎ···'আহা! ঘুম তো না আসতেই পারে! ঘুমের আর দোষ কী! যে সর্বনাশ নেমে এসেছে তোমার জীবনে তা যেন শত্রুরেরও না হয়!' এত কথা বলার বদলে প্রমীলাদি ঐ 'স্ত-স্ত' প্রয়োগ করলেন। এইটেই একেবারে অসহ্য করবীর কাছে—ঐ সহানুভূতির ন্যাকামি! একটু বিরক্তি তাই যেন ফুটে উঠল ওর কণ্ঠস্বরে, সে যাই হোক, ফোন করেছিলেন কেন?

—জানতে—যে, এ পর্যন্ত ক'জনকে তুমি ফোনে পেয়েছ?

করবী একটু অপ্রস্তুত। বেচারী এ যাবৎ কিছুই করেনি। কাল সারাটা দিন। বাধ্য হয়ে সে ডাহা মিথ্যার শরণ নেয়; একটাও করে উঠতে পারিনি প্রমীলাদি ···ইয়ে হয়েছে···কাল সারাদিন আমার ফোনটা ডেড ছিল। আজ চালু হয়েছে দেখছি; আপনি ব্যস্ত হবেন না, এখনই সবাইকে জানিয়ে দিচ্ছি।

—তাখ দিকিন কাণ্ড! আর মাত্র তিনটে দিন বাকি, অথচ মেম্বাররা এখনও খবরটাই জানল না···

—না, না, খবর পাবে না কেন? নিমন্ত্রণ-পত্র তো সব ছাড়া হয়ে গেছে—

boiRboi.net

ও-প্রান্তে প্রমীলাদির কণ্ঠস্বরে বুঝি অভিমান পুঞ্জীভূত হয়েছে। বললেন, পোস্টাল ডিপার্টমেণ্টের উপর অতটা ভরসা থাকলে আর তোমাকে কষ্ট দেব কেন, করবী ?

—নাঃ! কষ্ট আবার কিসের ? ঠিক আছে, এখনই ফোন করতে শুরু করছি।

—আমাকে বেলা একটা নাগাদ রিং-ব্যাক করে জানিয়ে দিও যদি কাউকে জানানো বাকি থাকে, কেমন ?

—ঠিক আছে।

—থ্যাঙ্কু! সো লঙ্—টেলিফোনটা ও-প্রান্তে নামিয়ে রাখার শব্দ হল।

করবীও অব্যাহতি পেল। উঠে গেল বাথরুমের দিকে।

আধঘণ্টা পরে। ধূমায়িত কফির কাপটা হাতে নিয়ে করবী এসে বসেছে তার টেবিলে। ইতিমধ্যে তার মুখ-হাত ধোওয়া সারা। বাসি শাড়িটা পালটায়নি। সকালে এক কাপ কফি খেয়ে তারপর সে স্নানে যায়। আজ তার আগে টেলিফোনগুলো সারতে হবে। গরম কফির কাপে একটা চুমুক দিয়ে সে খুলে বসে প্রমীলাদির রেখে যাওয়া খামটা। লম্বাটে খাম। তার গর্ভে দুখানি কাগজ। একটা ফিরিস্তি—লালগড় মহিলা-সমিতির জনাদশেক সভ্যার নাম আর টেলিফোন নাম্বার টাইপ করা আছে। দ্বিতীয় কাগজখানা একটা বিজ্ঞপ্তি ; আমন্ত্রণ-লিপিও বলা চলে। আগেও দেখা ছিল, তবু আর একবার চোখ বুলিয়ে নিল করবী। দশজনই ওর পরিচিতা—কেউ ঘনিষ্ঠভাবে, কেউ মুখচেনা। সকলেই এই লালগড়-উপনিবেশের বাসিন্দা। মহিলা-সমিতিতেই আলাপ, কেউ বা প্রতিবেশী, কেউ বন্ধুস্থানীয়া। তালিকাটি হাতে নিয়ে করবীর মনে পড়ল পরশুদিন সন্ধ্যার কথা। যখন প্রমীলাদি ওর দ্বারস্থ হয়েছিলেন এই অনুরোধটা জানাতে। সবটা শুনে প্রথমে আপত্তি করেছিল করবী ; কিন্তু তার আপত্তি ধোপে টেকেনি।

প্রমীলাদি জানতে চেয়েছিলেন, তোমার আপত্তির মূল হেতুটা কী ?

আসল কারণটা এড়িয়ে করবী বলেছিল, আমার এসব ভাল লাগে না।

—এক্জ্যাক্‌টলি। আমিও তাই আশঙ্কা করেছিলাম। তুমি এতটা মডার্ন যে, অন্য কোনও কারণে তুমি আপত্তি করবে না। আমি জানতাম। ভাল লাগে না। দ্যাট্‌স্ ইট। দেখ করবী, তোমার আপত্তির কারণটা যদি অন্য কিছু হত তাহলে তোমার বদলে আমি অন্য কোনও সভ্যাকে বেছে নিতাম। অবশ্য তার আগে যুক্তি দিয়ে, তর্ক করে তোমাকে স্বমতে আনবার চেষ্টা করতাম—কিন্তু তা তো নয়, কারণটা হচ্ছে : 'ভাল লাগে না'! ওয়েল, এ যুক্তিটা আমি মানব না,

BanglaBook.org

মানতে পারি না। এটা কোনও আগুমেণ্টই নয়! তুমি প্রায় আমার মেয়ের বয়সী। আমার কথাটায় যদি আজ একটু উপদেশের গন্ধ লেগে থাকে তাহলে কিছু মনে কর না, ভাই। তোমার কতই বা বয়স? সাতাশ, আঠাশ? সমস্ত জীবনটাই তো পড়ে আছে তোমার সামনে। 'ভাল লাগে না' বলে একটা 'নেগেশান'কে দিয়ে এতবড় জীবনটাকে তো ভরিয়ে তোলা যাবে না···না, না, আমাকে বলতে দাও, করবী। প্রচণ্ড আঘাত তুমি পেয়েছ, এই সাতাশ বছরের জীবনেই···কিন্তু তুমি তো সাধারণ মেয়ে নও! যে মানুষটাকে তুমি ভালবেসেছিলে, যার ঘরণী ছিলে সেও তো সাধারণ ছিল না,—সে ছিল দশজনের দশমজন! কোন আঘাতেই সে কোনদিন ভেঙে পড়েনি। জীবন-মৃত্যু ছিল তার পায়ের ভৃত্য···

—প্রমীলাদি, আমি বলছিলাম কি···

—না, না, বাধা দিও না। বলতে যখন শুরু করেছি তখন মন খুলে আমাকে সবটা বলতে দাও···তোমার আঘাত প্রচণ্ড, কিন্তু এ বৈধব্যের আঘাত সইবার উপাদানও আছে তোমার চরিত্রে! এক বছর হয়ে গেল, এতদিনে তোমার সামলে নেওয়া উচিত ছিল। তুমি এর পর কী করবে না করবে সেটা তোমার নিজস্ব কথা—সেখানে আমি নাক গলাতে যাব না; কিন্তু 'ভাল লাগে না', বলে জীবনকে তুমি অস্বীকার করতে পার না···নো। য়ু জাস্ট কাণ্ট অ্যাফোর্ড টু···

পুনরায় বাধা দিয়ে করবী বলে উঠেছিল, ঠিক আছে প্রমীলাদি, বলছি তো, আমি রাজি। বেশ, তালিকাটা রেখে যান, আমিই সবাইকে ফোন করে দেব—

—হ্যাটস্ এ গুড গার্ল! কিন্তু সেটা যেন 'উপরোধে ঢেঁকি গেলা' না হয় ভাই। আমাদের মহিলা সমিতিতে তুমিই ছিলে সবচেয়ে উৎসাহী কর্মী। জিতেনের অ্যাক্সিডেন্টের পর তুমি সমিতির কাজ থেকে নিজেকে সরিয়ে নিয়েছিলে—সেটাকে অস্বাভাবিক মনে করিনি আমরা কেউ। কিন্তু এতদিনে তোমার সামলে নেওয়া উচিত। তুমি সমিতিতে আস না কেন? স্কুলে পড়াতে যাও না কেন? থিয়েটারে পার্ট নিলে না কেন?

একসঙ্গে অনেকগুলি প্রশ্নবাণে বিদ্ধ হলে একটা সুবিধা এই যে, যেকোন একটার জবাব দিয়ে বাকিগুলো এড়িয়ে যাওয়া যায়। করবী বলে ওঠে, বলছি তো, এরপর থেকে সমিতির সব মিটিঙে হাজিরা দেব। এই তো, এ দায়িত্বটা স্বেচ্ছায় ঘাড়ে নিচ্ছি। বলুন, আর কী করতে হবে?

সে প্রশ্নের জবাব না দিয়ে প্রমীলা দেবী হঠাৎ একটি অপ্রাসঙ্গিক প্রশ্ন পেশ করে বসেন, ক্যাপ্টেন বসাক চিঠিপত্র দেয় না?

boiRboi.net

করবী সতর্ক হয়। তার ব্যক্তিগত জীবনের প্রশ্নে ঐ মহিলা সমিতির শুঁকো প্রেসিডেন্টের সঙ্গে আলোচনা সে করতে আদৌ প্রস্তুত ছিল না। তাই প্রসঙ্গান্তরে যাবার জন্য বলে, একটা কথা প্রমীলাদি, ডক্টর ত্রিবেদীর এই ব্যাপারটাতে কোনও তরফ থেকে আপত্তি উঠবে না তো?

—উঠবে না? ইতিমধ্যেই উঠেছে যে। দেশটা কী-ভীষণ কুসংস্কারাচ্ছন্ন জান তো? একটা বৈজ্ঞানিক সমীক্ষা হচ্ছে—আউট অ্যাণ্ড আউট অ্যাকাডেমিক অ্যাণ্ড সায়েন্টিফিক ইনভেস্টিগেশান্—অথচ একদল গোঁড়া কন্জারভেটিভ্ কূপমণ্ডূক তারস্বরে চিল্লাতে শুরু করেছেন। বাংলা আর ইংরাজী কাগজে ইতিমধ্যেই চার পাঁচখানা 'লেটার্স-টু-দ্য-এডিটার' বেরিয়েছে, দেখে থাকবে। আমাদের জি. এম. এই সমীক্ষার বিরুদ্ধে! তাঁর স্ত্রী, মানে মিসেস ব্যানার্জি তো ঘোরতর বিরোধী। আমাদের ওয়ার্স-হাফ-অ্যাসোসিয়েশানও এ ব্যাপারে একেবারে খড়্গহস্ত!

সে কথা অনুমান করতে পারে করবী। ওয়ার্স-হাফ-অ্যাসোসিয়েশান বলতে পুরুষদের অফিসার্স ক্লাব। বলে, ওঁদের আপত্তির মূল কারণটা কী? ওঁদের জীবনের কোন গোপন কথা তো প্রকাশ হয়ে পড়ছে না।

—সে কথা বুঝছে কে? পুরুষজাতটাই অমনি! টুথব্রাশটা অপরে ব্যবহার করলেও ততটা আপত্তি করবে না, যতটা ঘরের বউ ইন্টারভ্যু দিতে যাবে শুনলে। আশ্চর্য!

সভ্যাদের নামের তালিকাটা সরিয়ে রেখে এবার সে ঐ বিজ্ঞপ্তি অথবা আমন্ত্রণ-লিপিটা টেনে নেয়। কফির কাপে চুমুক দিতে দিতে আর একবার আদ্যোপান্ত পড়ে নেয়—

"প্রিয় ভগিনী,

আগামী বিশে ডিসেম্বর, শনিবার, সন্ধ্যা ছয়টার সময় স্থানীয় চিত্রলেখা-সিনেমা 'হল'-এ প্রখ্যাত যৌনতত্ত্ববিদ ডঃ কে. আর. ত্রিবেদী, এম. ডি.; এম. আর. সি. ও. জি. লালগড় মহিলা সমিতির শুধুমাত্র 'বিবাহিত' সভ্যাদের এক বিশেষ সম্মেলনে বক্তৃতা দিতে সম্মত হয়েছেন। ডঃ কে. আর. ত্রিবেদীর পরিচয় নিষ্প্রয়োজন। তিনি নিখিল-ভারত-যৌন-সমীক্ষা সমিতির সভাপতি। তাঁর সম্প্রতি প্রকাশিত গ্রন্থ 'লাল ত্রিকোণের প্রথম কোণ—পুরুষ' ইতিহাস রচনা করেছে। জন্মনিরোধ সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহের উদ্দেশ্যে তিনি বর্তমানে সারা ভারতবর্ষ পরিক্রমা করে তাঁর বৈজ্ঞানিক সমীক্ষাকার্যের দ্বিতীয় পর্যায় রচনা করছেন। তিনি এবং তাঁর তিনজন সহকারী—গত দশ মাস ধরে ভারত-

banglainternet.com

ভূখণ্ডের বিভিন্ন প্রত্যন্তদেশে ভারতীয় বিবাহিতা নারীর জন্মনিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত যৌন-সমস্যার একটি সমীক্ষা করে চলেছেন। জনসংখ্যা-বৃদ্ধির সমস্যার মোকাবিলা করতে আমাদের জনপ্রিয় সরকার জন্মনিয়ন্ত্রণকে হাতিয়ার হিসাবে গ্রহণ করেছেন—সমিতি-ভগ্নীগণ এ বিষয়ে সম্পূর্ণ অবহিত আছেন। বস্তুত ঐ পরিকল্পনাকে বাস্তবে রূপায়িত করতে এই মহিলা সমিতি একটি পরিবার পরিকল্পনাকেন্দ্র পরিচালনাও করে থাকেন। ডঃ ত্রিবেদীর মতে—এ সমস্যার সম্বন্ধে পূর্ণ বৈজ্ঞানিক তথ্য সংগৃহীত না হওয়ায় এ প্রকল্প আশানুরূপ সাফল্য অর্জন করতে পারছে না। খাদ্য, বেকারি এবং জনসংখ্যাবৃদ্ধি—জাতীয় জীবনের এই তিনটি মূল সমস্যার সমাধানে ডাঃ ত্রিবেদীর এই সমীক্ষা প্রভূতভাবে ফলপ্রসূ হবে বলে আমরা আশা রাখি। এই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে ডাঃ ত্রিবেদীর উপদেশ শুনতে সমিতির প্রত্যেকটি বিবাহিতা সভ্যা সভায় উপস্থিত হবেন এ বিষয়ে আমরা নিঃসন্দেহ। অবিবাহিতা এবং অপ্রাপ্তবয়স্কাদের জন্য এ সভা নিষিদ্ধ অঞ্চল।

দ্বিতীয়ত, এই প্রসঙ্গে আরও জানানো হচ্ছে যে, ডাঃ ত্রিবেদী এবং তাঁর সহকর্মীরা আগামী দুই সপ্তাহ ধরে এই লালগড়ে তাঁদের সমীক্ষাকার্যের শেষ অধ্যায় রচনা করতে আগ্রহী। অর্থাৎ আমাদের সমিতির প্রত্যেকটি বিবাহিতা সভ্যাকে তাঁর ব্যক্তিগত যৌনজীবনের জন্মনিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত সমস্যা ইত্যাদির প্রসঙ্গে প্রশ্নাদি পেশ করে উত্তরগুলি তিনি লিপিবদ্ধ করতে চান। বলা বাহুল্য, প্রত্যেকটি সভ্যার জীবনের এই গোপনতম সংবাদ নিশ্ছিদ্রভাবে গোপন রাখার পূর্ব-প্রতিশ্রুতি ডাঃ ত্রিবেদী দিয়ে রেখেছেন। প্রত্যেকটি জবানবন্দিই হবে নামগোত্রহীন পরিসংখ্যানের এক পরিচয়হীন উপাদান। এ বিষয়ে যাবতীয় তথ্য ডাঃ ত্রিবেদী তাঁর ভাষণে বলবেন। কোনও সভ্যার অন্তরে কোনও দ্বিধা-সঙ্কোচ বা প্রশ্ন থাকলে, গোপনীয়তা সম্বন্ধে কোন সন্দেহ থাকলে, ভাষণান্তিক প্রশ্নোত্তরকালে সেগুলি তাঁরা পেশ করতে পারেন। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস, কুসংস্কারাচ্ছন্ন প্রতিকূলতার বাধা অতিক্রম করে আমাদের প্রতিটি সভ্যা স্বতঃপ্রণোদিতা হয়ে এই মহান বৈজ্ঞানিক গবেষণাকার্যে সক্রিয় সাহায্য করতে এগিয়ে আসবেন।"

প্রচারপত্রটি এবার নিয়ে তিনবার পড়ল করবী; ইতিপূর্বে তার মনে যে প্রশ্নটি জেগেছিল এবারও তার সমাধান হল না: কে হে তুমি হরিদাস পাল, সারা ভারত দাবড়ে বেড়াচ্ছ—আর অর্গলবদ্ধ ঘরে স্বামী-স্ত্রী শুয়ে পড়েছে দেখলেই মশারি তুলে উঁকি মারছ। তোমার আসল মতলব কী?

ডোর-বেলটা বেজে উঠল। মুন্নির-মা এসেছে নিশ্চয়।

pathagar.net

সদর দরজা খুলে দিতেই দুধের বোতল হাতে এবং ছেলে-কাঁকালে এসে হাজির হল মুন্নির মা : আজও বড় বেলা হয়ে গেলনে বৌদি !

রোজই অবশ্য এ কৈফিয়ৎ দেয় মুন্নির-মা। করবী গা করে না। তার অফিস যাবার তাড়া তো নেই। একা মানুষের সংসার, সে নিজেই চালিয়ে নিতে পারত। শুধু এঁটো বাসন-কোসন মেজে দেওয়া, ঘর মোছা, বাজার করা ইত্যাদি টুকি-টাকির জন্য ঐ ঠিকে-ঝিয়ের ব্যবস্থা। মুন্নির-মা দু-বেলাই আসে। ছোট-ছেলেটাকে কাঁকালে নিয়ে। ঘর-দোরের কাজ সেরে ফিরে যায় নিজের ছাপরায়। আজও সে ছেলেকে কলঘরের সামনে বসিয়ে রেখে বাসন মাজবার উদ্যোগ করছিল, হঠাৎ করবী ডাকল তাকে, এই মুন্নির-মা, এদিকে শোন্ তো।

মুন্নির-মা এগিয়ে আসে, ডাকতিছ কেনে ?

—হ্যাঁরে, তোর বয়স কত রে ?

—বয়স ? ওমা, বয়স নিয়ে কী হবে বৌদি ? তা দেড়কুড়ি হবেনে।

—মুন্নি ছাড়া তো তোর আরও তিনটি বাচ্চা আছে, নয় ?

—হ্যাঁ গো। কেনে ? তোমাদের সেই নালতিকোনের পোকা কি আবার তোমার মাথায় চাগা দিল না কি ?

ঠিক তাই। মাস-কতক আগে মুন্নির-মাকে করবী নিয়ে গিয়েছিল ওদের ফ্যামিলি প্ল্যানিং সেন্টারে। জ্ঞানবৃক্ষের ফলটি আস্বাদন করিয়েছিল। তার ফলাফলটা কী হয়েছে করবী জানত না। আজ ঐ ডঃ ত্রিবেদীর বিজ্ঞপ্তিটা দেখতে দেখতে হঠাৎ মনে পড়ে গেছে ওর। বললে, হ্যাঁ রে ! সেই লাল-ত্রিকোণের পোকাটাই আবার মাথায় চাগা দিয়েছে। তুই তো তারপর কী হল আমাকে বল্‌লি না—

—বলব আবার কি গ ? যাতি বল্‌লে গালাম। শুন্‌তি বল্‌লে শুন্‌লাম।

—হ্যাঁ, তারপর কী হল ? তোকে যে 'নিরোধ' কিনে দিলাম···

—ধূর ! ওসব কথা আমারে আর বলনি বৌদি ! মুন্নির বাবা আমারে শ্যাষ করি ফেলাবে !—মুন্নির-মা ফিরে যাবার জন্য পা বাড়ায়।

—যাস্ নে ! শোন ! এই বল্‌না কী হল ! মুন্নির বাপ রাজী হল না ?

—ধূর ! তাই কি হয় ? আমারে বলিছে কি, ঐ নালতিকোনের আপিসে গেলি গোটা চ্যালাকাঠ আমার পিঠে ভাঙবেনে।

ফিক্ করে হাসে মুন্নির-মা। বলে, আর কতাটাও সত্যি বৌদি। ওসব হ্যাপা তোমাদেরই পোষায় ! আমরা গরীব মানুষ—

boiRboi.net

—ওমা! সে কি রে? কেন? তোকে তো বলেছি এর জন্য একটি পয়সা তোর খরচ হবে না—

—ধূর! তা নয়। ওতে পাপ হয়! মুন্নির বাপ বলিছে কি ওতে ভাবতা রুষ্টু হন! ভগমানের বিধান কি পালটানো যায়?

—ভগবানের বিধান! তাহলে তোর লক্ষ্মীর যখন অসুখ হয়েছিল তখন ছুটে এসেছিলি কেন? লক্ষ্মীকে ওষুধ খাইয়েছিলি কেন?

—কী যে বল বৌদি! সে আর এ? অসুখ করলি ওষুধ খাবেনি?

—কেন খাবে? ভগবান যখন বিয়োগ অঙ্ক কষতে চাইছেন তখন তাঁকে বাধা দেওয়াটা পাপ নয়, আর যখন তিনি যোগ অঙ্ক করতে চাইছেন তখন তাঁকে বাধা দেওয়াটাই পাপ?

মুন্নির-মা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে, অঙ্ক-মঙ্ক আমি বুঝি না বৌদি। —ধীরপদে সে চলে যায় বাসন মাজতে।

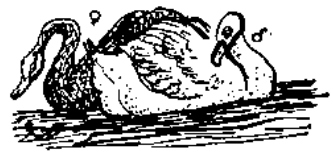

যে ভূখণ্ডে আজ 'লালগড় টাউনশিপ' মাথা তুলে জেগে উঠেছে এক দশক আগে তা ছিল নিতান্ত জঙ্গল। বাঘ বা হরিণ না হলেও বছর দশেক আগে গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড দিয়ে ঐ অরণ্য অংশটা অতিক্রম করার সময় মোটরারোহী দেখতে পেত খরগোশ, বনমুরগী, তিতির আর সজারু। তারপর এলেন প্ল্যানিং কমিশানের বিশারদেরা, সরকারী উদ্যোগে এখানে আধা-সরকারী ব্যবস্থাপনায় কেমিক্যাল ফ্যাকটরি তৈরি হবার প্রস্তাব অনুমোদন হতেই এল বুলডোজার, ক্যারি-অল, লরি, ক্যাম্প আর জীপ। বেশ কয়েক কোটি টাকা ব্যয়ে গড়ে উঠ্‌ল কারখানা এবং তৎ-সংলগ্ন কলোনী। আজ লালগড় কলোনীর লোক-সংখ্যা না হোক বিশ-বাইশ হাজার। পূর্ব-পশ্চিমে মাইল চারেক লম্বা, উত্তর-দক্ষিণে আধমাইল। একদিকে জি. টি. রোড তার সীমানা, অপর দিকে বরাকর। মাঝখানে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে

লালগড়-টাউনশিপের কারখানার চিমনি—রাঙামাটির দেশটাকে কালিমালিপ্ত করার ব্রত নিয়ে যেন। কারখানার সঙ্গেই তৈরি হয়েছে হাসপাতাল, ডাকঘর, পুলিস-থানা, হাই স্কুল। ক্রমে এসেছে সিনেমা হাউস, দোকানপাট, বাস-স্ট্যাণ্ড। দিগন্ত-অনুযায়ী ফাঁকা জমিতে আর্কিটেক্টের কোন অসুবিধা হয়নি। মনের মত করে সে সাজিয়েছে কারখানাটাকে। চওড়া সড়ক, ছাড়া-ছাড়ি বাড়ি, খেলার মাঠ,—টাউনশিপের একপ্রান্তে লাণ্ডিং স্টীপ। স্টাফ-কোয়ার্টার্স গড়ে উঠেছে ছন্দ মেনে। বড় কর্তাদের বাঙলো-টাইপ, মেজ কর্তাদের তিনতলা অ্যাপার্টমেণ্ট টাইপ এবং নিম্নস্তরের কর্মচারীদের জন্য ডর্মিটারি টাইপ। কর্তারা যদি অফিসার্স ক্লাব খুলতে পারেন তবে কর্ত্রীরাই বা কেন পারবেন না মহিলা সমিতি খুলে বসতে? পি. আর. ও-র স্ত্রী মিসেস প্রমীলা দাশগুপ্তাই ছিলেন প্রধান উদ্যোগী। ভদ্রমহিলার ক্ষমতা আছে। দোরে দোরে ঘুরে সদস্য সংগ্রহ করেছেন, কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে জমি এবং আর্থিক সাহায্য সংগ্রহ করেছেন। তৈরী হল মেয়েদের পৃথক ক্লাব ঘর, পৃথক লাইব্রেরী। বছরে একটিবার থিয়েটার করেন ওঁরা—কলকাতা থেকে কোনও স্বনামধন্য সাহিত্যিককে ভাষণ দিতে আনা হয়! অভিনয় দেখতে টিকিট লাগে। অবশ্য চ্যারিটি শো। খরচ-খরচা বাবদ সংকাজেই পেটা ব্যয় করা হয়। একটি অবৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যালয়ও ওঁরা পরিচালনা করেন সমিতির তরফ থেকে। সভ্যারা পালা করে ক্লাস নেন। একটি পরিবার-পরিকল্পনা কেন্দ্রও খোলা হয়েছে বছর দুয়েক।

করবী আদি যুগ থেকেই এই মহিলা সমিতির একজন প্রধান কর্মকর্ত্রী। বস্তুত সমিতির জন্মমুহূর্তে সেই নির্বাচিত হয়েছিল প্রথম সম্পাদিকা বছর চারেক আগে। যখন ওরা প্রথম আসে লালগড়ে। ও আর জিতেন। সদ্যবিবাহিত দম্পতি। তারপর পাঁচ-পাঁচটা বছর কেটে গেছে। এখানেই শুরু হয়েছিল ওর বিবাহিত জীবন, শেষ হল এখানেই। মাত্র চারটি বছরের ব্যবধানে সদ্যবিবাহিতা করবী হল সদ্যবিধবা।

করবী ছিল তার বাপমায়ের অত্যন্ত আদরের একমাত্র সন্তান। বড়লোকের মেয়ে অত্যন্ত সুন্দরী। পড়াশুনাতেও সে বেশ ভালই ছিল। অনেক আশা ছিল ওর বাপ-মায়ের; কিন্তু বাধ সাধল করবী নিজেই। বাপমায়ের অমতে অসবর্ণ বিয়ে করে বসল সে, ভালবেসে। কী চেয়েছিল, আর কী হল! জিতেন বসু অবশ্য সেদিন অনেকেরই কাম্য ছিল। যেমন স্বাস্থ্য, তেমনি প্রাণবন্ত উচ্ছল তরুণ। দুর্ধর্ষ, বেপরোয়া, দুঃসাহসী। মেয়ে-মনকে যা সহজেই টানে।

BanglaBook.org

ফ্লাইং ক্লাব থেকে সদ্যপাশ পাইলট। ওর বাপমায়ের আপত্তিও ছিল সেই কারণেই; কিন্তু একগুঁয়ে মেয়েটা সেদিন কারও পরামর্শে কান দেয়নি। অসবর্ণ বিবাহ করেছিল রেজিস্ট্রি অফিসে গিয়ে। মা মানিয়ে নিতে চেয়েছিলেন, কিন্তু অভিমানক্ষুব্ধ বাপ রাজী হননি। কিছুদিন অপেক্ষা করলে জিতেন হয়তো কোন এয়ার-সাইন্স-এ ভাল চাকরি জোগাড় করতে পারত—কিন্তু বেপরোয়াভাবে হঠাৎ বিবাহ করে বসায় বাধ্য হয়ে সে ঝড়ের মুখে যেকোন-বন্দর আইনে যোগ দিয়েছিল এই লালগড়ের চাকরিতে। কোম্পানি এককথায় ওকে নির্বাচন করেছিল মোটা মাইনেয়—ওদের নিজস্ব বিমান কেনার পর। ভাল কোয়ার্টার্স পেয়েছিল ওরা। কাজের চাপও এমন কিছু বেশি নয়। সপ্তাহে বার-দুই বিমান নিয়ে যেতে হত কলকাতা অথবা দিল্লী। কর্তাব্যক্তিদের আনা-নেওয়ার ব্যাপারে। কিন্তু রক্তে যার ঝড়ের মাতন সে কেন সন্তুষ্ট থাকবে এই বাঁধা-ধরা নিয়মে? ঐ সময়েই বাধল কালযুদ্ধ। ভারত-পাকিস্তান সীমান্ত বিরোধ। করবীকে না জানিয়ে রাতারাতি নাম লেখালো জিতেন সামরিক দপ্তরে। বমার প্লেন চালাতে হবে তাকে। দুশমনের সঙ্গে সে মোকাবিলা করতে চায়! কোনও মানে হয়? লালগড় টাউনশিপের অফিসার্স ক্লাব বিরাট ভোজ দিল। ফুলের মালায়-মালায় জিতেনের মুখটা ঢেকে গিয়েছিল সেদিন।

সতের দিনের কালযুদ্ধ শেষপর্যন্ত থামল একদিন। জিতেন বসু কিন্তু ফিরে এল না সে যুদ্ধ থেকে। করবী রাতারাতি হয়ে গেল শহীদের সদ্যবিধবা। ডাক পড়ল দিল্লি থেকে—মরণোত্তর সম্মান গ্রহণ করতে।

ছুটে এলেন ওর বাবা-মা। এমন দুঃসময়ে কি অভিমান করে মুখ ফিরিয়ে থাকা যায়? কিন্তু নিজ আত্মজাকে দেখে যেন চিনতেই পারলেন না আর। অদ্ভুত পরিবর্তন হয়ে গেছে করবীর। প্রথমটায় মনে হয়েছিল—এতবড় আঘাতে সে বুঝি বজ্রাহত হয়ে গেছে। কিন্তু ক্রমশ তাঁরা দেখলেন, না—মেয়েটা আত্মহারা উন্মাদ হয়নি মোটেই। সে যেন একদিনে অনেকটা বুড়িয়ে গেছে মাত্র। আর কিছু নয়। কোথায় মেয়েকে তাঁরা সান্ত্বনা দেবেন, তা নয়, মেয়েই তাঁদের বললে—এমন উতলা হয়ে পড়ছ কেন তোমরা? এমনটা যে ঘটতে পারে তা তো জানাই ছিল। আর সত্যিকথা বলতে কি, এই আশঙ্কা ছিল বলেই তোমাদের এতটা আপত্তি ছিল আমার বিয়েতে, অসবর্ণ বলে নয়, তাই নয় কি?

কী জবাব দেবেন ওঁরা বুঝে উঠতে পারেননি। উত্তর দিতে হয়নি তাঁদের, মেয়েই বুঝিয়ে বলেছিল, এভাবে আমাকে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে এসেছ কেন? যেতে

boiRboi.net

তো একদিন হবেই। কিন্তু তার আগে এদিককার সব ব্যবস্থা করে যাওয়াই ভাল নয় কি ?

ওর বাবা—যিনি ওর মুখদর্শন করবেন না বলে প্রতিজ্ঞা করে বসেছিলেন একদিন—বিহ্বল হয়ে প্রশ্ন করেন, এ-দিককার ব্যবস্থা মানে ?

—ওর কম্‌পেন্‌সেশানের টাকা, লাইফ ইন্সিওরেন্স, প্রভিডেন্ট ফাণ্ড, ডেথ গ্র্যাচুইটি। গাড়ি, ফ্রিজ, রেডিওগ্রাম, ইত্যাদিগুলোও যতদূর পারি বেচে ঝাড়া-হাত-পা হয়ে যাই।

সদ্যবিধবার এমন বৈষয়িক কথায় কেমন যেন বিব্রত বোধ করেছিলেন ওর বাবা। ভাবখানা—আরে বাপু, সে-সব তো আছেই, তা তুইও জানিস, আমিও জানি; কিন্তু প্রথমটায় কিছুদিন ও-সব চিন্তা বাদ দিলেই জিনিসটা দ্যাখ্‌তাই শোভন হত না ? ধেড়ে মেয়েকে তো আর সে কথা বলা যায় না; তাই বললেন, সে-সব ব্যবস্থা তো আমার ওখান থেকেও করতে পারিস ?

—তা পারি; তবে দূর থেকে চিঠিপত্র লেখালেখি করলে শুধু শুধু দেরী হবে। এখানে মাস-ছয়েক থেকে গেলেই সব ব্যবস্থা নিজে করে যেতে পারব।

—এই কোয়ার্টার্সে ওরা তোকে ছ'মাস থাকতে দেবে ?

বিচিত্র হেসে করবী বলেছিল, দেবে! আমি যে শহীদের সদ্যবিধবা!

এরপর আর কথা বাড়াননি ওঁরা। একটু যেন মর্মাহতই হয়েছিলেন। এর চেয়ে বুকফাটা কান্নায় করবী ভেঙে পড়লে যেন খুশি হতেন তাঁরা। ঠিক আছে, উপযুক্ত মেয়ে, সে যা ভাল বোঝে তাই করুক। মাস-ছয়েক পরেই না হয় আবার নিতে আসবেন।

কিন্তু তা-ও হয়নি। ছয় মাস পার হয়ে বছর ঘুরে এল প্রায়। করবী এই কোয়ার্টার্সেই রয়ে গেছে। আগে জিতেনের পে-রোল থেকে বাড়ি ভাড়া কাটা যেত—বর্তমানে ভাড়াটা করবী মাসান্তে নগদে দেয়। এস্‌ট্যাব্লিশ্‌মেণ্ট সেকশান থেকে কোন আপত্তি হয়নি। কেউ তাকে বাড়ি ছেড়ে দেবার জন্য নোটিশ্ দেয়নি। দেবে না, জানত করবী। জি. এম. স্বয়ং এসে এ ব্যবস্থা অনুমোদন করে গিয়েছিলেন যে একদিন।

জিতেন বসু মারা যাবার সপ্তাহদুয়েক পরে জেনারেল ম্যানেজার ডঃ ত্রিদিবেশ ব্যানার্জির কালো মার্সেডিসখানা এসে দাঁড়িয়েছিল ওর বাঙলোর সামনে। মুন্নির-মা ছুটতে ছুটতে এসে বলেছিল, বড়সাহেব এসেছেন বৌদি। মেমসাহেবেরাও এসেছেন।

boiRboi.net

করবী তখন ওর বাড়ির সামনের লনে ফুলগাছের গোড়া খুঁড়ে দিতে ব্যস্ত ছিল। কাদামাখা হাতেই উঠে এসেছিল সে।

ফ্যাক্টারির খোদকর্তা অত্যন্ত রাশভারী মানুষ। বছর পঞ্চান্ন বয়স, দেখলে যদিও মনে হয় চল্লিশের কোঠায়। সুন্দর স্বাস্থ্য। পোশাক-পরিচ্ছদ নিখুঁত, ছিমছাম। এখনও র‍্যাকেট ধরলে একাদিক্রমে তিন-চার সেট্ খেলে থাকেন। জিতেনের মৃত্যু সংবাদ আসার পর করবীর সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হয়েছে—সেটা ছিল অফিসিয়াল। এখন এই জনান্তিক-ভাষণে তিনি কীভাবে সান্ত্বনার কথা বলবেন তা বুঝে উঠ্‌তে পারেননি। বোধকরি সেজন্যই একেবারে একা একা আসতে পারেননি। স্ত্রী ও কন্যাকেও নিয়ে এসেছিলেন সঙ্গে করে। গাছ-কোমর করে শাড়ি-জড়ানো খুরপি হাতে করবীকে দেখে মামুলী কথোপকথনের ভঙ্গিতেই শুরু করেন, বাগান করছিলে বুঝি? ভেরি গুড! গাছ-গাছড়ার শখ থাকাটা খুব ভাল। আমি রত্নাকে প্রায়ই বলি আমাদের কম্পাউণ্ডে—

বাধা দিয়ে জি এম. তনয়া শ্যামলী বলে ওঠে, আমাদের কম্পাউণ্ডে ঢ্যাঁড়শ গাছের পরিচর্যা তো মালিতেই করে ড্যাডি; মা আর কী করবে?

—সুপারভাইজ করবে। শুধু তাই বা কেন? মাঝে মাঝে নিজেই হাত লাগাবে। হাতে কাদা-মাটি মাখবে। করবীও তো ইচ্ছে করলে মালি রেখে কিচেন-গার্ডেন করতে পারে; কিন্তু করছে কি? কই চল, চল দেখি কী কী লাগিয়েছে! এ কী এ যে সবই ফুলের চারা। সব্‌জি লাগাওনি? নাকি, সেটা ব্যাক-ইয়ার্ডে?

ঝারির জলে হাতটা ধুতে ধুতে করবী বলে, না, সবই ফুলের গাছ। আনাজ-পাতি লাগাইনি।

—হ্যাটস্ ব্যাড! 'গ্রো-মোর-ফুড' ক্যাম্পেনকে সাবোটেজ করছ তুমি?

করবী জবাব দেয়নি। হাসি-হাসি মুখে আঁচলে হাতটা মুছতে থাকে।

শ্যামলীই তার পক্ষ নিয়ে বলে, এতবড় ভারতবর্ষে করবীদির ঐটুকু জমিতে ঢ্যাঁড়শ চাষ হলেই কি ফুড প্রব্লেম সল্‌ভ্‌ড্ হয়ে যাবে?

—না, তা যাবে না, তবে সকলেই যদি ঐ কথা মনে করে দুধের পুকুরে জল ঢালে, তবে দুধের পুকুরে শুধু জলই থাকবে!

এতক্ষণে করবী যোগ দেয় আলোচনায়, তা কিন্তু বাস্তবে হতে পারে না, ডক্টর ব্যানার্জি। আমি যে ইনকাম-গ্রুপে আছি সেটা অতি নগণ্য, শতকরা নিরানব্বই জন জমির মালিকের কাছে ফুলের চেয়ে ফলের কদর বেশী। বাকি এক পার্সেন্ট—

boiboi.net

: শ্যামলী বাধা দিয়ে ওঠে. গোটা এক-পার্সেন্ট নয় করবীদি। তার একটি ভগ্নাংশ আবার আমার ড্যাডি; যিনি হায়ার ইনকাম গ্রুপের মানুষ হওয়া সত্ত্বেও বাড়ন্ত কম্পাউণ্ডে চ্যাড়শের চাষ করে থাকেন।

—বার বার চ্যাড়শ-চ্যাড়শ করছ কেন?—বিরক্তি প্রকাশ করেন জি. এম.-সাহেব।—আমার বাগানে, আলু-কপি-টমাটো-ভুট্টা সবই হয়। এনি হাউ, চল করবী, তোমার বাগানটা দেখে আসি।

রত্না দেবী একটা বেতের চেয়ার টেনে বসে পড়েন। বলেন, যেতে হয় তোমরা যাও। আমি এখানেই বসছি।

করবী পা বাড়িয়েছিল। এখন দ্বিধায় পড়ে। এঁকে এখানে একলা রেখে কেমন করে যাওয়া যায়?

ত্রিদিবেশ বলেন. কেন. তোমার আবার কী হল! একটু হাঁটাহাঁটি করা তো তোমার পক্ষে ভালই—

রত্না দেবী স্থূলাঙ্গী। কথাটার মধ্যে তাঁর স্বাস্থ্যপ্রাচুর্যের প্রতি কিছু কটাক্ষপাত করা হয়েছে, মনে হল তাঁর। ফোঁস করে ওঠেন, চ্যাড়শের ফলন বাড়ানোর জন্য তো আসিনি আমরা। তোমার বাগান দেখতে শখ হয়েছে—যাও! আমি তো বাধা দিচ্ছি না!

এবার কিন্তু চ্যাড়শের উল্লেখে বিরক্তি প্রকাশ করলেন না ত্রিদিবেশ। দ্বিতীয় একখানা চেয়ার টেনে নিয়ে বসে পড়েন। বলেন, ছাট, অফকোর্স, ইজ কারেকট্!

করবীর আর সহ্য হয় না। রত্না দেবীকে প্রশ্ন করে বসে, তবে আজ হঠাৎ কেন এসেছেন মাসিমা? সৌজন্য সাক্ষাতে, না কি আমার দুঃখে সান্ত্বনা দিতে?—বলেই সে অপ্রস্তুত হয়ে পড়ে। বড় যেন রূঢ় শোনালো তার কথাটা। রত্নাদেবী ওর চেয়ে বড়। সব বিষয়েই। বয়সে, পদমর্যাদায়, সামাজিক বিচারে। হঠাৎ এভাবে তাঁকে আক্রমণ করে বসাটা তার ঠিক হয়নি। কিন্তু কেউ উপযাচক হয়ে তার বেদনায় এভাবে প্রলেপ দিতে এলেই সে যেন ক্ষেপে ওঠে। কী জন্য সান্ত্বনা? শোকাহত লোকটা যাতে স্বাভাবিক হয়ে উঠতে পারে, শোকের কথাটা ভুলে থাকতে পারে, তাই না সান্ত্বনা দিতে আসা? অথচ করবী যতই স্বাভাবিক হতে চায়, সান্ত্বনা দেনেওয়ালারা ততই খুঁচিয়ে ঘা করেন। রত্নাদেবী তাঁর বিশালবপুটাকে 'ব্যস্থির' করে সকন্যা স-কর্তা আজ সান্ত্বনা দিতে এসেছেন সাড়ম্বরে—তাই এখন বাগানের কথা আলোচনা করা চলবে না। এখন রাজনীতি নয়, সাহিত্য-সিনেমা-খেলাধুলা কোন কিছুই চলবে না। এখন মুখভার করে মাথা নিচু করে তাকে বসে

BanglaBook.org

বসে শুনতে হবে সান্ত্বনার বাণী : আহা ! কী ভাল ছেলেটাই না ছিল সে ! কী ক্ষতিই না হ'ল তোমার ! ষাট, ষাট, বাছারে ! এমন আঘাত যেন শত্রুরেও না পায় !—শুনে তোমাকে দীর্ঘশ্বাস ফেলতে হবে, পার তো ভাল আঁচলের কোণা দিয়ে চোখটা মুছে নিতে পার। আর বসে বসে শুনতে পার অসীম-অনন্ত সান্ত্বনার স্থললিত বাণী : তা মা, যা গেছে তা তো আর ফিরবে না। সে সব কথা বরং ভুলে যাবার চেষ্টা কর। স্বাভাবিক হও,—ক্লাবে যাও, বন্ধু-বান্ধবীর সাথে মেশো'। [যাতে ক্লাবে সেই বন্ধু-বান্ধবীরা তোমাকে ক্রমাগত সান্ত্বনাবাণী শোনাতে পারে : স্বাভাবিক হও, ক্লাবে যাও, বন্ধু-বান্ধবীর সাথে মেশো' (যাতে ক্লাবে সেই বন্ধু-বান্ধবীরা তোমাকে ক্রমাগত সান্ত্বনাবাণী শোনাতে পারে : স্বাভাবিক হও, ক্লাবে যাও, বন্ধু-বান্ধবীর সাথে মেশো'…অ্যাড, ইন্‌ফিনিটাম্।)]

রত্না দেবীও নাভাস হয়ে পড়েছিলেন ! তাঁর কপালে এই ডিসেম্বরের শীতেও বিন্দু বিন্দু ঘাম জমে উঠেছিল। তবে ত্রিদিবেশ বাঁড়ুজ্জে না কি সব অবস্থাতেই সর্বদা প্রস্তুত, তাই সামলে নিয়ে বলেন, তোমাকে সান্ত্বনা দিতে রত্না আসেনি করবী। সান্ত্বনা কেউ কাউকে দিতে পারে না। নিজেকেই নিজে সেটা খুঁজে নিতে হয়। সে কথা রত্নাও জানে, আমরাও জানি। সত্যি কথা বলতে কি আমরা এসেছিলাম তোমার সঙ্গে কয়েকটা কথা আলোচনা করতে—যা ঠিক অফিসিয়ালও নয়, আবার পুরোপুরি আনঅফিশিয়ালও নয়। তা হলে, সেই কাজের কথাটাই আগে সেরে ফেলি—

বাধা দিয়ে করবী বলেছিল, মাপ করবেন, একটু বাধা দিচ্ছি…কী খাবেন বলুন ? চা না কফি ? মাসিমা ?

বিশেষ করে মাসিমাকেই প্রশ্ন করেছিল সে। কারণ রত্না দেবীর মুখের উপর থেকে সেই মেঘটা তখনও মিলিয়ে যায়নি। রত্না দেবী এবারও জবাব দিলেন না। যতটা দেরা হলে রত্না দেবীর মৌনতা অসৌজন্যমূলক মনে হতে পারত ততটা খণ্ডমুহূর্ত অতিক্রান্ত হবার আগেই ত্রিদিবেশ বলে ওঠেন, না, মাসিমা নয়, আমিই বলব। কফি খেলে দেখেছি ওঁর অনিদ্রাটা মাথা চাগায়। তুমি চা-ই বানাতে বল করবী ! কিন্তু স্ট্রেক চা…

মুন্নির-মার এই এক গুণ। সময়ে সে বুঝে নিতে পারে করবীর সঙ্গে চোখাচোখি হতেই ঘাড় নেড়ে সায় দেয়। সরে যায় রান্নাঘরের দিকে।

ত্রিদিবেশ বলেন, তাহলে কাজের কথাটা সেরে ফেলি। ব্যাপারটা একটু ডেলিকেট বলে 'এ-ও'-কে না পাঠিয়ে আমি নিজেই প্রসঙ্গটা আলোচনা করতে

BanglaBook.org

এসেছি। যতই বেদনাদায়ক হ'ক—এ ফ্যাক্ট্স্ এ ফ্যাক্ট! বাস্থ চলে গেছে, কিন্তু এয়ারক্রাফট্টা অব্যবহৃত হয়ে পড়ে আছে। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন না···'অশ্রু ঢেলে ঘড়া ঘড়া / মনের সঙ্গে এক রকমে করে নে ভাই বোঝাপড়া / মনে রে আজ কহ যে / ভালমন্দ যাহাই আসুক সত্যরে লও সহজে।' তা সেই সত্যকে আমাদের স্বীকার করতে হবেই। প্লেনটাকে চালু রাখতে কোম্পানি নূতন একজন পাইলটকে অ্যাপয়েন্ট করেছে। সে তোমার অচেনা নয়, ক্যাপ্টেন ব্রজেন বসাক। জিতেনের বন্ধু—ওরা একই ফ্লাইং-ক্লাবে শিখত—

করবী বলে ওঠে, শুধু বন্ধু নয় ডঃ ব্যানার্জি, সে ছিল ওঁর বেস্ট ফ্রেণ্ড। আমার বিয়ের আগে থেকেই ব্রজেনবাবুকে আমি চিনি; বস্তুত আমাদের বিয়েতে সেই ছিল প্রধান উদ্যোক্তা—রেজিস্ট্রেশনে সাক্ষী। এ তো খুবই আনন্দের কথা। ব্রজেনবাবু কবে আসছেন?

—নেক্সট্ উইকে! আপাতত এসে উঠছে আমাদের গেস্ট-হাউসে।

—বুঝলাম। বাকিটা আপনাকে বলতে হবে না ডঃ ব্যানার্জি। আপনার সঙ্কোচের কোন কারণ নেই; আমি জানি, এ কোয়ার্টার্সটা কোম্পানির পাইলটের জন্য তৈরী করা। আমি দিন দশ-পনেরর ভিতরেই···

—প্লীজ করবী! আমার বক্তব্যটা শেষ পর্যন্ত শোন আগে···

শেষ পর্যন্ত শুনে বেশ একটু অবাক হয়ে গিয়েছিল করবী। জিতেনের বিশিষ্ট বন্ধু ব্রজেন বসাক নাকি এই শর্তে চাকরিতে যোগদান করতে স্বীকৃত হয়েছে যে, কোম্পানী ঐ অজুহাতে তার বন্ধুপত্নীকে গৃহচ্যুত করবে না।

করবী বলে, এ তাঁর অন্যায় আবদার।

—কোম্পানি সে-কথা মনে করে না। প্রয়োজন হলে আরও একটি কোয়ার্টার্স তৈরী করা যেতে পারে···তুমি তো জানই করবী, দক্ষ একজন পাইলট যোগাড় করা কী কঠিন কাজ! কিন্তু নূতন একটি কোয়ার্টার্স সিভিল এঞ্জিনিয়ারিং ডিপার্টমেণ্টকে তৈরী করতে বলার আগে আমি তোমার কাছে আরও কয়েকটি কথা জানতে চাই···তুমি কি,···আই মীন তোমার এই জায়গাটা কেমন লাগে?

—হঠাৎ এ কথা কেন জানতে চাইছেন ডঃ ব্যানার্জি?

—অবশ্য এখনই কোন কিছু স্থির করে ফেলা তোমার পক্ষে অসম্ভব, তবু আমি জানতে চাই এখানেই পার্মানেণ্টলি এম্প্লয়েড হয়ে যাবার কথাটা কি কখনও ভেবে দেখছ?

—আমি নিজেই এখানে চাকরি করব?

boiRboi.net

—তুমি আগ্রহী হলে কোম্পানি রাজি।

—আমি কী কাজ জানি ?

—য়ু নো বেটার। তোমার এডুকেশনাল কোয়ালিফিকেশানটা কী, তাই আমি জানি না। কোন্ দিকে তোমার ন্যাক, আই মিন অ্যাপ্টিচ্যুড···

—আমি হিস্ট্রি নিয়ে বি. এ. পাশ করেছিলাম। সেকেণ্ড ক্লাস ছিল। এম. এ.-তে ভর্তি হয়েই বিয়ে হয়ে যায়। আর পড়িনি—

—তাহলে অনায়াসে আমাদের হাইস্কুলে চাকরি নিতে পার তুমি—

—তা যদি নিই, তবু এই চার-কামরার বাঙলোতে থাকব কী করে ?

—থাকবে। কারণ তুমি কোম্পানির কাছে চাকুরিপ্রার্থী নও, কোম্পানিই নিজের গরজে তোমাকে এখানে আটকে রাখতে চাইছে—

একটু অপেক্ষা করে করবী বলে, সেই গরজটা কী ডঃ ব্যানার্জি ?

ডঃ ব্যানার্জি রত্নার দিকে ফিরে তাকান। রত্না দেবী এতক্ষণে স্বাভাবিক হয়েছেন। বলেন, সে কথা কি তুমি জান না করবী ? এই লালগড়ে আজ তুমি কোথায় উঠে গেছ ?

জানে, করবী জানে। ওরা করবীকে কোনও দাক্ষিণ্য দেখাচ্ছে না, দেখাচ্ছে শহীদ জিতেন বাসুর বিধবাকে ! এই সম্মানের বোঝা তাকে বয়ে বেড়াতেই হবে। উপায় নেই ! মনস্থির করে বলে, ঠিক আছে, ভেবে দেখব। চাকরি নিই বা না নিই, আপনি যে আমাকে অফার করেছিলেন এ কথা কোন দিন ভুলব না। আমাকে, মানে···দু-একটা মাস ভেবে দেখতে দিন···

—অফ কোর্স ! অফ কোর্স ! এবার আমার দ্বিতীয় প্রস্তাবটা পেশ করি। প্রস্তাব নয়, এটি আমার সনির্বন্ধ অনুরোধ···তোমাকে রাখতে হবে। বল, রাখবে ?

করবী রীতিমত ঘাবড়ে যায়। বলে, এমন করে বলছেন কেন ডঃ ব্যানার্জি ? আপনার অনুরোধ মানেই আমার কাছে আদেশ—নিতান্ত যদি সেটা অসম্ভব কিছু না হয়।

—না, অসম্ভব কিছু দাবী করছি না আমি। আমরা স্থির করেছি জিতেন বাসুর একটা প্রামাণিক জীবনী লিখিত হওয়া দরকার। তার আদর্শ টা ভারতবর্ষের যুবসম্প্রদায়ের সামনে উপস্থাপিত করার দায়িত্ব আমাদেরই। 'বোতাম-আঁটা জামার নিচে শান্তিতে শয়ান' প্রাণটুকু নিয়ে যারা টিকে আছে—চোঙা-প্যান্ট পরে, সিগ্রেট ফুঁকতে ফুঁকতে পাড়ায় পাড়ায় মস্তানি করছে, তাদের জানা দরকার যে, এই ভারতবর্ষে শহীদ জিতেন বাসুর মত সন্তানও জন্মগ্রহণ করে ! তাই আমার

banglainternet.com

পরিচিত একজন পাবলিশার বন্ধুর সঙ্গে আমি যাবতীয় ব্যবস্থা করেছি। একজন প্রথিতযশা জীবনীকার সাহিত্যিক উপযুক্ত পারিশ্রমিকের পরিবর্তে জীবনীটি লিখে দিতে স্বীকৃত হয়েছেন। তিনিও দিন-সাত-দশের ভিতর লালগড়ে আসবেন। তোমাকে সাহায্য করতে হবে সাহিত্যিককে—

—আমাকে? আমি কী-ভাবে তাঁকে সাহায্য করতে পারি?

—পারলে তুমিই তো তাঁকে সাহায্য করতে পার করবী। তার বাবা-মা, ভাই-বোন তার সম্বন্ধে কতটুকু খবর রাখে? সে যে কী-ধাতু দিয়ে গড়া ছিল, এ দুনিয়ায় তুমিই তো সবচেয়ে ভাল জানো।

একটু চিন্তা করে করবী বলেছিল, বেশ। সাহায্য করব। তিনি যা জানতে চান, জানাব।

—ছ্যাটস্ এ গুড্ গার্ল।

ইতিমধ্যে কাজু-বাদামের প্লেট আর চায়ের পট নামিয়ে রেখে গিয়েছিল মুন্নির-মা। চা পরিবেশন করতে করতে করবী বলেছিল, তাহলে আমারও একটা প্রস্তাব আছে ডঃ ব্যানার্জি—

—বল? বল?

—আমি যে বাঙলোটায় আছি তাতে চারটে বেডরুম। তার মাত্র একটা ব্যবহার করি আমি। সামনের ঘরটা নিতান্ত গেস্ট-রুম, বাড়ির থেকে সম্পূর্ণ পৃথক। ব্রজেনবাবু তো ব্যাচিলার। উনি তো আপাতত আমার পেয়িং-গেস্ট হিসাবে ঐ ঘরখানায় থাকতে পারেন—

—না, না—তা হয় না। ছ্যাটস্ ইম্পসিব্‌ল্!—দৃঢ়ভাবে মাথা নাড়েন জি. এম।

করবী মুখ তুলে শুধু একবার তাকায়। কথা বলে না। যে প্রশ্নটা আটকে গেল করবীর মুখে সেটাই বাঙ্‌ময় হয়ে উঠল এতক্ষণে শ্যামলীর মুখে, কেন ড্যাডি? অসম্ভব কিসের? ব্রজেনবাবু ব্যাচিলার, এলেই তাঁকে একটা কম্বাইণ্ড-হ্যাণ্ড রাখতে হবে। অথচ সপ্তাহে হয়তো তিন-চারদিন তিনি বাড়িতে খাবেনই না। এদিকে করবীদি এতবড় ফ্ল্যাটের ভাড়া গুণছেন, অথচ বাস করছেন ফ্ল্যাটের এক কোণায়—

—করবী না-হয় রেন্ট-ফ্রি কোয়ার্টার্সে থাকবে।

এবারও করবীর মুখের কথা কেড়ে নিয়ে শ্যামলী বলে, করবীদি তোমাদের সে দাক্ষিণ্য গ্রহণ করবেই এটা ধরে নিচ্ছ কেন? তাছাড়া আমার প্রশ্নের জবাবটা এড়িয়ে গেছ তুমি। কেন এ প্রস্তাব গ্রহণযোগ্য নয় তা তুমি এখনও বলনি।

করবী শ্যামলীর প্রতি কৃতজ্ঞতা বোধ করে।

boiRboi.net

ডঃ ব্যানার্জি ইতস্তত করতে থাকেন। শ্যামলী পুনরায় বলে, এই নিরাশ্রয় পুরীতে করবীদি বেচারি একা পড়ে আছে, একটা কথা বলার লোক পর্যন্ত নেই···

ডঃ ব্যানার্জির বোধহয় খেয়াল হল রত্না দেবী এ বিষয়ে কিছু মতামত প্রকাশ করেননি। তাই হঠাৎ তাঁর দিকে ফিরে বলেন, তুমি কী বল ?

গোটা প্রকল্পের কর্ণধার যেখানে হালে পানি পাচ্ছিলেন না সেখানে হাল ধরতে এগিয়ে এলেন এবার তাঁর বেটার-হাফ। বললেন, উনি বোধহয় ভাবছিলেন যে, একই ফ্ল্যাটে যদি একজন উইডো আর একজন ব্যাচিলার থাকেন···

তাঁকে বক্তব্যটা শেষ করতে না দিয়ে শ্যামলী মুখর হয়ে ওঠে, মা, তুমি ভুলে যাচ্ছ স্থানটা নিশ্চিন্দিপুর গাঁ নয়, লালগড় কলোনী ; কালটা ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ পাদ নয়, আর পাত্রপাত্রী দুজনেই প্রাপ্তবয়স্ক !

ফুঁসে ওঠেন রত্না দেবী, আমি কিছুই ভুলিনি মা, ব্যাপারটা দৃষ্টিকটু তাই বলছিলাম শুধু—

—কেন দৃষ্টিকটু ? এই লালগড়েই অমন নজীর আছে—

বাধা দিয়ে করবী বলে উঠেছিল, থাক্ শ্যামলী, এ আলোচনাটা বন্ধই থাক !

—আমার তাতে আপত্তি হত না করবীদি, যদি আলোচনাটা আর কয়েক কদম আগে বন্ধ হত ; কিন্তু আমরা এতদূর এগিয়ে এসেছি যে, এখন আর থামা যায় না—

দেখা গেল রত্না দেবীও ঐ মত পোষণ করেন। তাই যেইহারানো আলোচনার সূত্র তুলে নিয়ে বলেন, কোথায় দেখলে তুমি নজীর ? শুনি ?

—মিসেস নোয়ামি স্মিথ আর মিস্টার রঙ্কচারী টুইন-ফ্ল্যাটে থাকেন। একজন উইডো, একজন ব্যাচিলার !

—পাশাপাশি ফ্ল্যাট ! একই ফ্ল্যাট নয় ! তাছাড়া নোয়ামির বয়স অনেক বেশি —তার মেয়ের বয়সই পনের-ষোলো !

হঠাৎ রক্ত চড়ে যায় করবীর মাথায়। ধমক দিয়ে ওঠে শ্যামলীকেই, স্টপ ইট প্লীজ, শ্যামলী !

সবাই হকচকিয়ে ওঠে। নৈর্ব্যক্তিক আলোচনাটা যে করবীর পক্ষে ক্লেশকর এ-সত্যটা একসঙ্গে তিনজনেই বুঝে ফেলেন।

পরিবেশটা হাল্কা করতে করবী বলেছিল, আপনাকে আর একটু চা দেব ডক্টর ব্যানার্জি ?

রঞ্জন বসাক করবীর পেয়িং-গেস্ট হতে আদৌ আপত্তি করেনি। ডঃ ব্যানার্জি

BanglaBook.net

এবং রত্না দেবী দুজনেই অবাক হয়েছিলেন করবীর দুঃসাহসিকতায়। এ নিয়ে লালগড় টাউনশিপের আলোকপ্রাপ্ত সমাজে কিন্তু কে'ন ঘোঁট হয়নি। অ্যাকাউন্টেন্ট রঙ্গচারী ক্লাবে ব্রিজের আসরে টেবিল চাপড়ে বলেছিল, এর মধ্যে অস্বাভাবিকতাটা কোথায়? মিসেস্ বাসুর একজন পেয়িং-গেস্ট-এর প্রয়োজন, ক্যাপ্টেন বসাকের একটা বোর্ডিং-লজিংএর ব্যবস্থাপনার দরকার। তারা তাদের সমস্যার সমাধান করে ফেলেছে এতে এত আলোচনার আছেই বা কী?

মেকানিক্যাল এঞ্জিনিয়ার যশোবন্ত কাপুর স্পেডের সাহেব পেডে আর একধাপ এগিয়ে গিয়ে বলেছিল, শুধু তাই নয় রঙ্গচারী, মিসেস্ বাসুকে তো আবার বাঁচতে হবে! এ-ভাবে ওদের দুজনের মধ্যে যদি একটা মহব্বৎ গড়ে ওঠে···

তাকে ট্রাম্প করে তার ধর্মপত্নী শীলা। বলে ওঠে, তুমি বড় ভালগার যশ! ওদের মধ্যে কিছু একটা যে গ্রো করবেই তা আগেভাগে ধরে নিচ্ছ কেন?

কাপুর অবাক হয়ে যায়। বলে, বেশক্! প্যার-মহব্বৎ তোমার মতে ভালগার?

শীলা প্রতিবাদ করে, না। কিন্তু তোমার প্রকাশভঙ্গিটা ভালগার। আফটার অল মিসেস্ বাসুর স্বামী একজন জাতীয় শহীদ!

—সো হোয়াট? সেই অপরাধে ভদ্রমহিলা আর কাউকে প্যার করতে পারবেন না সারা জীবন?

—তুমি থামবে? —ধমকে ওঠে শীলা,—নাও তোমার লীড!

—লীড আমি দিচ্ছি, কিন্তু ঐ সঙ্গে এ কথাও বলব, ওদের মধ্যে তেমন কিছু গ্রো করলে আমি দুজনকেই কংগ্র্যাচুলেট করব, তা তুমি ভালগার বল, আর যাই বল—

মেকানিকাল এঞ্জিনিয়ার যশোবন্ত কাপুর অবশ্য অভিনন্দন জানাবার সুযোগ আদৌ পায়নি। মাস-তিনেকের ভিতর ক্যাপ্টেন ব্রজেন বসাক এ চাকরিতে ইস্তফা দিয়ে এয়ার-ইণ্ডিয়াতে জয়েন করেছিল।

করবীর জীবনে তাতে ক্ষতিবৃদ্ধি হয়েছিল কি না, হলে কতটুকু হয়েছিল, কে তার সূক্ষ্ম হিসাব রাখে? রাখে অবশ্য অনেকেই—কিন্তু সেটা অফিসার্স ক্লাবে আলোচিত হয়নি, মহিলা-সমিতিতেও নয়। ঘরে ঘরে মশারী ফেলা জনান্তিকে সে কথা আলোচিত হয়ে থাকতে পারে। অনেকেরই ধারণা ব্রজেন বসাক এয়ার-ইণ্ডিয়ার আকর্ষণে লালগড় ছাড়েনি, ছেড়েছিল কিছু একটার বিকর্ষণে। ব্রজেন বসাক চলে যাবার পর করবীকে যে দেখেছে সেই সে-কথাটা বুঝতে পেরেছে। শ্যামলী তো তার বরকে বলেছিল, 'করবীদিকে দেখলে মনে হয় সে যেন দ্বিতীয়বার বিধবা

boiRboi.net

ওয়েভে।' কিন্তু প্রকাশ্যে একথা লালগড়ে কেউই বলেনি। সেটা ওদের এটিকেটে বাধে। হাজার হোক, মিসেস্ করবী বাসু হচ্ছে লালগড়ের হিরোয়িন। তার স্বামীর জীবনী লেখা হচ্ছে। সে সমালোচনার অতীত।

'দ্য কুইন হ্যাজ নো লেগস্!

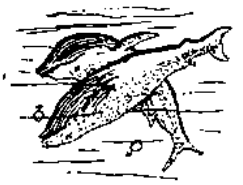

স্কুলবাসের হর্নের আওয়াজ কানে যেতেই সতর্ক হয়ে ওঠে শীলা। টেলিফোনটা কান থেকে নামাবার অবসর হয় না, ঐ অবস্থাতেই চিৎকার করে ওঠে, মুন্না! তোমার টিফিন বাক্স!

—টিফিন বাক্স! হোয়াট ডু য়ু মীন··· ?

—এক মিনিট করবী। লাইনটা ধরে থাক। আমি এখনই আসছি···

টেলিফোনটা টেবিলে নামিয়ে রেখে ছুটে বেরিয়ে যায় শীলা। ক্ষিপ্র হাতে তুলে নেয় ডিনার-টেবিলের উপর থেকে টিফিনের কৌটাটা। মুন্নার সঙ্গে দৌড়ে পারবে কেন? কিন্তু না, বাস ড্রাইভার দেখতে পেয়েছে তাকে। সালোয়ার-পাঞ্জাবি-পরা যৌবনবতী মহিলাটি গেটের দিকে ছুটে আসছেন। হাওয়ায় ওর ওড়না দুলছে, কাঁচুলির বন্ধনী সত্ত্বেও মাতৃহৃদয় তরঙ্গভঙ্গে উদ্দাম। এ দুর্লভ দৃশ্য দেখবার জন্য সে অপেক্ষা করতে রাজী। টিফিনের কৌটাটা মুন্নার ঝোলার মধ্যে ফেলে দেবার সুযোগ পায় শীলা। মুন্না অপ্রস্তুতের হাসি হাসে। বলে, থ্যাঙ্কু মাম্মি! একেবারে ক্লীন বোল্ড হয়ে যাচ্ছিলাম এক্ষুনি!

ওর ঝুঁটিটা নেড়ে দিয়ে শীলা বলে, স্কুলে দুষ্টুমি কর না যেন।

ড্রাইভারের দিকে ফিরে বলে, থ্যাঙ্কু!

সর্দারজী চোস্ত উর্দুতে জানায়, ধন্যবাদ জানানোর কিছু নেই। শিশুচরিত্র এবং তাদের জননীদের ব্যাকুলতা সম্বন্ধে সে সম্পূর্ণ ওয়াকিবহাল। গাড়িতে সে স্টার্ট দেয়।

হাঁপাতে হাঁপাতে শীলা ফিরে আসে। দেখে যশোবন্ত বসে আছে ড্রইং-কাম-

BanglaBook.net

ডাইনিং রুমের সোফাটায়। চোখের সামনে খবরের কাগজের খেলার পাতাটা। বাহ্যজ্ঞানরহিত। খেঁকিয়ে ওঠে শীলা, মুন্না যে আজও টিফিন ফেলে রেখে চলে যাচ্ছিল তা দেখতে পাওনি ?

অপ্রস্তুতের হাসি হাসল যশোবন্ত। বললে, দেখতে পেলে কোন চ্যাম্পিয়ান স্পোর্টসম্যান তার ঔরৎকে দৌড় করায় ?

—থাক! আর কেরদানি দেখাতে হবে না! কোন যুগে কাপ-মেডেল পেয়েছ তার দেমাক এখনও গেল না!

হাত দুটি জোড় করে কাপুর বলে, সরি! কিন্তু সত্যিই নজর হয়নি আমার!

—তাই তো বলছি তখন থেকে। সংসারের দিকে একটু খেয়াল নেই তোমার। বাড়িতে কি হচ্ছে না হচ্ছে বিলকুল নজর নেই। শুধু অফিস আর ক্লাব, রেডিও আর খেলার খবর! সারা সকাল ধরে টিফিন বানালাম, মুন্না যদি না নিয়ে যেত, তাহলে—

দাড়ি-গোঁফের জঙ্গল ভেদ করে যশোবন্ত কাপুর আবার হাসে। বলে, বললাম তো, সরি! এবার থেকে সংসারের দিকে ঠিক নজর দেব। বাড়িতে কি হচ্ছে, না হচ্ছে—

—আর দিয়েছ! কোনদিনই তুমি—

বাধা দিয়ে যশোবন্ত বলে, শীলা! এই দেখ, এখন থেকেই সংসারের দিকে নজর দিচ্ছি। তোমার এখন উচিত আমার সঙ্গে ঝগড়া থামিয়ে টেলিফোনটা তুলে নেওয়া। নয় কি ?

শীলার খেয়াল হয়। কথা না বাড়িয়ে সে এগিয়ে যায় টেবিলটার দিকে। মাউথপীসে নিবেদন করে, সরি কংবী! মুন্নার স্কুলবাস এসে গিয়েছিল ; ও টিফিন কৌটা ফেলে রেখেই—

—আমি বুঝতে পেরেছি! তা শেষ পর্যন্ত টিফিন কৌটাটা কি—

—হ্যাঁ। রীতিমত হাণ্ড্রেড-ইয়ার্ডস দৌড়ে এলাম এইমাত্র! এখনও হাঁপাচ্ছি!

—সে তো শুনতেই পাচ্ছি! হাঁপাচ্ছ অবশ্য সেজন্য নয়, কর্তার সঙ্গে ঝগড়া করে! তোমাদের দাম্পত্য আলাপের কিছুটা আভাস পেলাম কিনা।

—ও স্মাই···। সেটাও শুনতে পেয়েছ ?

—উপায় কি বল ? তোমরা এমন কিছু নিভৃত কূজন করছিলে না!

—আচ্ছা তুমিই বল করবা! এ কী সহ্য হয় ? মুন্না না হয় ছেলেমানুষ, তার বাপ তো সামনেই বসে আছে—সারাদিন 'লুক' আর 'পুল'!

BanglaBook.net

—'হুক' আর 'পুল'! তার মানে?

—ওরা বাপ-বেটাই শুধু জানে। ওদের ক্রিকেটের ভাষা!

—মুন্নার বাপ মুন্নার চেয়েও ছেলেমানুষ। চিনিতো মানুষটিকে! নেহাৎ তোমার হাতে যদি মানুষ হয়!

শীলা খুশী হল। হাসল। লজ্জাও পেল বোধহয়। সত্যিই—ঐ দশাসই পাঠ্ঠা জোয়ান মানুষটা একটা বত্রিশ বছরের শিশু। শীলা শুধু তার সন্তানকেই মানুষ করছে না, তার বাপকেও মানুষ করছে। লোকটা যেমন খেয়ালি, তেমনি এলোভুলো। সংসারের কোন সংবাদ রাখে না। শীলা কোথায় যায়, কী করে, কিচ্ছু খবর রাখে না। মাসান্তে পে-প্যাকেটটা শীলার হাতে ধরিয়ে দেওয়া ছাড়া আর যেন তার কোন দায়িত্ব নেই। বাজার করা, ছেলে পড়ানো, ধোপা-কাগজ-দুধওয়ালার হিসাব সব দায় ঝক্‌কি শীলার। কিন্তু সে সব কথা পরে. আপাতত করবীর সঙ্গে আলাপচারিতে ছেদ টানতে হয়। কাপুর আর দশ মিনিটের ভিতর খাবার টেবিলে এসে বসবে।

—হ্যাঁ. কি-যেন বলছিলে তখন করবী? সেই লেকচারের কথা—ডক্টর ত্রিবেদীর বক্তৃতা, শনিবার সন্ধ্যায় তোমরা সবাই আসছো তো?

—প্রমীলাদির বিশ্বাস মহিলা-সমিতির প্রত্যেকটি সভ্যা উপস্থিত থাকবে—

—তাহলে আমি একা বাদ যাব কেন? ব্যাপারটা আকর্ষণীয় হবে নিশ্চয়—

—নিশ্চয়। সম্পূর্ণ বৈজ্ঞানিক সমীক্ষা। ডঃ ত্রিবেদী তাঁর উদ্দেশ্য আর পদ্ধতির সম্বন্ধে সব কিছু বুঝিয়ে বলবেন। আমাদের কোন প্রশ্ন থাকলে তার জবাব দেবেন। তারপর শুন্‌ছি, তিনি আর তাঁর সহকর্মীরা দিন-দশেক আমাদের মহিলা সমিতির বিবাহিতা সভ্যাদের ধরে পর্যায়ক্রমে এক সাক্ষাৎকারে মিলিত হবেন। অবশ্য সেটা সম্পূর্ণ স্বেচ্ছা-প্রণোদিত—আই মীন—ওঁর বক্তৃতা শোনার পর যারা এই সাক্ষাৎকারে স্বেচ্ছায় যোগ দিতে চাইবে. তারাই শুধু আসবে।

—ঠিক আছে। অধিকাংশ সভ্যা যা করবে আমিও তাই করব। কাগজে ওঁর প্রবন্ধটা পড়েছি। আমার তো মনে হয়েছে, ওঁর উদ্দেশ্যটা মহৎ—ফ্যামিলি-প্ল্যানিং-এর পক্ষে এই জাতের সমীক্ষা অপরিহার্য। এতদিন কেন হয়নি সেটাই আশ্চর্য। কিন্তু করবী, একটা কথা ভাই। জিনিসটা খুবই অস্বস্তিকর, তাই নয়? আই মীন, সব সত্যি কথা কি সবাই বলতে পারবে?

—আমিও তো তাই ভাবছি—

—কিন্তু প্রত্যেকটি সাক্ষাৎকারীর পরিচয় গোপন থাকবে তো?

boiRboi.net

—নিশ্চয়! হাণ্ড্রেড-পার্সেন্ট গ্যারান্টিড! না হলে কেউ যায়?

—ওসব দেশে যৌন-সমীক্ষা অনেকদিন ধরেই হচ্ছে। ডক্টর মেরী স্টোপস্-ডঃ কিনসে-র স্ট্যাটিসটিক্স তুমিও দেখেছ নিশ্চয়। কিন্তু আমাদের দেশে কি সেটা সম্ভব?

—কেন নয়? ও-সব দেশে যা হয় বিশ-ত্রিশ বছর পরে তা আমাদের দেশে আমদানি করা হয়। ও দেশ থেকে টেলিভিশান এদেশে এল, পরমাণু বিস্ফোরণ এল,—এবার যৌনসমীক্ষা আসবে এতে আশ্চর্য হবার কি আছে?

—তা ঠিক। কিন্তু প্রশ্নোত্তর কী ভাবে হবে? লিখিত না মৌখিক?

—যতদূর জানি মৌখিক!

—সর্বনাশ! একজন অচেনা-অজানা পুরুষমানুষ ঐ সব প্রশ্ন করবে, আর তার জবাব দিয়ে যেতে হবে?

—কেন? মুন্নার ডেলিভারি কি মেয়ে ডাক্তারের হাতে হয়েছিল?

—সেটা সম্পূর্ণ অন্য জিনিস। তখন আমি অসুস্থ ছিলাম—অসুস্থ না হলেও অস্বাভাবিক ছিলাম। কিন্তু সুস্থ-সবল-স্বাভাবিক অবস্থায় একজন অচেনা পুরুষ মানুষের সঙ্গে ঐসব কথা আলোচনা করা যায়?

—যায় নিশ্চয়, কারণ শুনছি ডঃ ত্রিবেদী নাকি ইতিপূর্বেই দু'হাজারের উপর ইন্টারভিয়ু নিয়েছেন। তবে তুমি যা বলছ আমি তার সঙ্গে একমত। এ-সব কথা অমন নির্লজ্জের মত আলোচনা করা আমারও অসম্ভব মনে হচ্ছে। দেখা যাক, ডঃ ত্রিবেদীর বক্তৃতা শুনলে হয়তো ব্যাপারটা বোঝা যাবে।

—লেটস্ হোপ সো! ঠিক আছে, আমি নিশ্চয় আসব।

টেলিফোনটা রিসিভারে নামিয়ে রেখে শীলা দেখতে পায় যশোবন্ত ইতিমধ্যে খবরের কাগজটা নামিয়ে রেখে ওর দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে।

—কী দেখছ?—হাসি হাসি মুখে প্রশ্ন করে শীলা।

—ঘরওয়ালীকে! ঘরের দিকে নজর দিতে হবে যে—

শীলা উঠে পড়তে যায়; কিন্তু যশোবন্ত তার বাঁধের খাবা দিয়ে চেপে ধরে ওর বাঁ-হাতখানা। নিজের দিকে আকর্ষণ করে।

—কী অসভ্যতা হচ্ছে—প্রতিবাদ করে শীলা—তোমার অফিসের দেরী হয়ে যাবে। নাও টেবিলে গিয়ে বস। খাবার নিয়ে আসি।

যশোবন্ত সে প্রসঙ্গ এড়িয়ে বলে, তুমি কি ঐ মিটিঙে যাবে?

—নিশ্চয়। কেন যাব না? সবাই যাবে, আমিও যাব।

boiRboi.net

—আর তারপর ঐ ইন্টারভিয়ু ? তাতেও যাবে ?

—তাও যদি সবাই যায়, আমিও যাব।

—কী বলবে ?

—যা সত্যি কথা। আফটার অল, এটা একটা বৈজ্ঞানিক সমীক্ষা।

একটু চুপ করে থাকে যশোবন্ত। তার মুঠিটা আলগা হয়ে যায়। শীলা তার বাঁ-হাতখানা ফেরত পায়। গোঁফের প্রান্তটা মসৃণ করতে করতে যশোবন্ত বলে, টেক: মাই অ্যাডভাইজ শীলা, বক্তৃতা শুনতে চাও, যাও ; কিন্তু ইন্টারভিয়ুতে যেও না।

—কেন ? তোমার আপত্তিটা কিসের ? সমস্ত ব্যাপারটাই তো গোপন থাকবে। আমার নাম-ধাম-পরিচয় তো কেউ জানবে না।

—না, সেজন্য নয়। আমি ভাবছি তুমি ডঃ ত্রিবেদীকে কোন্ সত্যটা বলবে ? যে সত্যটা আমি জানি, না কি যে সত্যটা তুমি জান ?

শীলার ভ্রূ-যুগল পরস্পরকে আলিঙ্গন করতে এগিয়ে আসে। বলে, মানে ? সত্য তো একটাই ?

—না ! সত্য আপেক্ষিক ! আমি যে সত্যটা জানি তা হচ্ছে এই যে, মুন্না হবার দু-বছর পর থেকে আমরা কোন রকম জন্মনিয়ন্ত্রণের আশ্রয় নিচ্ছি না, তুমিও না, আমিও না। অথচ মুন্নার বয়স আজ সাত এবং মুন্নার অস্তিত্বই প্রমাণ দিচ্ছে তুমি-আমি উভয়েই স্বাভাবিক। এখন প্রশ্ন হচ্ছে এই—আমি যশোবন্ত কাপুর সেটা মেনে নিয়েছি, কিন্তু ডঃ ত্রিবেদী কি এই বৈজ্ঞানিক তথ্যটা হজম করতে পারবেন ?

শীলার মুখটা ক্ষণিকের জন্য সাদা হয়ে যায়। পরমুহূর্তেই সে আত্মসম্বরণ করে, আমি ঠিক বুঝতে পারছি না। তোমার কথা··· তুমি, মানে···

—আরও স্পষ্ট করে বল্‌ব ? তুমি সন্তান চাও না। মুন্নাকে চাওনি। মুন্না একটা অ্যাকসিডেন্ট ! অস্বীকার করতে পার ?

—কী পাগল তুমি ! মুন্নাকে আমি চাইনি ? মুন্নাকে আমি প্যার করি না ? —শীলা উঠে দাঁড়াতে যায়। আবার তাকে ধরে বসিয়ে দেয় যশোবন্ত। বলে, কথা ঘুরোবার চেষ্টা করা না শীলা। আর কেউ না জানলেও আমি কি জানি না, মুন্নার জন্মকে ঠেকাতে চেয়েছিলে তুমি ?

—কেন ? কেন আমি সন্তান চাইব না ? কেন মা হতে চাইব না ?

—তোমার ফিগার খারাপ হয়ে যাবে বলে। তোমার অভিনেত্রী হবার স্বপ্ন আর কোনদিন সফল হবে না বলে !

boiRboi.net

হঠাৎ খিলখিলিয়ে হেসে ওঠে শীলা। বলে, প্লীজ যশ্! ভুলে যেও না আমার বয়স ঊনত্রিশ বছর হয়ে গেছে। হ্যাঁ সিনেমায় নামার শখ এককালে আমার ছিল, অস্বীকার করব না—কিন্তু এখন, এই বয়সেও কি আমার সেই পাগলামি থাকতে পারে? আমি এখন একটা সংসারের ঘরণী। আমি এক-জনের মা—

—হ্যাঁ, কিন্তু একজনের বেশী নয় কেন? কেন আজ ছয়-সাত বছরের ভিতরেও মুন্নার একটি ভাই বা বোন এল না এ সংসারে?

—জাস্ট অ্যাকসিডেন্ট। নিতান্ত ঘটনাচক্র। তুমি তো জানই—

প্রায় চিৎকার করে ওঠে যশোবন্ত, না, জানি না! আর জানি না বলেই তো বুঝতে পারি না।

—কেন, তুমি ডাক্তার দিয়ে তোমাকে আর আমাকে পরীক্ষা করাওনি?

—করিয়েছি—তিনিও বলেছেন, তুমি যা বলছ তাই! যে কোন দিন তোমার কোলে সন্তান আসতে পারে। তুমি আমি কেউই অস্বাভাবিক নই—অথচ···

—অথচ কি?

যশ জবাব দেয় না। স্থিরদৃষ্টিতে সে সিলিং-এর দিকে তাকিয়ে বসে থাকে। শীলা ঘনিয়ে আসে। ওর রোমশ হাতটা টেনে নেয়। সেই কর্কশ হাতের উপর ম্যানিকিওর করা আঙুল বুলাতে বুলাতে বলে, আচ্ছা তুমি কি পাগল বল তো? আমি কোন কিছু ব্যবহার করলে সেটা কি তুমিও জানতে পারতে না? আর কেউ নয়, তুমি?

যশ-এর দৃষ্টিটা সিলিং থেকে নেমে আসে। শীলার কাজলকালো চোখ-দুটির গভীরে সে যেন কী খুঁজতে থাকে। শীলা ওর হাতটা নিয়ে নাড়াচাড়া করতে করতে সলজ্জে নতনেত্রে বলে তাই তো ডঃ ত্রিবেদীকে মীট করতে চাই। অতবড় গাইনোকলজিস্ট! আমি·· আমি জানতে চাই, কেন আমি আবার মা হতে পারছি না!

একগাল হাসল যশোবন্ত। বললে, জিজ্ঞাসা করবে? সত্যি?

—নিশ্চয়! ছেলেপুলে যা হবার তা এই বয়সেই হয়ে যাওয়া উচিত। না হলে মানুষ করতে পারব না।

—ঠিক কথা। অন্তত "এক-দুই-তিন ব্যস্" পর্যন্ত তো যেতে হবে।

—তাছাড়া আরও একটা কারণ আছে। ডাক্তারবাবু বলছিলেন, মুন্নার একটা

boiRboi.net

ভাই বা বোন না হলে সে বেশী আত্মকেন্দ্রিক হয়ে যাবে। এক সন্তান যেমন হয়ে যায় আর কি। মুন্নার স্বার্থেই তার একটি ভাই কি বোন এ সংসারে আসা উচিত। নয় ?···কিন্তু আর দেরী নয়। এবার ওঠ তুমি। অফিসের দেরী হয়ে যাবে।

যশোবন্ত কাপুর তার বিশাল বপু নিয়ে উঠে দাঁড়ায়। তার মনের মেঘ এতক্ষণে সম্পূর্ণ সরে গেছে। আজ খোলাখুলি আলোচনা হওয়ায় সে যেন অনেকটা নিশ্চিন্ত হল।

আরও আধঘণ্টা পরে। স্কুটার নিয়ে যশোবন্ত অফিসপাড়ার দিকে রওনা হয়ে গেল। নিত্যকর্মপদ্ধতির আইনে শীলা গিয়ে বাইরের দরজার সামনে দাঁড়ায়। এই সময় সব কাজ ফেলে শীলা যদি গেটের কাছে এসে না দাঁড়ায় তাহলেই যশ-এর মেজাজ খারাপ হয়ে যাবে। সারাটা দিন অফিসে অধঃস্তন কর্মচারীদের বকাঝকা করবে। দ্বিচক্রযানের শব্দটা দূর থেকে দূরে মিলিয়ে যেতে শীলা সদর দরজা বন্ধ করে। শয়নকক্ষে এসে গোদরেজের আলমারিটা খোলে। ভিতরের লকারে আছে তার গহনার বাক্স। তালা-লাগানো নেই তাতে—নম্বর মিলিয়ে তা খুলতে হয়। ঐ গহনার বাক্সের এক গোপন খোপ থেকে একটা লম্বাটে ওষুধের প্যাকেট বার করে আনে। প্যাকেট থেকে খুলে নেয় একটা ছোট্ট লাল রঙের বড়ি। মুসুরীর ডালের আকার। ওষুধটা ম্যানিকিওর করা দু-আঙুলে চেপে ধরে আবার বন্ধ করে আলমারি। চলে আসে ড্রইং-কাম-ডাইনিং রুমে। জগ থেকে গ্লাসে জল গড়িয়ে এক চুমুক মুখে নেয়, টুপ করে ফেলে দেয় বড়িটা মুখ-গহ্বরে। ঢোক গিলবার সময় নজরে পড়ে সামনে ড্রেসিং টেবিলের ভিতর দাঁড়ানো মেয়েটিকে। সেও 'পিল' খাচ্ছে। শীলা হাসে। মেয়েটিও। তারপর কী মনে করে শীলা আয়নার ভিতর ঐ মেয়েটিকে মুখ ভ্যাংচায়। পায়ে পায়ে এগিয়ে আসে টেলিফোনটার কাছে। তুলে নিয়ে কান চেপে ধরে। ডায়াল টোন। একটি মুখস্ত করা নম্বর ডায়াল করে ধীরে সুস্থে। রিঙিং টোন।

—হ্যালো ?

—শীলা !

—কর্তা ?

—অফিসে ডিউটি দিতে গেছে—

—গিন্নি কতক্ষণে ডিউটি দিতে আসছেন ?

—একটা ট্যাক্সি পেতে আর যেতে যতটা সময় লাগে—

রাইট ও !—ও ভাল কথা, শীলা ! শোন, সালোয়ার-পাঞ্জাবি পরে এস না যেন।

boiRboi.net

জলতরঙ্গের মত খিলখিলিয়ে ওঠে শীলা। বলে, কেন গো? এতদিনেও ওগুলো রপ্ত হয়নি?

—তা নয়, ড্রেসটা কন্সপিকিউয়াস্। শাড়ি পরে এস। কেমন?

—কোন শাড়িটা?

—সেই হলদে রঙের শিফনটা।

—ও. কে.!

শীলা টেলিফোনটা নামিয়ে রাখে। সামনের আয়নায় দেখে ঐ মেয়েটিও টেলিফোনটা নামিয়ে রাখল। শীলা মেয়েটিকে বললে, খবদার কাউকে বলবি না, বুঝলি?

আয়নার ভিতরের মেয়েটিও একই ভঙ্গিতে ওকে তর্জনী তুলে শাসায়।

—আমি নিশ্চয় আসব করবীদি, আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। আপনার টেলিফোন করার দরকার ছিল না; আপনাদের ছাপানো চিঠি আজ সকালেই পেয়েছি—

—চিঠি নাও পেতে পারতে তো। তাই প্রমীলাদি বলেছিলেন, যে কজনের টেলিফোন আছে তাদের টেলিফোনে জানাতে। এখনও গোটা দুই ফোন করতে হবে আমাকে।

—কাকে কাকে এ পর্যন্ত বলেছেন?

—এই মাত্র কথা হল শীলার সঙ্গে। তার আগে মিসেস থাপার, মিসেস আগরওয়াল, মিসেস গুরুবক্সানিকে বলেছি। মিসেস পামার কলকাতা গেছেন, সীতাদি আসবেন, নমিতাদিও। তুমিও তো আসবে বললে—

—আর কে কে বাকি আছেন?

—ডক্টর মিস্ দত্তা আর মিসেস্ স্মিথ!

boiRboi.net

—ডক্টর মিস্ দত্তা! সে কি! শুধুমাত্র বিবাহিতা সদস্যারই তো নিমন্ত্রণ!

—ব্যতিক্রমই নিয়মের পরিচায়ক। ডক্টর দত্তা একজন গাইনোকলজিস্ট: তাঁকে নিমন্ত্রণ না করলে চলে?

শ্যামলী হঠাৎ হেসে ফেলে। বলে, করবীদি, উনি কি ইন্টারভিয়ু দিতেও আসবেন?

করবী ধমক দেয়, দুষ্টুমি হচ্ছে, নয়। দাঁড়াও তোমার মাকে বলে দেব!

—প্লীস্ করবীদি! অমন সর্বনাশ করবেন না। তার বদলে না হয় আপনাকে কিছু ঘুষ দিচ্ছি!

—কী ঘুষ?

—আপনাকে দুটো টেলিফোন করার বিড়ম্বনা থেকে অব্যাহতি। ডক্টর দত্তা আর মিসেস্ নোয়ামি স্মিথকে আমিই ফোন করে দিচ্ছি।

—থ্যাঙ্কু! তোমার মা কি···

—ওরে ফাদার! মাকে আমি বলতে পারব না। আপনিও পণ্ডশ্রম করবেন না। মা যাবে না। মাকে ওসব কথা না বলাই ভাল।

ও-প্রান্তে করবী বোধকরি হাসল। ওর মনে হল শ্যামলীই এই আতঙ্কের অভিনয়টার পিছনে অন্য ইতিহাস আছে। শ্যামলী আধুনিকা—সব কিছুতেই সে প্রগতির ধ্বজাধারী, তার দাম্পত্য জীবনের গোপনতম অধ্যায় সে অসঙ্কোচে একজন অপরিচিত পুরুষকে জানাতে পারে—বৈজ্ঞানিক সমীক্ষার খাতিরে। কিন্তু মা-বাবার কথাটা তার কাছে টাবু! শ্যামলী আন্তরিকভাবে চায় না তার মা গিয়ে এ-কথা কাউকে বলুক। তাই এই আতঙ্কের অভিনয়। চিন্তায় ছেদ পড়ল শ্যামলী আবার টেলিফোনে কথা বলে ওঠায়—ডঃ ত্রিবেদীর প্রবন্ধটা স্টেটসম্যানে বার হয়েছে। আমি পড়েছি, প্রণবও পড়েছে। আমরা অনেক আলোচনা করেছি এ নিয়ে। প্রণবের মতে এটা খুবই ভাল কাজ হচ্ছে।

আবার অন্যমনস্ক হয়ে পড়ে করবী। শ্যামলী তার স্বামীর গর্বে গরবিনী। প্রণবের সঙ্গে সে এ বিষয়ে আলোচনা করেছে। আর সবাই বাধা দিচ্ছে বটে, কিন্তু শ্যামলীর সদ্যবিবাহিত আধুনিক স্বামীর এতে একটুও আপত্তি নেই। এই কথাটা ঘোষণা করতেই শ্যামলী উদগ্রীব। বকবক করে এক নাগাড়ে বকে চলেছে, ও বলছিল, জন্ম-নিয়ন্ত্রণ যখন একটা স্বীকৃত পরিকল্পনা, তার জন্য সরকার যখন কোটি কোটি টাকা ব্যয় করতে প্রস্তুত, করছেনও, তখন ওভাবে অন্ধকারে ঢিল ছুঁড়লে চলবে না। সমস্যাটার প্রকৃত জাতনির্ণয় এ ভাবেই হতে পারে। জুতোর

কোথায় কাঁটা উঠেছে বুঝবে সেই যে জুতোজোড়া পায়ে দিচ্ছে। এতদিন এঁরা যেটা করছিলেন সেটা হচ্ছে জলে-না-নেমে সাঁতার শেখানো। সমস্যাটা কী, কার কাছে সেটা কী-ভাবে দেখা দিচ্ছে—কী-কী অসুবিধা হচ্ছে, কে কী চায়, না জেনে কোটি কোটি টাকার কন্ট্রাসেপটিভ বিলিয়ে গেলেই চলবে না। এ পরিকল্পনা বাস্তবায়িত করতে হলে ওঁদের আসতে হবে এই আমার-আপনার কাছেই। যারা আজও এ সমস্যাটার মুখোমুখি হচ্ছে প্রত্যহ।

—'আমার-আপনার' নয় শ্যামলী। আমি বাদ।

মরমে মরে যায় শ্যামলী। সামলে নিয়ে বলে, আমি কিছুই ভুল বলিনি করবীদি! আপনাকে আজ সে সমস্যার সম্মুখীন হতে হচ্ছেনা বটে কিন্তু একদিন হতে হয়েছিল। আপনার সে অভিজ্ঞতাটুকুরও দাম আছে বইকি! কিছু মনে করবেন না করবীদি, আমার তো মনে হয়েছে আপনার কেসটা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ওঁদের কাছে।

—আমার কেসটা! কেন?

—রাগ করবেন না বলুন?

কৌতূহলই জয়ী হল। করবী বললে, রাগ করব কেন? বল না?

—আমার তো মনে হয়েছে ঐ লাল-ত্রিকোণই আপনার জীবনে সর্বনাশ হয়ে দেখা দিয়েছে! ও ভুল না করলে আজ হয়তো আপনার সংসার এমন শ্মশান হয়ে থাকত না। জীবনে একটা অবলম্বন খুঁজে পেতেন!

করবী স্তম্ভিত হয়ে যায়। তার কথা শ্যামলী এমন করে ভেবেছে!

শ্যামলী তাগাদা দেয়, কী? ঠিক বলিনি?

করবী লোভ সামলাতে পারে না। দেখাই যাক না, জবাবে ও কী বলে! লালগড়ের সতী-সাধ্বী শহীদের বিধবার প্রতি অন্তত শ্যামলীর কী ধারণা! তাই করবী বলতে পারল, ঠিক কি না তা আজই কেমন করে বলতে পারব শ্যামলী? এমনও তো হতে পারত যে, সেই অবলম্বনটাই আবার প্রতিবন্ধক হয়ে দেখা দিত আমার কাছে—নূতন করে সংসার পাতবার আয়োজনে?

জবাব দিতে দেরী হল শ্যামলীর। তারপর বললে, এ কথা সত্যি?

—কী কথা?

—না, কিছু না!

—তা হলে তুমি আসছ তো?

—আসব তো বটেই। ডঃ ত্রিবেদীর কাছ থেকে আমরা কত কী শিখতে পারি। আমাদের যৌনজীবনে সমস্যার তো অন্ত নেই—

boiRboi.net

করবী প্রতিবাদ করে, ভুল করছ শ্যামলী। ডঃ ত্রিবেদী আমাদের সমস্যার সমাধান করতে আসছেন না আদৌ। তিনি তাঁর সমস্যার সমাধান খুঁজতেই বরং আসছেন আমাদের কাছে। প্রশ্ন তিনিই করবেন, আমরা জবাব দেব।

—জানি। কিন্তু আমাদের মত হাজার হাজার বিবাহিত মেয়ের সমস্যা আর সমাধানের কথা যখন তাঁর রিপোর্টে ছাপা হবে তখন আমরাই আবার তা থেকে উপকৃত হব। তাই নয়?

—তাই আশা করা যাক। আচ্ছা, রাখি তাহলে—

টেলিফোন কেটে দেয় করবী।

তৎক্ষণাৎ ঘড়ির দিকে নজর পড়ে শ্যামলীর। সর্বনাশ! দশটা বেজে দশ! ড্যাডি নিশ্চয় এতক্ষণ ব্রেকফাস্ট টেবিলে গিয়ে বসেছেন। অথচ প্রণবের এখনও স্নান সারা হল না। বাথরুমের কাছে সরে এসে ডাকলে, এই!

কলের জলের শব্দটা বন্ধ হল। রুদ্ধদ্বারের ওপার থেকে প্রণব প্রশ্ন করে, কী বলছ?

—দশটা দশ হয়ে গেছে। একটু হাত চালাও। আমি নিচে যাচ্ছি।

রুদ্ধদ্বারের ওপার থেকে কোন সাড়া পাওয়া গেল না। কলের জলের শব্দটা শুরু হল আবার। শ্যামলী দ্রুতপায়ে নেমে যায় একতলায় ডাইনিং রুমে।

জি. এম-এর বাঙলোটা প্রকাণ্ড। দ্বিতল বাড়ি। পিছন দিকে সার্ভেন্টস্ কোয়ার্টার্স, গ্যারেজ। একতলায় ড্রয়িং, ডাইনিং, লাইব্রেরী, গেস্ট রুম, কিচেন-প্যান্ট্রি-স্টোর ইত্যাদি। দ্বিতলে চারখানি স্বয়ংসম্পূর্ণ শয়ন কক্ষ এবং একটি লিভিং রুম। পুবদিকের ঘর দুটি আছে শ্যামলী আর প্রণবের দখলে, দক্ষিণ দিকের দুটি গৃহকর্তার আর কর্ত্রীর।

শ্যামলী ওর বাপ-মায়ের একমাত্র সন্তান। বলা বাহুল্য—বড় আদরের। মায়ের না হলেও বাপের সে চোখের মণি। তাই বলে মেয়েকে আদরে-গোবরে মানুষ করেননি। বরং যথেষ্ট কড়া শাসনেই মানুষ করেছেন। ডঃ ত্রিদিবেশ ব্যানার্জি একজন কৃতী পুরুষ। জীবনের সব পর্যায়েই। বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি উজ্জ্বল রত্ন ছিলেন। বিজনেস্ ম্যানেজমেন্টে ফার্স্ট-ক্লাস-ফার্স্ট হয়েছিলেন। মেয়েকে প্রথমে ভর্তি করেছিলেন দার্জিলিঙ-এর এক কনভেন্ট-স্কুলে। মেয়েও বাপের মত কৃতী ছাত্রী। সব বিষয়েই বরাবর ভাল নম্বর পেয়েছে, কিন্তু শেষ রক্ষা হল না। মাদার সুপিরিয়র ডঃ ব্যানার্জিকে গোপনে জানালেন তাঁর কন্যাটি ল্যাভে' পড়বার উপক্রম করছে। সংবাদ পেয়ে ডঃ ব্যানার্জি তখনই

boiRboi.net

ছুটেছিলেন দার্জিলিং-এ। স্কুল থেকে মেয়ের নাম কাটিয়ে এনে রেখেছিলেন নিজের কাছে। শুভার্থীরা অবাক হয়েছিলেন, বন্ধু-বান্ধবেরা ক্ষুব্ধ, রত্না মর্মাহতা—কিন্তু কিছুতেই মত বদলায়নি ব্যানার্জি সাহেবের। স্কুল-কলেজে আর পড়তে পাঠাবেন না মেয়েকে। দশগুণ খরচ করে গৃহ শিক্ষকের আয়োজন হল। ব্যানার্জি সাহেবের যুক্তি অকাট্য—ডিগ্রি নিয়ে কী হবে শ্যামলীর? সে তো আর কোনদিন চাকরি করতে যাবে না। আর শিক্ষা? নিশ্চয়ই দেবেন। তার জন্যে স্কুলে যাবার কী প্রয়োজন? দেবেন ঠাকুরের ছেলেরা স্কুলে যায়নি বলে কি অশিক্ষিত রয়ে গেছে?

শ্যামলী বাপের যতই আদুরে হ'ক, বাবের মত ভয় করত তাঁকে। প্রতিবাদ করবার সাহস ছিল না তার। বাইরে প্রেম হচ্ছিল যে ছেলেটির সাথে অবস্থা বুঝে সে কর্পূরের মত উপে গেল। বাড়িতে থেকেই শ্যামলী শিখেছে—ইতিহাস, ভূগোল, দর্শন, অর্থনীতি, মায় ফরাসী ভাষাও। তারপর একদিন। শোনা গেল ত্রিদিবেশ কন্যার সম্বন্ধ করে এসেছেন। নামধাম পরিচয় শুনে রত্না এবারও বেঁকে বসেছিলেন। ভাল ছাত্র, কিন্তু বাপ-মা নেই;—মধ্যবিত্ত ঘরের ছেলে। এবারও রত্নার অভিমান টেঁকেনি। শ্যামলী এবার হয় তো রুখে দাঁড়াতো; কিন্তু হবু-বরকে দেখে তার সব ভুল হয়ে গেল। প্রণব অপূর্ব সুন্দর দেখতে। প্রথম দর্শনের পর শ্যামলীর মনে হয়েছিল মিকেলাঞ্জেলোর ডেভিড বুঝি ফ্লোরেন্স থেকে চলে এসেছে ওদের বাড়ি!

প্রণব ওর চেয়ে পাঁচ বছরের বড়। শ্যামলীর বিয়ে হয়েছে মাত্র দু'বছর। এখন ওর বয়স তেইশ, প্রণবের আঠাশ। প্রণব এম. এ.-তে ফার্স্ট ক্লাস পেয়েছিল। তারপর পড়েছিল ল'। পরীক্ষা দু বছর বন্ধ থাকায় পাশ করে বের হতে আরও দেরী হল। চাকরি-বাকরি মনের মত পায়নি। ছেলে পড়িয়ে কোনক্রমে মেস-এ থেকে দিন গুজরান করছিল, আর প্র্যাকটিসে বার হবে কিনা তাল ভাঁজছিল; ঠিক এমন সময় ডঃ ত্রিদিবেশ ব্যানার্জির নজর পড়ল তার উপর। কাকা ছিলেন সামাজিক মতে ওর অভিভাবক। এতবড় মানুষটাকে বৈবাহিকরূপে পাবার সম্ভাবনায় আত্মহারা হয়ে পড়েছিলেন তিনি। প্রণব প্রথমটা রাজী হয়নি। একটা রোজগারপাতি শুরু না করে সে বিয়ে করে কোন আক্কেলে? কিন্তু তার সে আপত্তিও ধোপে টেঁকেনি। ডঃ ব্যানার্জি সে-কথা শুনে ওর হাতে ধরিয়ে দিয়েছিলেন একটি নিয়োগপত্র। বলেছিলেন, তোমাকে ওব্লাইজ করছি না। আমাদের লীগাল অ্যাডভাইসরের সত্যই একজন

boiRboi.net

অ্যাসিস্ট্যান্ট দরকার। এজন্য আমরা দরখাস্ত আহ্বান করেছিলাম যখন, তখন তোমাকে আমি চিনতাম না। আর যে কটি দরখাস্ত আমরা পেয়েছি তাদের মধ্যে তোমার রেজাল্টটা সবচেয়ে ভাল কিনা সেটা নিজেই যাচাই করে দেখতে পার।

তবু ইতস্তত করছিল প্রণব। সে মনস্থির করে ফেলল শ্যামলীকে দেখার পর। শ্যামলী কিছু আহামরি সুন্দরী নয়। রঙ তার কালোই, কিন্তু মুখশ্রী ভাল। ওর চোখের দৃষ্টিতে কী যেন একটা আছে—সেটা বুঝিয়ে বলতে পারে না প্রণব; কিন্তু বোঝানোর দরকারই বা কী? ফলেই তো পরিচয়। প্রণব বিয়ের পিঁড়িতে বসতে রাজী হল।

এখন সে লালগড় অফিসের ল-সেকশনে ডু-নম্বর অফিসার। আইন মোতাবেক তার পৃথক সি-টাইপ কোয়ার্টার্স পাওয়ার কথা; কিন্তু ডঃ ব্যানার্জি আপত্তি করলেন। কী দরকার হাঙ্গামা করে? এই জি. এম. এর কোয়ার্টার্সে তো আর স্থানাভাব হচ্ছে না। এ-ক্ষেত্রেও প্রণব প্রথমটা আপত্তি করেছিল। শ্যামলীর আগ্রহে শেষ পর্যন্ত তাকে রাজী হতে হয়েছে।

শ্যামলী নিচে এসে দেখে ইতিমধ্যে ব্যানার্জি-সাহেবের ব্রেকফাস্ট শেষ হয়েছে। ন্যাপকিনে মুখটা মুছে পাইপ ধরাচ্ছেন তিনি। অন্যদিন প্রণবও ওঁর সাথে খায়। আজ সে এখনও নামেনি। ব্যানার্জি সাহেবকে খাদ্য পরিবেশন করবার খিদমদ্‌গার যথারীতি সেবাযত্ন করেছে; কিন্তু এই বিশেষ সময়টিতে শ্যামলী উপস্থিত না থাকলে তিনি যেন ক্ষুণ্ণ হন। রত্না দেবীর পক্ষে বারে বারে উপর-নিচ করা অসুবিধাজনক। তাই এ দায়িত্বটা শ্যামলীর উপরেই বর্তেছে।

অপ্রস্তুত মুখে শ্যামলী বলে, ওমা তোমার খাওয়া হয়ে গেল? এমন অসময়ে কর্তাদি ফোন করলেন।

ব্যানার্জি-সাহেব বলেন, তাতে কি হয়েছে? এরাই তো আছে। আমার অসুবিধা হয়নি কিছু। প্রণব বুঝি এখনও তৈরা হতে পারেনি?

শ্যামলী বিব্রত বোধ করে। বলে, কি জানি, দেখিনি। স্নানে তো ঢুকেছে অনেকক্ষণ।

অ্যাশট্রের গর্ভে কাঠিটাকে নিক্ষেপ করে ব্যানার্জি উঠে পড়েন। বলেন, আমি আর দেরী করতে পারছি না। গিয়ে না হয় গাড়িটা পাঠিয়ে দেব।

শ্যামলী বলতে গেল, গাড়ি পাঠানোর দরকার নেই; কিন্তু তার আগেই উনি বলে বসেন, তুই ওকে বড় বেশী প্রশ্রয় দিচ্ছিস কিন্তু শুমু। অন্তত অফিস-টাইমটা ওকে মেন্‌টেন করতে দে!

boiRboi.net

যেন শ্যামলীই সারা সকালটা ওকে আগলে রেখেছিল! একটা কড়া প্রতিবাদ হয়তো করে বসত, তার আগেই সাহেবের ফোলিও ব্যাগ হাতে বেয়ারাটা এসে দাঁড়ায়। ব্যানার্জি রওনা হয়েছিলেন। দ্বারের কাছে দাঁড়িয়ে বলেন, বিকালে যাবি নাকি ক্লাবে? তাহলে অফিস থেকে ওখানেই সোজা চলে যাই।

ক্লাব বলতে টেনিস ক্লাব। শ্যামলী যেদিন যেতে রাজী হয় সেদিন ব্যানার্জি-সাহেব অফিস থেকে সোজা টেনিস ক্লাবেই চলে আসেন! ওখানেই বেশ পরিবর্তন করে, খেলে, ঘর্মাক্ত কলেবরে ফিরে আসেন বাড়ি। আবার কোন কোন দিন ওখানেই স্নান এবং নৈশ আহার সেরে ফেরেন দুজনে। এ ব্যবস্থা প্রায় বাঁধাধরা নিয়মেই পর্যবসিত হয়েছিল শ্যামলীর বিয়ের আগে। বিয়ের পর এ ব্যবস্থাটা স্বতই পাল্টে গেল। শ্যামলীর বিয়ের পরে প্রথম প্রথম সন্ধ্যাযাপনের অন্য প্রোগ্রাম করতে বাধ্য হত—সেখানে ত্রিদিবেশের কোন ভূমিকা ছিল না। তাই আজ হঠাৎ ঐ প্রশ্নে একটু বিব্রত হয়ে পড়ল শ্যামলী। তার মনে হল, ড্যাডি যেন বিশেষ কোনও কারণে ওকে আজ ক্লাবে যেতে বলছে। প্রণবের উপর রাগও হচ্ছিল প্রচণ্ড। কেন সে রোজ রোজ দেরী করবে?

—কি হল রে? যাবি আজ ক্লাবে?

—যাব ড্যাডি। ক'টায়?

—পাঁচটা!

—ও. কে.!

শ্যামলী যখন মিসেস্ স্মিথের ফ্ল্যাটে ফোন করল তখন বেলা সাড়ে চারটে। ইচ্ছে করেই সকালে সে ফোন করেনি, কারণ জানতো মিসেস্ নোয়ামি স্মিথ, তখন বাড়িতে নেই, ডিউটিতে বেরিয়ে গেছেন। মিসেস্ স্মিথ এখানকার হাসপাতালের চীফ মেট্রন নার্স। বয়স বছর ত্রিশ পঁয়ত্রিশ। বিধবা। থাকেন

BanglaBook.net

ডি-টাইপ কোয়াটার্সে—টাউনশিপের উত্তর প্রান্তে, হাসপাতাল থেকে বেশ কিছুটা দূরে। দু কামরার ছোট ফ্ল্যাট ; তার চেয়ে বড় ফ্ল্যাটের প্রয়োজনও নেই তাঁর। সংসারে কুল্লে দুটি তো প্রাণী। মিসেস্ স্মিথ আর তাঁর কন্যা—কেটি। মেয়েটি পড়ে স্থানীয় হাইস্কুলে—এবার স্কুল ফাইনাল দেবে। শ্যামলী আশা করেছিল বিকাল সাড়ে চারটে নাগাদ মিসেস্ স্মিথ্‌কে বাসায় পাবে। পেল না। ফোন্ ধরল কেটি।

—কে শ্যামলীদি ? না মা তো ডিউটি থেকে ফেরেনি এখনও।

—ও !

—মা ফিরে এলে কি আপনাকে রিং ব্যাক করতে বলব ?

—না, আমি একটু পরেই বেরিয়ে যাব। টেনিস ক্লাবে। আমিই বরং সন্ধ্যার পর আর একবার ট্রাই করব—আচ্ছা কেটি, বলতে পার, তোমার মা কি আজ-কালের মধ্যে মহিলা সমিতির একটা নিমন্ত্রণ পেয়েছেন ? শনিবারের একটা মিটিঙে—

—পেয়েছে। ডঃ ত্রিবেদীর বক্তৃতা শুনতে তো ? মা যাবে।

—ও ! তুমি ব্যাপারটা জান দেখছি। ঐ জন্যেই ফোন করেছিলাম। মাকে বল, আমি বিশেষভাবে অনুরোধ করেছি—উনি যেন বক্তৃতা শুনতে আসেন।

—বলব ! কিন্তু কই শ্যামলীদি, আপনি তো আমাকেও নিমন্ত্রণ করলেন না।

—তোমাকে ? না, মানে এ মিটিঙে শুধু বিবাহিত মহিলারাই—

—কেন ? বক্তৃতা শুনে আসতে দোষ কি ? আপনারা তো ডক্টর মিস্ দত্তাকেও নিমন্ত্রণ করেছেন···

—ওরে ফাদার ! তুমি সে খবরও রাখ ? কিন্তু তোমার সঙ্গে ডঃ দত্তার ফারাকটা নিশ্চয় তুমি অনুভব করতে পার। তিনি একজন লেডি ডাক্তার, প্রৌঢ়া ; আর তুমি···

—আমি কা ? বলুন থামলেন কেন ?

শ্যামলীর মনে পড়ে গেল নিজের বয়ঃসন্ধির কথা। সেই যখন সে দার্জিলিঙের স্কুলে পড়ত। রহস্যময় ঐ গোপন জগৎটার সম্বন্ধে তার যখন ধারণা ছিল না, অথচ জানবার দুরন্ত কৌতূহল ছিল। সহপাঠিনী বা সিনিয়ারদের কাছে দু-একটা ইঙ্গিত পেত আর কল্পনা করত এটা-সেটা। কেটিরও আজ সেই বয়স। ওর চিন্তার সূত্র ছিঁড়ে গেল কেটি আবার কথা বলে ওঠায়, আপনারা নিমন্ত্রণ করুন আর না করুন, আমি কিন্তু যাচ্ছি বক্তৃতা শুনতে।

—এই না ! পাগলামী কর না। তোমার মা জানতে পারলে—

BanglaBook.net

—মাকে জানিয়েই যাব। মা আপত্তি করবে না।

—মা না করলেও প্রমীলাদি করবেন। গেটে তোমাকে আটকালে সে বড় বিশ্রি ব্যাপার হবে কেটি, প্লীজ···

—জাস্ট এ মিনিট শ্যামলীদি, একটু ধরুন। মা এসে গেছে।

মায়ের আগমনটা চোখে না দেখলেও কানে শুনে বুঝতে পেরেছিল কেটি। একটি স্কুটার এসে থামল প্রবেশদ্বারের কাছে। মিসেস স্মিথ, ইদানীং বাসে যাতায়াত করছেন না। ওঁদের পাশের ফ্ল্যাটের বাসিন্দা মিস্টার রঙ্গচারী ওঁকে আজকাল লিফ্‌ট্ দিচ্ছেন তাঁর স্কুটারে। রঙ্গচারী অ্যাকাউন্টস্ ডিপার্টমেন্টের কনিষ্ঠ অফিসার। তাঁর অফিস যাবার পথেই পড়ে হাসপাতালটা। কেটির অনুমান ঠিক। মিসেস্ স্মিথই এসেছেন।

—হ্যালো, কে? শ্যামলা নাকি? বল, কী খবর?

—আপনি শনিবার লেকচারে আসছেন তো?

—অফকোর্স! আমরা দুজনেই যাচ্ছি—

—দুজনেই মানে? কেটিকে নিয়ে?

—হ্যাঁ!

শ্যামলী একটু মৃদু আপত্তি জানায়। বিশেষ জোর দেয় না। ভাবে, কী দরকার তার এ নিয়ে কচকচি করা? সে বরং করবীদি অথবা প্রমীলাদিকে আশঙ্কার কথাটা জানিয়ে দেবে। তারপর তাঁরা যা ভাল বোঝেন করবেন। কিছুটা 'খেজুরে' আলাপের পর শ্যামলী লাইন কেটে দেয়। এমনিতেই আজ তার মনটা ভাল নেই। প্রণবের সঙ্গে কথা কাটাকাটি হয়েছে। প্রণব অফিসে যায়নি, বাড়িতেও থাকেনি। সারাটা দুপুর শ্যামলী আপন মনে ফুঁসেছে। এবার তাকে টেনিস ক্লাবে যাবার জন্য প্রস্তুত হতে হবে। তাই লাইনটা সে কেটে দেয়।

মিসেস্ স্মিথ, রিসিভারে টেলিফোনটা নামিয়ে রেখে মেয়েকে বলে, আশ্চর্য মানুষ এরা! এদিকে মহিলা সমিতি করে আধুনিকতার প্রচার করছেন, ডঃ ত্রিবেদীকে এনে লেকচার দেওয়াচ্ছেন, অথচ ছেলেমেয়েদের জীবনে চরম সত্যটাকে জানিয়ে দিতে আজও ওঁদের ঘোর আপত্তি। থিওরেটিক্যালি সবাই মেনে নিতে প্রস্তুত, কিন্তু তার বাস্তব প্রয়োজনের কথা বললেই এঁরা আঁৎকে ওঠেন। বাল্যে, কৈশোরে যৌনবিজ্ঞান ওঁদের কাছে ট্যাবু!

—তোমাদের আমলে কেমন ছিল মামী? তুমি আমার সঙ্গে যেভাবে খোলাখুলি সব কথা বল, তোমার মা কি তোমাকে···

boiRboi.net

—না রে কেটি; আমার সে সৌভাগ্য হয়নি। আমার মা শৈশবেই তো মারা গিয়েছিলেন, বাবার কাছে মানুষ হয়েছিলাম আমি।

—কিন্তু তিনি কি তোমায়··· ?

—না! সেটা সে আমলে সম্ভব ছিল না। এখন চিন্তাধারা পালটাচ্ছে তো···

কেটি ফস্ করে বলে বসে, তোমার কী মনে হয়? আমিও যদি তোমার মত বাল্যেই তোমাকে হারাতাম, আর ড্যাডি বেঁচে থাকতেন তাহলে কি আমাকে তিনি এমনিভাবে সব খোলাখুলি বলতেন?

নোয়ামি তখনও নার্সের পোশাক ছাড়েনি। টেলিফোনটা রেখে দিয়ে সে বাথ-রুমের দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল। এ-কথায় থেমে পড়ে। একটু ভেবে নেয়। তারপর বলে, বোধহয় বলতেন, কারণ তিনি ছিলেন বিজ্ঞান-শিক্ষিত মানুষ। ডাক্তার।

হঠাৎ একটা অপ্রাসঙ্গিক কথা বলে বসে কেটি, কিন্তু, ড্যাডির কোন ফটো তোমার কাছে কেন নেই মম্?

নোয়ামি বিরক্ত হয়: কতবার বলব তোমাকে? আগুনে সব পুড়ে গিয়েছিল না?

আর বাক্যব্যয় না করে নোয়ামি বাথরুমে ঢুকে যায়। কেটি চুপ করে বসে থাকে। আকাশ-পাতাল ভাবতে থাকে। ভাবে তার অদেখা-অচেনা ড্যাডির কথাই। কেমন মানুষ ছিলেন তিনি? কেমন দেখতে ছিল তাঁকে? কেটির শৈশবেই মারা গিয়েছিলেন ডঃ স্মিথ। মায়ের কাছে তাঁর কথা শুনেছে শুধু। কোন ছবি দেখেনি, তাঁর হস্তাক্ষর পর্যন্ত চেনে না। নোয়ামি যে হাসপাতালে নার্সের চাকরি করত, সেখানকার ডাক্তার ছিলেন ডঃ অ্যাডাম স্মিথ। কেটি যখন এক বছরের শিশু তখন মারা যান তিনি। নোয়ামির বয়স তখন মাত্র উনিশ। দ্বিতীয়বার বিবাহ করতে সম্মত হয়নি নোয়ামি। ডঃ স্মিথের স্মৃতিটুকুই ছিল তার দীর্ঘ বৈধব্যজীবনের একমাত্র পাথেয়। আর ছিল কেটি। বুকের পাঁজরার মত মানুষ করে তুলেছে তাকে। সব ঝড়ঝঞ্ঝা থেকে আড়াল করে। বিধ্বংসী আগুনে নাকি একবার ওদের বাড়ির সব কিছু পুড়ে যায়। ডঃ স্মিথের যা-কিছু স্মৃতিচিহ্ন ওর মায়ের কাছে ছিল তা নিঃশেষিত হয়ে গেল আধঘণ্টার মধ্যে। তবু ভেঙে পড়েনি নোয়ামি। নূতন করে জীবন শুরু করেছিল আবার। এসব কথাই জানা আছে কেটির। মা-মেয়ের এই জীবনে সে অভ্যস্ত হয়ে গেছে। তবু আজ তার মনের মধ্যে নতুন করে ঝড়ের সঙ্কেত অনুভব করছে সে। এতদিন ছোট ছিল, এখন বড় হয়েছে। অনেক কিছু বুঝতে পারে আজকাল। মা বরাবর বলে

boiRboi.net

এসেছে এই দুনিয়ায় সেই ছিল তার একমাত্র অবলম্বন। ইদানীং কেটির মনে হচ্ছে এ-কথার মধ্যে রয়ে গেছে বিরাট একটা ফাঁকি। সে যদি না জন্মগ্রহণ করত, তাহলে ওর মা নিশ্চয় আবার বিয়ে করত। নূতন করে সংসার পাততে। জীবনকে আকণ্ঠ পান করবার সুযোগ পেত। মায়ের সেই স্বাভাবিক জীবনের পরিণতির পথে কেটি নিজেই কি ছিল একটা মূর্তিমান প্রতিবন্ধক? কিন্তু সন্তান সমেত কি কেউ দ্বিতীয়বার বিবাহ করে না? করে। তখন সেই বিপিতাকে জন্মদাতা পিতার মতই সম্মান দিতে হয়। ওদের সমাজে এটা তো আকছার হতে দেখেছে কেটি। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ—সে বিড়ম্বনার মধ্যে তিনি কেটিকে ফেলেননি। কিন্তু বিড়ম্বনাই বা কিসের? ঐ পাশের ফ্ল্যাটের মিস্টার রঙ্গচারী যদি হতেন ওর বিপিতা তাহলে কি কেটি সেটা মেনে নিতে পারত না? রঙ্গচারী! আশ্চর্য! এতলোক থাকতে ঐ প্রৌঢ় ভদ্রলোকের কথাই বা তার মনে হল কেন? হল, তারও কারণ আছে। সেই কারণটা এই যে, কেটি আজ আর ছেলেমানুষ নয়। সে অনেক কিছু বুঝতে পারে। এটুকু সে বুঝেছে আজ যদি হঠাৎ সে কর্পূরের মত উপে যেতে পারে, হঠাৎ হারিয়ে যেতে পারে, তবে তার মাম্মী বুক-ফাটা কান্না কাঁদবে। কাঁদবে, কাঁদবে আর কাঁদবে। তারপর চোখ মুছে উঠে বসবে আবার। তারপর?

জীবনের দাবী বড় কঠিন দাবী। মিছরির মতো দানা বেঁধে উঠবার উপাদানটা তখনই সার্থক হয় যখন মাঝখানের সুতোটাকে সে খুঁজে পায়। ওর মাম্মীও সেই কেটিহীন শূন্য সংসারে অন্ধকারে হাত বাড়িয়ে একটা সুতো খুঁজে বেড়াতো। কেটি জানে, সে সুতোটা রয়েছে পাঁচইঞ্চি পার্টিসান দেওয়ালের ওপারেই।

একটু পরেই বাথরুম থেকে বেরিয়ে আসে নোয়ামি। চুপ করে বসে থাকা কেটিকে উদ্দেশ্য করে বলে, বিকালে বেড়াতে যাবি না? আজ না তোর ডেট?

চট করে উঠে দাঁড়ায় কেটি। বলে, না ববকে আসতে বারণ করে দিয়েছি।

—বারণ করে দিয়েছিস? কেন? ও কি বেশী ইয়ে করে?

—সেজন্য নয়, মা। ওর কথাবার্তা আমার ভাল লাগে না—

—তাহলে বারণ করে ঠিকই করেছিস। কথাবার্তা ভাল লাগে না মানে? কী-জাতের কথা বলে? অশ্লীল?

—হ্যাঁ, অশ্লীল তো বটেই···

—কী, শুনি না? আমার কাছে আবার লুকাবার কী আছে?

—না! সে তোমার শুনে কাজ নেই।

নোয়ামি বসে পড়ে কেটির পাশে। ওর মাথাটা টেনে নেয়। বলে, কেটি,

boiRboi.net

আমি তো শুধু তোর মা নই, আমি যে তোর বন্ধু! আমার কাছে কোন কিছুই যে লুকাতে নেই। বল্ দেখি, কী-জাতের কথাবার্তা বলে সে! আমাকে সবটা জানতে দে···

মেদিনীনিবদ্ধ দৃষ্টি কেটি সে প্রসঙ্গ এড়িয়ে বলে, আমার বিষয়ে কিছু বলেনি। তোমার বিষয়ে বলছিল···

নোয়ামির হাত দুটি আল্‌গা হয়ে যায়। অস্ফুটে বলে,—আমার বিষয়ে! আমার বিষয়ে কী বলেছে ডেভিড?

—ওসব নোংরা কথা তোমার শুনে কী লাভ বল?

—না! আমাকে বল্! আমার জানা দরকার!

—ঐ যে আজকাল আংকল তোমাকে স্কুটারে করে লিফট্ দিচ্ছেন না—তাই; যাক্‌গে ওসব কথা! চল চা খাওয়া যাক্!

নোয়ামির মুখটা সাদা হয়ে যায়! এতদূর? মিস্টার রঙ্গচারী একজন প্রৌঢ় মানুষ। বিপত্নীক একা মানুষ। নোয়ামি নিজেও পঁয়ত্রিশ বছরের মহিলা। তাঁর মেয়েই এখন ডেটিং করছে। আর ঐ উনিশ বছরের বব্ ছোকরা নোয়ামি আর রঙ্গচারীজীকে নিয়ে অশ্লীল রসিকতা করছে?

—এস মাম্মী! চা খাবে এস।

তিনজোড়া সবুজ গাল্‌চে-মোড়া টেনিস-লনের উপর যেন হুমড়ি খেয়ে পড়ছে এই ক্যান্টিলিভার বারান্দাটা। একতলায় 'বার', টেবিল-টেনিসের ঘর, তাসের আড্ডা, সারি-সারি বাথরুম আর টয়লেট; ছেলেদের, মেয়েদের। দ্বিতলে দুটি গেস্ট-রুম। কোন খেলোয়াড় দু-একদিনের জন্য এলে যাতে ক্লাবেই বাস করতে পারেন। আর এই প্রকাণ্ড ক্যান্টিলিভার বারান্দাটা। ইতস্তত ছড়ানো কিছু বেতের সোফা আর বেতের টেবিল। আদ্যন্ত সবুজ রঙ করা। পর্দার রঙও সবুজ,

boiRboi.net

দরজা-জানলাতেও ঐ রঙ—যেন টেনিস-লনের সবুজাভা এই ঝুঁকে থাকা বারান্দা পর্যন্ত ধাওয়া করেছে। এ কোণায় ও কোণায় কেউ কেউ বসে নীরবে পান করছেন, কোথাও বা যুগল-কূজন। একেবারে কোণাটি দখল করে বসেছে শ্যামলী। নিয়েছে একটা জিন-উইথ-লাইম। তার পরনে মিনি-স্কার্ট, পায়ে ক্যাম্বিসের জুতো, পাশে র‍্যাকেট, চুলগুলো ঘোড়ার লেজের মত লাল ফিতে দিয়ে বাঁধা। লাল রঙের বেল্টও আছে ওর মাজায় বাঁধা। ওর পুরন্ত দেহভঙ্গিমায় ঐ বন্ধনীটুকুর বিশেষ ব্যঞ্জনা আছে। শ্যামলী সুন্দরী নয়, কিন্তু যাকে বলে ফিগার—দেহ-সৌষ্ঠব—তা ওর দেহের কানায় কানায় ভরা। ঐ লাল রঙের কোমরবন্ধনীর উপরে ও নিচে তার পুরন্ত যৌবনের দৃপ্ত ঘোষণা। শ্যামলীর কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম জমছে। বারে বারে তোয়ালে দিয়ে মুছেও এই ডিসেম্বরের শীতে সে ঘর্মস্রোতের নিরবচ্ছিন্ন ধারাকে প্রতিহত করতে পারছে না। পরপর তিন সেট খেলে এসে বিশ্রাম নিচ্ছে সে। ওর ড্যাডি এখনও খেলছেন। মনে হয় এই সেটই শেষ। যশোবন্ত এখনও এগিয়ে আছে চার-দুই সেট-পয়েন্ট-এ। পানপাত্রটা হাতে নিয়ে বারান্দা থেকে ঝুঁকে পড়ে খেলা দেখছে শ্যামলী। সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসছে। ঘড়িতে এখন পাঁচটা চল্লিশ। ড্যাডি সার্ভ করছিলেন। ডবল্ ফল্ট হল। শ্যামলী দুঃখিত হয়। কী দরকার অতিরিক্ত পরিশ্রম করার? ড্যাডি নিশ্চয় দৈহিক ক্ষমতার শেষ সীমায় পৌঁচেছে। না হলে এভাবে ডবল্ ফল্ট হয়? ডক্টর লাহিড়ীও বারে বারে বলছেন—এখন এত দৈহিক পরিশ্রম করা তাঁর ঠিক নয়। ডবল্‌স্ হলে তিন সেট, সিঙ্গল্‌স্ হলে দু-সেট—এই বরাদ্দ নির্দেশ করে দিয়েছেন তিনি। কিন্তু কে কার কথা শোনে? জি. এম. এখনও একাদিক্রমে চার-সেট খেলে থাকেন। কার ঘাড়ে দুটো মাথা যে বলবে—এবার আপনি ক্ষান্ত দেন স্যার? কিন্তু খেলার দিকে মনঃসংযোগ করতে পারছিল না শ্যামলী। তার মনটা আজ নানা কারণে উতলা হয়ে আছে। প্রথমত ড্যাডির যেন কিছু একটা বলবার কথা আছে। তাই যেন আজ ওকে ক্লাবে ডেকে এনেছেন। বলতে পার কেন? বাড়িতে কি নির্জন পরিবেশ নেই? সেখানে কি বাপবেটিতে নিভৃতে আলোচনা হতে পারে না? শ্যামলী জানে—তা হতে পারে। তবু ড্যাডি এই পরিবেশটা বেশী পছন্দ করেছেন একটা বিশেষ কারণে। এখানে শ্যামলী আর তার ড্যাডি দুজন বন্ধু—বাড়িতে সে বাপের মেয়ে, এখানে সে ড্যাডির পার্টনার। মিক্সড-ডবল্‌স্-এ জি. এম. বরাবর অংশ নিয়েছেন শ্যামলীকে পার্টনার করে। শ্যামলী জানে, এখানে যে-কথা স্বতঃ উৎসারিত ভঙ্গিতে বলতে পারবেন ত্রিদিবেশ, বাড়িতে তা পারবেন না।

আজ হঠাৎ অফিস যাবার সময় বলে উঠেছিলেন, কী হলরে, যাবি আজ ক্লাবে ?

কিন্তু ড্যাডি নয়, তার বেশী করে মনে পড়েছে প্রণবের কথা। প্রণবের দোষ-ত্রুটি—কই কিছুই তো নজরে পড়ে না শ্যামলীর। অত্যন্ত সুন্দর স্বাস্থ্য আর রূপ। পুরো ছয় ফুট লম্বা, টক্‌টকে গায়ের রঙ, ঠোঁট দুটি এত পাতলা আর লাল যে শ্যামলী প্রথম দর্শনে অবাক হয়ে ভেবেছিল, ও লিপ্‌স্টিক মাখে নাকি ? চোখ দুটি আয়ত, টিকালো নাক, কোঁকড়ানো চুল—হুবহু মিকেলাঞ্জেলোর ডেভিড। শুধু মুখখানা নয়, সারাটা শরীর !

যেমন দেখতে তেমন স্বভাব। কটু কথা বলতে জানে না। রাগারাগি, চেঁচামেচি করা তাঁর ধাতে নেই। শখের মধ্যে বই পড়া আর ছবি আঁকা। বই পড়ে রাজ্যের—বিষয়বস্তুর কোন ঠিক নেই। আর ছবি আঁকে শুধু ক্রেয়নে। জল রঙ নয়, তেল রঙ নয়, শুধু ক্রেয়নের স্কেচ। এখানে, এই বাড়িতে এসে সে যে অসুখী হয়েছে এমন মনে হয়নি শ্যামলীর। স্ত্রী-হিসাবে শ্যামলীকে পেয়ে যে ধন্য হয়ে গেছে, কৃতার্থ হয়ে গেছে, এমনও মনে হয় না। অথচ শ্যামলীকে সে আদর-সোহাগ প্রত্যাশিতভাবেই করে থাকে। লোকটা ভীষণ চাপা ধরনের। শ্যামলীর মনে হয় ওর অন্তরের অন্তস্তলে কী একটা বেদনার তল আছে—সেটা সে সবার কাছ থেকে গোপন করে বেড়ায়। এমনকি শ্যামলীরও সেখানে প্রবেশাধিকার নেই। কী সেটা, তাও জানে না। হ্যাঁ, মানতেই হবে শ্যামলীর সঙ্গে তার চরিত্রগত মিল নেই অনেক বিষয়ে। শ্যামলী সিনেমা-পাগল, প্রণবের সিনেমা দেখলেই মাথা ধরে; শ্যামলী টেনিস খেলতে ভালোবাসে, প্রণব র‍্যাকেট ধরতে জানে না; শ্যামলী সাঁতার কাটতে ভালবাসে, প্রণব সাঁতার জানলেও সুইমিং পুলে যেতে চায় না। শ্যামলী সারাটা শীতকাল সন্ধ্যায় যেমন টেনিস খেলে তেমনি সারাটা গ্রীষ্মকাল সন্ধ্যায় যায় সুইমিং পুলে। প্রণব ফলে সারাটা বছরই বিকাল-বেলা বসে বই পড়ে। বলতে পার, এমন হলে মনের মিল হবে কেমন করে ? তা বল, কিন্তু শ্যামলী তবু বলবে, মনের মিল ওদের হয়েছে। বৈপরীত্য কি সর্বক্ষেত্রেই বাধা ? চুম্বকের নর্থপোল কি নর্থপোলকেই চুম্বন করতে ছুটে আসে ?

কিন্তু আজকের ব্যবহারে শ্যামলী রীতিমত আহত হয়েছে। আজ সকালে প্রণব যখন বাথরুম থেকে বের হয়ে এল তার দশ মিনিট আগে জি. এম.-কে নিয়ে মার্সেডিস্‌খানা অফিসে বেরিয়ে গেছে। দ্বিতলে উঠে এসে শ্যামলী রুক্ষস্বরে বলেছিল রোজ রোজ তোমার লেট হয়ে যাচ্ছে ! ড্যাডি অসন্তুষ্ট হন, বুঝতে পার না ?

boiRboi.net

প্রণব চুল আঁচড়াচ্ছিল। আয়নার ভিতর দিয়েই শ্যামলীর দিকে তাকিয়ে বললে, রাগলে কিন্তু তোমাকে ভারী সুন্দর দেখায়!

ঝাঁজিয়ে ওঠে শ্যামলী, ন্যাকামী কর না। নিচে ব্রেকফাস্ট দিয়েছে রামদীন, খেয়ে এস।

—তুমি খাবে না?

—আমি পরে খাব। আমার তাড়া কি?

—তাড়া আছে বইকি—একসঙ্গে খাবার আনন্দ!

—বলছি না, আধিকোতা আমার ভাল লাগছে না এখন।

—তবে আমিও এখন খাব না। পরে খাব।

—কী ছেলেমানুষী করছ? এখনই গাড়ি ফিরে আসবে, তোমাকে নিয়ে যেতে। দু-দুবার পেট্রল খরচ!

প্রণবের চুল আঁচড়ানো শেষ হয়েছিল। এদিক ফিরে বললে, আমি আজ অফিস যাব না শমু। আজ আমার ফ্রেঞ্চ লীভ!

—ফ্রেঞ্চ লীভ! মানে, না জানিয়ে অফিস পালানো?

—অতটা নয়। এখনই মিস্টার মেহ্‌রাকে ফোন করে দিচ্ছি। চল্ আজ পাগলাঝোরা ঘুরে আসি। ট্যাক্সি নিয়ে যাব। তুমি আর আমি!

শ্যামলী অবাক হয়ে গিয়েছিল ওর প্রস্তাবে। পাগলাঝোরা লালগড় থেকে মাইল কুড়ি—যেখান থেকে পাহাড়টা শুরু হয়েছে, তারই পাকদণ্ডী পথে একটা ঝরনা। লালগড়ের বাসিন্দাদের জন্য লোভনীয় পিক্‌নিক স্পট্। কিন্তু অফিস কামাই করে প্রণব কোন আক্কেলে সেখানে যেতে চায়? অফিসে ওর কত দায়িত্ব।

শ্যামলী জবাবে বললে, তোমাদের সেই লেবার ট্রাইবুনালের কেসটা—

মাঝপথে তাকে থামিয়ে দিয়ে প্রণব বলেছিল, ওটা এখন মিস্টার মেহ্‌রাই ডীল করছেন। সিনিয়ার যখন স্বয়ং দায়িত্ব নিয়েছেন তখন জুনিয়ার ফ্রেঞ্চ লীভ ভোগ করতে পারেন নিশ্চয়।

শ্যামলী আহত হয়। কারণ ছিল। এই কাজটা তার প্রচেষ্টাতেই দেওয়া হয়েছিল প্রণবকে। এখানে কাজে যোগদানের পর থেকে প্রণবকে দেওয়া হত অফিসের কাজ। শ্যামলী বুঝতে পারত সেটা মনঃপূত নয় প্রণবের। তাই সে ইঙ্গিত দিয়েছিল ড্যাডিকে—প্রণবকে যেন অতঃপর কোর্টে সওয়াল করবার সুযোগ দেওয়া হয়। ড্যাডি ওর অনুরোধ রেখেছিলেন—প্রণব হয়তো ভিতরের কথাটা জানে না—কিন্তু এই লেবার-ট্রাইবুনালের কেসটা প্লীড করবার অনুমতি যে প্রণব

BanglaBook.org

পেয়েছে তার পিছনে ছিল শ্যামলীর অবদান। অথচ কী অনায়াস ভঙ্গিমায় এখন প্রণব বলতে পারছে যে, সে দায়িত্ব তার সিনিয়ার মেহ্‌রার স্কন্ধে চাপিয়ে সে বউ নিয়ে ফ্রেঞ্চ লীভ উপভোগ করতে পাগলাঝোরা ছুটতে চায়!

—যাও চট্‌ করে তৈরী হয়ে নাও। দুপুরে ওখানেই লাঞ্চ করব। ফিরতে রাত হয়ে যাবে।

শ্যামলী শুধু বলেছিল, সরি, আমার যাওয়া সম্ভব নয়। আজ বিকালে পাঁচটার সময় আমার একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে।

—অ্যাপয়েন্টমেন্ট! কোথায়? কার সঙ্গে?

—ড্যাডি পাঁচটার সময় আমাকে ক্লাবে যেতে বলেছে!

—ও! ড্যাডি!—দ্বিতীয়বার অনুরোধ করেনি প্রণব। অফিসেও যায়নি কিন্তু। ক্রেয়ন আর কাগজের বাণ্ডিলটা শান্তিনিকেতনী কাঁধ-ঝোলায় ভরে নিয়ে সে রওনা হয়ে গেল। পাগলাঝোরায় যায়নি নিশ্চয়; কিন্তু পাগলামি করতেই বেরিয়ে গিয়েছিল একা।

—হ্যালো, শমু! লাস্ট সেটটা হেরে গেলাম যশ্‌-এর কাছে—

শ্যামলী চোখ তুলে দেখতে পায় ঘর্মাক্ত কলেবরে ত্রিদিবেশ উঠে এসেছেন দ্বিতলে। শ্যামলী তার চিন্তার জগৎ থেকে নেমে আসে বর্তমানে।

একটু পরে ড্রিংস্‌-এর অর্ডার সার্ভ করার পর ত্রিদিবেশ বললেন, অনেক দিন পর তুই টেনিস খেলতে এলি, নয়?

—হ্যাঁ। তাই জন্যেই বোধ হয় দম পাচ্ছিলাম না।

ত্রিদিবেশ মুখটা কাছে এনে বলেন, তোকে একটা বিশেষ কথা আজ বলব বলে এখানে ডেকেছি শমু।

শ্যামলী সেটা জানে, তবু অবাক হবার ভান করে বলে, কী কথা?

—প্রণবের বিষয়ে।

এটাও আশঙ্কা করা ছিল শ্যামলীর, তবু এবারও তাকে অবাক হবার অভিনয় করতে হয়। নীরবে অপেক্ষা করে সে।

—তোর মনে আছে নিশ্চয়, মাসছয়েক আগে তুই আমাকে বলেছিলি প্রণব অফিসের কাজ করতে করতে 'বোরড্‌' হয়ে গেছে—

—হ্যাঁ, মনে আছে বইকি। তাই তুমি কী একটা মামলা পরিচালনার দায়িত্ব ওকে দিয়েছিলে—

—এক্‌জ্যাক্টলি! আমি দুঃখিত শ্যামলী, সেই মামলা পরিচালনার দায়িত্ব তার

boiRboi.net

কাছ থেকে প্রত্যাহার করে নিয়ে আমি মেহ্‌রাকে দিয়েছি। তার কারণটা অনুমান করতে পার ?

শ্যামলী চুপ করে থাকে। ভীষণ কান্না পাচ্ছে তার। অনুমান কেন করতে পারবে না ? কিন্তু প্রণবের এ অসাফল্যের হেতু নিশ্চয় তার অভিজ্ঞতার অভাব। চেষ্টার ত্রুটি সে নিশ্চয় করেনি। কিন্তু সেজন্য নয়, ওর খারাপ লাগছিল এই কথা ভেবে যে প্রণব এই ব্যর্থতাটাকে কী সহজ ভাবে নিল—নিজের অসাফল্যে কোথায় সে লজ্জিত হবে, তা নয় বৌ নিয়ে সে ফ্রেঞ্চ লীভ উপভোগ করতে চায়। হঠাৎ চিন্তায় ছেদ পড়ল ত্রিদিবেশ কথা বলে ওঠায়, না শমু, তুই যা ভাবছিস্ তা নয়।

—কী আবার ভাবছি আমি ?

—অভিজ্ঞতার অভাবে সে কেসটা ডীল করতে পারছে না—

—তাহলে কী ?

—তা যদি হত, তাহলে তোকে ডেকে সে-কথা এভাবে বলতাম না আমি। ব্যাপারটা তার চেয়ে বেদনাদায়ক ! ব্যাপারটা তাহলে খুলেই বলি—কেসটা ছিল শ্রমিক-মালিক সম্পর্কে। প্রণবকে কোম্পানি নিযুক্ত করেছিল কোম্পানির স্বার্থ দেখতে ; কিন্তু তার বিবেক নাকি বলছে কোম্পানিই অন্যায় করেছে ! তার সওয়াল শুনে মেহ্‌রার তাই মনে হয়েছে অন্তত। তার সঙ্গে আমার এ ব্যাপারে কথাও হয়েছে। মেহ্‌রার অনুমান ঠিকই। প্রণব আমার কাছে সে-কথা স্বীকারও করেছে—

বাধা দিয়ে শ্যামলী বলে ওঠে, এত কথা আমাকে বলার কি আছে ? তার বিবেকের নির্দেশে সে চলেছে, তোমরাও যা ভাল বোঝ কর—

—তোমাকে বলার প্রয়োজন হচ্ছে এই জন্য যে, প্রণব আমার কর্মচারীই শুধু নয়, সে আমার জামাই !

শ্যামলী গোঁজ হয়ে বসে থাকে।

ত্রিদিবেশ আবার 'তুমি' থেকে 'তুই'-তে নেমে আসেন। বলেন, ভুল বুঝিসনা আমাকে শমু। প্রণবের ক্ষতি হতে পারে এমন কিছু আমি করতে পারি না ; কিন্তু অফিস ডিসিপ্লিন তো আমাকে মেনে চলতে হবে। কোন কর্মচারী যদি কর্তৃপক্ষের নির্দেশের চেয়ে বিবেকের নির্দেশটা বড় করে দেখে তখন আমার পক্ষে তাকে একটি নির্দেশই দিতে হয়—চাকরিটি ছাড় এবং বিবেকের নির্দেশে চল !

শ্যামলী গম্ভীর হয়ে বলে, তা তো ঠিকই !

—না 'ঠিকই' বললে সবটা বলা হয় না। বাকিটা আমাকে বলতে দে···সেই

boiRboi.net

কর্মীটি যদি আবার আমার জামাই হয়, তখন আমাকে এমন ব্যবস্থা করতে হবে যাতে সাপও মরে, লাঠিও না ভাঙে। তাই নয়? সেই ব্যবস্থা করতেই বাধ্য হচ্ছি আমি। প্রথমত এই মামলা পরিচালনার দায়িত্বটা আমি মেহ্‌রাকেই দিয়েছি—যাতে এ নিয়ে আর কেউ ঘোঁট পাকাতে না পারে; দ্বিতীয়ত প্রণবের জন্য এমন একটি কাজের ব্যবস্থা আমি করব যাতে সে এজন্য মনমরা না হয়ে থাকে।

শ্যামলী সংক্ষেপে শুধু বললে, ধন্যবাদ!

কোনও মেয়ে এমনভাবে বাপকে 'ধন্যবাদ' বললে আশঙ্কা হতে পারে যে, ওর পিছনে কিছুটা অভিমান আছে। কিন্তু ত্রিদিবেশ-শ্যামলী যে সমাজের মানুষ সেখানে এটাকে কেউ তা মনে করে না। তাই খুশি মনেই ত্রিদিবেশ যোগ করলেন, তুই ঘাবড়াস নে শমু! আমি এমন একটা ব্যবস্থা করেছি যাতে সে খুশিই হবে!

কৌতূহল প্রবল; কিন্তু শ্যামলী কোনও প্রশ্ন করে না। সে জানে, যেটুকু উনি বলবেন সেটুকুই শুনবার অধিকার ওর। হয়তো আরও কিছু কথা হত কিন্তু একাধিক ক্লাব-মেম্বার উপরে উঠে আসায় নিভৃত আলাপের পরিবেশটা আর থাকল না। সামাজিক আলাপ চালিয়ে যেতে হল।

শ্যামলী মন দিতে পারল না আলোচনায়। সে শুধু ভাবতে থাকে: কী নতুন ব্যবস্থা করতে চাইছেন জি. এম.—অর্থাৎ ড্যাড্?

চোখ তুলে করবী দেখল ঘড়িতে বিকেল চারটে। শীতের অবসন্ন বেলা। মুন্নির-মা কাজ সেরে চলে গেছে। নির্বান্ধব পুরীতে করবীর অখণ্ড অবসর। সকাল থেকে তার বারে বারে মনে পড়ছে আজ শনিবার, বিশে ডিসেম্বর। আর দুঘন্টা পরেই 'চিত্রলেখা' সিনেমা 'হলে' সমবেত হবেন লালগড়ের গরবিনী সীমন্তিনীরা—যে-সভায় সমবেত হবার আহ্বান জানিয়ে সে একাধিক মহিলাকে একের পর এক টেলিফোন করেছিল। অথচ এখন সে নিজেই সিদ্ধান্ত নিয়েছে—ঐ বক্তৃতা-সভায় সে যাবে না।

হ্যাঁ, সেই সিদ্ধান্তের গভীরে রয়েছে জি. এম. ত্রিদিবেশ ব্যানার্জির প্রভাব—অন্তত গতকাল সন্ধ্যায় ডক্টর ব্যানার্জি সেই রকম একটা ধারণা নিয়েই খুশিয়াল হয়ে উঠেছিলেন; কিন্তু এখন—এই অবসন্ন অপরাহ্ণের শীতালি বেলায় করবীর মনে হচ্ছে বোধ করি কথাটা ঠিক নয়। ত্রিদিবেশের অনুরোধ রক্ষা করবার তাগিদেই এ সিদ্ধান্তে আসেনি—তার তরফে এটা একটা পলায়নী মনোবৃত্তির তির্যক প্রকাশ!

ডাঃ ব্যানার্জি গতকাল সন্ধ্যায় এসেছিলেন করবীর ডেরায়। একা নয়, প্রখ্যাত জীবনীকার সাহিত্যিক নীরদ মুস্তাফিকে সঙ্গে করে। করবী ওঁদের আপ্যায়ন করে বসিয়েছিল। নীরদবাবু এখন গেস্ট-হাউসে থাকবেন দিন-সাতেক। প্রতিদিন সন্ধ্যায় দেড় দু-ঘণ্টা এসে করবীর সঙ্গে গল্প করে যাবেন। এও আর এক-জাতের সমীক্ষা—ভেবেছিল করবী। শহীদ জিতেন বাসুর মহত্ত্বের স্ট্যাটিস্টিক্স সংগ্রহ করবেন নীরদ মুস্তাফি, আর তাঁকে রসদ যোগাতে হবে শহীদের ধর্মপত্নীকে। কী-জাতের প্রশ্ন করবেন উনি? নিতান্তই স্থূল সংবাদ? সাল-তারিখ কণ্টকিত ইতিহাস? নাকি হৃদয়ঘটিত প্রশ্নও? কী দরকার ছিল এসব ঝামেলার? জিতেন বাসুকে যখন উদার, মহৎ, দুর্ধর্ষ বেপরোয়াভাবে দেখানোর পূর্বসিদ্ধান্ত নেওয়া হয়ে গেছে তখন তার একটা মনগড়া চিত্র আঁকা কি এতই শক্ত? এ তো বাঁধা ফর্মুলা: তাকে সত্যবাদী হতে হবে, আদর্শবাদী হতে হবে, দীন-দুঃখীদের প্রতি দরদী হতে হবে, পিতা-মাতার প্রতি কর্তব্য এবং স্ত্রীর প্রতি ব্যবহার হবে অনিন্দ্যনীয়। ঠিক আছে, নীরদবাবু কল্পনা করতে না পারলে করবী তা বানিয়ে বানিয়ে বলতে পারবে।

অবশ্য জিতেন সত্যিই কিছু লোক খারাপ ছিল না—করবীর দাম্পত্যজীবন অবশ্য সুখের হয়নি, কিন্তু সে-জন্য সে কখনই জিতেনকে দায়ী করেনি। সে জানে ত্রুটি জিতেনের নয়, একান্তভাবেই তার নিজের। দাম্পত্যজীবনে সুখী হওয়ার উপাদান নেই তার দেহে-মনে! সে একটা বিচিত্র পরিহাস সৃষ্টিকর্তার! আয়নায় সে নিজেকে দেখেছে—আকৈশোর—দেখেছে পুরুষ-মানুষের মুগ্ধ চোখের দর্পণে। সে মর্মে মর্মে জানে যে সে সুন্দরী; অনিন্দ্যতনু—যৌবনের উপচার তার তনু-দেহে থরে থরে সাজিয়েছেন সৃষ্টিকর্তা। কিন্তু ঐ! শেষ পর্যন্ত কী এক খামখেয়ালি কৌতুকে ওকে শেষ করলেন এক সৃষ্টিছাড়া জীব করে। এজন্য সে কেমন করে দায়ী করবে জিতেনকে? পুরুষমানুষ স্বভাবতই বৈচিত্র্যসন্ধানী—মধুপবৃত্তি তার মজ্জায় মজ্জায়। তার উপর যদি ঘরের কোণে ভরা পাত্রটি অতলান্তিক সাগরের মত অপেয় হয় তাহলে সে ঝরণাতলার উছলপাত্রের উদ্দেশ্যে ছুটবে, এতে আর

অবাক হবার কী আছে? না, করবীর এজন্য কোন অভিমান নেই। কিন্তু সে-সব কথা তো বলা যায় না টাকসর্বস্ব পুরু-লেন্সের চশমাপরা ঐ নীরদ মুস্তাফিকে। তাকে বলতেই হবে জিতেন ছিল একনিষ্ঠ, কর্তব্যপরায়ণ স্বামী। জীবন-সঙ্গিনীর দিকে কম্পাসের কাঁটার মত একমুখী।

কিন্তু ডঃ ত্রিবেদীকে? তাঁকে কেমন করে মিথ্যা বলা যেত? সেখানে তো করবী নাম-গোত্র-পরিচয়হীন একটি নারীসত্তা—সংখ্যাতত্ত্বের এক ইউনিট! তবু সেটাতেও আপত্তি জানালেন ত্রিদিবেশ—গতকাল রাত্রে—

—একটা কথা করবী! তুমি শুনলাম ঐ ডক্টর ত্রিবেদীর মিটিঙে কাল যাচ্ছ?

—হ্যাঁ, কেন বলুন তো?

ডঃ ব্যানার্জিকে কেমন যেন অপ্রস্তুত মনে হল। একবার তিনি তাকিয়ে দেখলেন নীরদবাবুর দিকে। তারপর পাইপের ছাইটা অ্যাশট্রেতে ঝাড়তে ঝাড়তে নতনেত্রেই বললেন, একটু আগে সেই কথাই আমার হচ্ছিল মিস্টার মুস্তাফির সঙ্গে —মানে গাড়িতে আসতে আসতে। উনিও আমার সঙ্গে একমত। আমাদের মনে হয় তোমার ওখানে যাওয়াটা ভাল দেখাবে না।

করবী অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে ছিল শুধু।

নীরদ মুস্তাফি রহস্যের যবনিকা উন্মোচন করে তখন বলেছিলেন, আপনি তো সাধারণ মহিলা নন। আপনি বিশেষ। আপনি শহীদ জিতেন্দ্রনাথ বাসুর অঙ্কশায়িনী ছিলেন একদিন; মানে যারা জিতেন্দ্রনাথকে মনে মনে পূজা করে তারা আহত হবে যদি আপনি একজন অজ্ঞানা মানুষকে সেই স্বর্গগত জিতেন্দ্রনাথের জৈবিক বৃত্তিগুলি জানান···এটা···এটা ঠিক নয়!

করবী মনে মনে হেসেছিল। হতভাগ্য 'হিরো-ওয়ারশিপের' দেশে জন্মেছে সে! তাকে বিষ্ণুপ্রিয়া, শ্রীমা কিংবা অন্তত কমলা নেহরু, কস্তুরবাঈ গান্ধীর সমতলে তুলে ফেলতে ওরা বদ্ধপরিকর; ওর মনে পড়ে গেল একটি ইংরাজী উদ্ধৃতি "Every hero becomes a bore at last"—কথাটা ঠিকই! কচলাতে কচলাতে সে লেবু যতদিন না তেতো হয়ে যাচ্ছে ততদিন জিতেন্দ্রনাথের অঙ্কশায়িনী অসূর্য-স্পশ্যা! কোন দেশের সম্রাট মারা গেলে নাকি তাঁর দাসীবাঁদীদেরও সম্রাটের সঙ্গে সমাধিস্থ করা হত—করবীকে ওরা তেমনি কবরস্থ করতে বদ্ধপরিকর! করবী লক্ষ্য করে দেখল দুজনেই কেমন যেন অপ্রস্তুত হয়ে গেছেন, ওর চোখে চোখে আর তাকাতে পারছেন না। ওর মনে হল—কী ক্ষতি হয়, যদি সে আদ্যন্ত সত্যিকথা এখনই বলে ফেলে—ঐ ত্রিদিবেশকে, ঐ নীরদ মুস্তাফিকে—তার যৌনজীবনের

banglainternet.com

ক্লান্তিকর গোটা ইতিহাসটা! যে হিরোর জীবনী লিখবার জন্য ওরা ব্রতচারী সেই বীরের জাস্তব পরিচয়টা যদি এখনই উদ্‌ঘাটিত করে দেয়?

জিতেনের মৃত্যুতে করবী কাঁদেনি যদি মনে করে থাক, তবে ভুল করেছ। আকস্মিক দুর্ঘটনার সংবাদে সে সত্যই মর্মাহত হয়েছিল। ক'দিন ধরে বারে বারে শুধু তার কথাই মনে হয়েছে—জীবনটা শূন্য হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু বাড়ির পোষ্য অ্যালসেশিয়ানটা মারা যাওয়াতেও তো তার চোখে জল এসেছিল। না, তুলনাটা ঠিক হল না। জিতেনের অভাবটা তার চেয়ে বেশী করেই বেজেছিল ওর; কিন্তু স্বস্তির নিঃশ্বাসও কি একটা পড়েনি সেই সঙ্গে? একটা জৈব বিড়ম্বনা থেকে অব্যাহতি পাওয়ায় সে কি আশ্বস্তও হয়নি একই সঙ্গে?

—তুমি লেকচার শুনতে যাও আলাদা কথা; কিন্তু ঐ ইণ্টারভিয়ুতে তোমার কোনমতেই যাওয়া উচিত নয় করবী!

ত্রিদিবেশের দিকে এবার তাকিয়েছিল সে। প্রশ্ন করেছিল, মাসিমা অথবা শ্যামলী কি যাবে না।

—না! আমি বারণ করে দিয়েছি।

আর কথা বাড়ায়নি করবী। বলেছিল, ঠিক আছে, ভেবে দেখব।

ভেবে সে দেখেছে আজ সারাটা সকাল। শেষ সিদ্ধান্তে এসেছে অবশেষে —না, সমীক্ষকের সম্মুখীন হওয়াটা তার পক্ষে উচিত হবে না। সে যাবে না। না, লেকচার শুনতেও নয়। কী দরকার? কোন কৌতূহল নেই, থাকতে পারে না! ওর দাম্পত্যজীবন শেষ হয়ে গেছে, নতুন করে শুরু করার কোনও সম্ভাবনাই নেই; ফলে ডঃ ত্রিবেদীর প্রকাশিত রিপোর্ট থেকে তার ব্যক্তিগতভাবে লাভ হবার কোন সম্ভাবনা নেই। অপরপক্ষে তার অভিজ্ঞতায় ডঃ ত্রিবেদীরও কোন লাভ হবে না। হত, যদি সে আর পাঁচটা মেয়ের মত স্বাভাবিক হত। তা সে নয়; ঠিকই বলেছেন নীরদ মুস্তাফি—সে তো সাধারণী নয়, সে বিশেষ! মুস্তাফি যে অর্থে বলেছেন সে অর্থে না হলেও কথাটা বর্ণে বর্ণে সত্য। জিতেন বাসুর বিধবা বলে নয়, সৃষ্টিকর্তার ঐ অদ্ভুত খামখেয়ালিপনার জন্যই সে বিশেষ!

ব্যাপারটা তলিয়ে বুঝবার চেষ্টা করেছে সে;—আজ নয়, বহুদিন থেকেই। বিবাহের প্রথম পর্ব থেকেই। জিতেনের সঙ্গে খুঁটিনাটি বিরোধ হওয়ার সূত্রপাত থেকেই। কেন সে আর পাঁচটা মেয়ের মত সুখী হতে পারছে না। জিতেন সুদর্শন, বুদ্ধিমান, সাহসী,—ভালবেসেই বিয়ে করেছিল তাকে, বাপমায়ের প্রচণ্ড আপত্তি সত্ত্বেও। তবু কেন সে সুখী হতে পারল না তার দাম্পত্যজীবনে? কার

banglainternet

দোষ ? এতদিন সে ভাবত খামতিটা তার তরফেই। তবু নিঃসন্দেহ হতে পারেনি একেবারে। দুরন্ত কৌতূহল হত জানতে আর পাঁচটা বিবাহিত মেয়ে কেমন করে সুখী হয়ে থাকে, অথচ ও পারে না—কিন্তু সে কথা কে ওকে বুঝিয়ে বলবে ? তবু একটু সন্দেহের দোলা ছিল। মনের অবচেতনে বোধ করি এমন একটা বিশ্বাস ও লুকিয়ে রেখেছিল যে, যে কোন কারণেই হ'ক ওর সঙ্গে জিতেনের যোটক ঠিক হয়নি ; অর্থাৎ দোষটা ওরও নয়, জিতেনেরও নয়—কোন অলক্ষ্য ভাগ্যবিধাতার। প্রজাপতির নির্বন্ধ ! হয়তো আর কারও সঙ্গে বিয়ে হলে এমনটা ঘটত না। ওর সেই বিশ্বাসটাও ভাঙল ব্রজেন বসাকের সান্নিধ্যে !

ডঃ ত্রিদিবেশ ব্যানার্জির পছন্দ নয় জেনেও করবী ক্যাপ্টেন বসাককে বলেছিল, সে যদি চায় তবে তার ফ্ল্যাটে পেয়িং-গেস্ট হয়ে থাকতে পারে। ব্রজেন তো এক পায়ে খাড়া, যেমন আশা করা গিয়েছিল—আশা না আশঙ্কা ? —প্রথমটা সহানুভূতি, সান্ত্বনা। জিতেনের কথাই হত বেশী। ব্রজেন তাকে চিনত চার-পাঁচ বছর, করবীও তাকে জেনেছে ঐ কয় বছরই। এ আগে, ও পরে। জিতেনের কথাই হত বেশী করে। ব্রজেন শোনাতো ফ্লাইং ক্লাবে ওরা কী করত না-করত—কত দুষ্টামির কথা, কত দুঃসাহসিকতার বৃত্তান্ত। তারপর সে জানতে চাইত বিবাহিত জীবনে সেই দুর্দান্ত বেপরোয়া মানুষটা কেমন পোষ মেনেছিল। করবী হেসে বলত, আপনার কী মনে হয় ? অমন দুর্দান্ত মানুষটা কি বিয়ের পর বউ-এর আঁচল-ধরা হেন-পেক্‌ড্‌ হতে পারে ?

কৌতুক উপচে পড়ত ব্রজেনের দু-চোখে। বলত, তাই তো জানতে চাইছি মিসেস বাসু। জিতেনের কী হয়েছিল জানি না, আমি হলে তাই হয়ে পড়তুম কিন্তু—

—ওমা তাই নাকি ! তা লগ্ন তো বয়ে যায়নি, বলেন তো সে ব্যবস্থা এখানেই হতে পারে—তেমন মেয়ে এখানেই মজুত আছে !

—এখানে ! মানে এ বাড়িতেই ! বলেন কি ! তা তো জানতুম না !

করবী চোখ পাকিয়ে বলেছে, এ বাড়িতেই বলেছি নাকি ? এই লালগড়ে। আমার চেয়েও সুন্দরী মেয়ে আছে এ পাড়ায়—

ব্রজেন দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলেছে, হায় ! কী অন্ধ আমি ! কই আমার তো আজও সেটা নজরে পড়েনি !

—কী ?

—আপনার চেয়ে সুন্দরী ! এই লালগড়ে !

boiRboi.net

এ-সব কথোপকথন একেবারে প্রথম যুগের। ব্রজেন ওর পেয়িং-গেস্ট হয়ে আসার প্রথম পর্যায়ে। যখন সে থাকত ঐ বাইরের ঘরে, আর মাঝে মাঝে দরজায় নক্ করে বলত, ভিতরে আসতে পারি মিসেস বাসু ?

তার পরের যুগ। তখন করবী আর মিসেস বাসু নয়, 'করবী'। বাইরের ঘরের অতিথিটি কিন্তু তখনও 'ব্রজেনবাবু'—'আপনি'র দূরত্বে। সপ্তাহে দু-একবার ব্রজেনকে প্লেন নিয়ে যেতে হত দিল্লি-কলকাতা। করবীর সে-কদিন সময় যেন কাটতে চাইত না। মনকে বোঝাতো এর মধ্যে অস্বাভাবিকতা কিছু নেই—এমন তো হতেই পারে। নির্বান্ধব পুরীতে সে একা বাস করে, আঠাশ বছরের নিঃসঙ্গী এক বিধবা—বত্রিশ বছরের প্রাণোচ্ছল একটি পুরুষের সান্নিধ্যে তার পক্ষে খুশিয়াল হয়ে ওঠাই তো স্বাভাবিক।

—ওমা এ কী ? এতসব জিনিস নিয়ে এসেছেন কেন ? কার জন্যে ?

—কিছুটা আমার—ব্রাইল-ক্রীম, শেভিং-ব্রাশ ; কিছুটা আমাদের—কফি, জ্যাম, মার্মালেড ; কিছুটা নিঃসন্দেহে তোমার !

—কিন্তু তাই বলে শাড়ি কিনে এনেছেন কেন ?—এ শর্ত তো ছিল না আপনার সঙ্গে ?

—তবে কী শর্ত ছিল ?

—আহার এবং বাসস্থান যোগাবার দায় ছিল আমার, বিনিময়ে মাসান্তে আপনি দেবেন টাকা !

—কিন্তু শর্ত তো তুমিই আগে ভেঙেছ করবী। আমার সয়েলড্ লিনেন কাচিয়ে রাখা, আমার ঘরের ফুলদানিতে ফুল সাজিয়ে রাখা, আহার পরিবেশনের অবকাশে তোমার সান্নিধ্য এসবও তো শর্ত ছিল না ! নাও, ধর—

—কিন্তু রঙিন শাড়ি তো আমি পরি না।

—সেটাই আমার অনুযোগ। কেন পর না ? যে সমাজ-ব্যবস্থায় ও-সব চালু ছিল, সে সমাজ বহুদিন হল মরে ভূত হয়ে গেছে। তোমার এই নিরামিষ আহার আর রঙিন শাড়ি বর্জনটাও আমার বরদাস্ত হয় না। ওগুলো ছাড়তে হবে। তোমার মা কিছু বলেননি ?

দাঁত দিয়ে নখ খুঁটতে খুঁটতে করবী বলেছিল, বলেছিলেন। হয়তো তাঁদের সঙ্গে গোপালনগরে চলে গেলে আমি এসবগুলো মানতাম না। ইন ফ্যাক্ট, এ আমার ভালও লাগে না, জানেন ? বিশেষ করে ঐ নিরামিষ আহার। সত্যি কথা বলতে কি ছেলেবেলা থেকেই মাছ-মাংস ছাড়া আমি খেতে পারি না।

boiRboi.net

—তবে ঐ অদ্ভুত নিয়মটা মেনে চল কেন? তুমি কি অন্তর থেকে বিশ্বাস কর, জিতেন—

—না। তার সঙ্গে বহুবার আমার এ সব বিষয়ে কথা হয়েছে। সে এ যুগের ছেলে। তার এক মাসতুতো বোন মীরা বিধবা হবার পর রীতিমত জুলুম করে ও তাকে মাছ-মাংস ধরিয়েছিল।

—কী রকম জুলুম?

—আমরা ওদের বাড়িতে গেস্ট হয়ে উঠেছিলাম। দিন তিনেকের জন্য। জিতেন বললে এক সঙ্গে এক টেবিলে বসে মীরা মাছ-মাংস না খেলে সে কিছুই খাবে না। গোটা একটা দিন উপবাস করল জিতেন। দ্বিতীয় দিনে মীরা বাধ্য হয়ে আমাদের সঙ্গে একসঙ্গে আমিষ খেল!

—থ্যাঙ্ক! 'মোডাস অপারেণ্ডি'টা শিখিয়ে দেবার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ। শোন! আমি তিন দিন থাকব এবার! তুমি যদি আমার সঙ্গে এক টেবিলে বসে চিকেন-রোস্ট না খাও তাহলে এ-তিন দিন আমিও হাঙ্গার-স্ট্রাইক চালিয়ে যাব!

—এই যাঃ। পাগলামী করবেন না!

তৃতীয় পর্যায়।

ব্রজেন হঠাৎ বলে বসল, এই করবী। দার্জিলিঙ যাবে বেড়াতে? দু-দিনের জন্যে?

—দার্জিলিঙ! হঠাৎ?

—ওয়েস্ট জার্মানি থেকে এক হুমদো-মুখো সাহেব এসেছে লালগড়ে। কী-সব যন্ত্রপাতি কেনা হচ্ছে, তারই তদারকিতে। আছে এখানকার গেস্ট-হাউসে। তা সাহেব দু-দিনের জন্য দার্জিলিঙ বেড়াতে যাচ্ছে। প্লেনে। তুমি এয়ার-হস্টেস-এর কাজ করতে পারবে!

করবী কুণ্ঠিত হয়ে বলেছিল, না না, সে ভালো দেখাবে না,—ওঁরা কী ভাববেন?

—ওঁরা? মানে কর্তৃপক্ষ? কিছুই ভাববেন না। আমি জি. এম.-কে বলেছি তুমি যাচ্ছ; তিনি খুশিই হলেন মনে হল!

—কেন বলতে গেলে তুমি? ছি, ছি, কী মনে করলেন ওঁরা?

—কী আবার মনে করবেন? ওঁদের তো কোন খরচ হচ্ছে না? প্লেনের লেডেন ওয়েট-এর অনুপাতে তোমার ওজন আর কত হবে? পঞ্চাশ কে. জি.?

—কী জানি, সেটা কথা নয়। আমি বলছিলাম…

উঠে দাঁড়িয়েছিল ব্রজেন বসাক। বলেছিল, জান না? নিজের ওজন জান না! আচ্ছা আমি নিজেই দেখছি!

কোথাও কিছু নেই এক লহমায় সে শূন্যে তুলে ফেলেছিল করবীকে। হাঁটুর নিচে এক হাত আর পিঠের পিছন দিয়ে একটি হাত গলিয়ে দিয়ে। শিউরে উঠেছিল করবী। পড়ে যাবার ভয়ে এক হাত দিয়ে বেষ্টন করে ধরেছিল ওর বৃষস্কন্ধ। মুখে বলেছিল, এই কী হচ্ছে! অসভ্য কোথাকার!

যতটুকু সময় লাগে ওজনটা বুঝে নিতে তার চেয়ে কয়েকটি খণ্ড মুহূর্ত দেরী হয়ে গিয়েছিল ব্রজেনের। আবেশে করবীর দুটি চোখ মুদে এসেছিল। নামিয়ে দেবার পর আঁচল দিয়ে ঠোঁটটা মুছতে মুছতে বলেছিল, তোমার দুঃসাহস অত্যন্ত বেড়ে গেছে! যাও, আমি যাব না দার্জিলিঙ!

গিয়েছিল কিন্তু শেষ পর্যন্ত। কেন গিয়েছিল? মনের অগোচর পাপ নেই। করবী আজকের এই শীতালি অপরাহ্নে নিজের কাছে স্বীকার করতে পারে, সে গিয়েছিল তার আকৈশোরের সেই প্রশ্নটার সমাধান খুঁজতে। সে কী সত্যই সাধারণী নয়? সে বিশেষ? সে অস্বাভাবিক?

হ্যাঁ। তাই। সেটা সে চূড়ান্তভাবে জেনে এসেছিল ঐ শৈলপুরীতে। চড়টা করবীই মেরেছিল। স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিল ব্রজেন বসাক। সে শুধু বলেছিল, আমি···আমি···কিছুই বুঝতে পারছি না করবী! আমি তো তোমাকে বিয়েই করতে চাই! তোমার ব্যবহারে আমি অন্তত ভেবেছিলাম যে তোমার আপত্তি নেই! তাই কি এতদিন ধরে বুঝতে দাওনি তুমি? বল? বল? উত্তর দাও!

করবী জবাব দিতে পারেনি। ছুটে বেরিয়ে গিয়েছিল সে, ঘর ছেড়ে বারান্দায়। উইণ্ডারমেয়ার হোটেলের খোলা বারান্দায় দাঁড়িয়ে সে নিজের গালে একবার হাত বুলিয়েছিল—যেন চড়টা সেই খেয়েছে। ছুটে চলে গিয়েছিল নিজের ঘরে। ডানলোপিলোর গদিতে হুমড়ি খেয়ে পড়েছিল। তারপর তার ফুলে ফুলে কান্না। এত কান্না সে কাঁদেনি জিতেনের আকস্মিক দুর্ঘটনার সংবাদ পেয়েও! তাই তো স্বাভাবিক! নিজের চেয়ে প্রিয়তর কে? উইণ্ডারমেয়ার হোটেলের ঐ পাশের ঘরে যে এইমাত্র মৃত্যু হয়েছে করবী বাসু নামে একটি সাধারণ মেয়ের—তার বাকি জীবনের সব সম্ভাবনার মৃত্যু হল যে এই মাত্র। করবী কাঁদবে না? এর আগে তো সে এমন করে জানতো না যে, সে এমন চূড়ান্তভাবে ব্যতিক্রম? জিতেন নয়, কোন পুরুষমানুষকেই সে সহ্য করতে পারবে না জীবনে! জীবন্মৃত হয়ে বেঁচে থাকতে হবে বুড়ি বয়স পর্যন্ত যদি না আত্মহত্যা করবার মত মনোবল সংগ্রহ করতে পারে কোনদিন!

boiRboi.net

ক্রিরিং-ক্রিং, ক্রিরিং-ক্রিং···

টেলিফোনটা বাজছে। প্রমীলাদি ফোন করছেন। বর্তমানে ফিরে এল আধার। একটু যেন অস্বস্তিও বোধ করল। প্রমীলাদি এখনও জানেন না যে করবী মিটিঙে আসছে না। ইন্টারভ্যুতে উপস্থিত থাকবে না সে। ভাগ্য ভালো সে বিষয়ে কোন প্রশ্ন করলেন না উনি। একতরফা নিজের কথাই বলে গেলেন।

শুনতে শুনতে করবীর ভ্রূ-যুগলে জাগল কুঞ্চন। উৎকর্ণ হয়ে উঠল সে। লালগড়ে এত কাণ্ড ঘটে গেছে অথচ সে কোনই খবর পায়নি। ডঃ ত্রিবেদী তাঁর টীম সমেত আজ সকালেই এসেছেন। ব্যবস্থা করা হয়েছিল, ওঁরা কোম্পানীর গেস্ট হাউসেই থাকবেন। শেষ মুহূর্তে নাকি রিজার্ভেশান বাতিল করা হয়েছে। প্রমীলাদির বিশ্বাস, এ-আদেশ এসেছে খোদ বড়কর্তার কাছ থেকে।

—ওঁরা তাহলে আছেন কোথায় ?

—'আপ্যায়ন'-এ, মানে লালগড়ে নয়, টাউনশিপে—

লালগড় ফ্যাক্টরির বাইরে গড়ে উঠেছে ছোট্ট শহর—কারখানারই জমি, তবে সেখানে বাস করেন এমন অনেকে যাঁরা কারখানার সঙ্গে সম্পর্কবিমুক্ত। নিরানব্বই বছরের লিজ নিয়ে অনেকেই এসে ওখানে বাড়ি করেছেন। 'আপ্যায়ন' সেখানকার সবচেয়ে নামকরা হোটেল। 'চিত্রলেখা' সিনেমা হাউসও ঐ টাউনশিপ অংশে, কারখানার চৌহদ্দির বাইরে। সমস্তটা শুনে করবীর খুব খারাপ লাগল। ডঃ ব্যানার্জি এই যৌনসমীক্ষার বিরোধিতা করেছেন সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত সংস্কারাচ্ছন্ন মনোভাবের তাগিদে। এ সমীক্ষার পিছনে সরকারী অনুমোদন আছে ; অনেক দৈনিক পত্রিকা ডঃ ত্রিবেদীর এই প্রচেষ্টাকে অভিনন্দন জানিয়েছে—কেউ কেউ বিরোধিতা করেছে অবশ্য—তবু এভাবে কেন বাধা দিচ্ছেন জি. এম. ? আর সবচেয়ে বড় কথা, এই শেষ মুহূর্তে গেস্ট হাউসের রিজার্ভেশান বাতিল করাটা তো ছেলেমানুষীর পর্যায়ে পড়ে।

—আর জানো করবী, ওঁদের শেষ পর্যন্ত ট্যাক্সি করে স্টেশান থেকে নিয়ে আসতে হল।

—কেন ? কোম্পানির স্টেশান-ওয়াগন তো আমি আগেই বুক করে রেখেছিলাম।

—তাই তো বলছি। সেটাও বাতিল করা হয়ে গেছে। এ. ও. আমাকে বললেন, অত্যন্ত দুঃখিত—কিন্তু বিশ্বাস করুন আমি নিতান্ত নিরুপায়।

করবী প্রশ্ন করে, ওঁরা কি, আই মীন ডঃ ত্রিবেদী কি কিছু বুঝতে পেরেছেন ?

boiRboi.net

—অফকোর্স! আমি নিজেই তাঁকে খোলাখুলি সব কথা জানিয়েছি। বুঝলে না, আঘাতটা কখন কোন দিক থেকে আসবে তা কি আমরাই জানি ছাই? তাই ওঁকে বাস্তব অবস্থাটা জানিয়ে রাখা ভাল।

—শুনে কী বললেন উনি?

—বললেন, 'এটা কিছু নতুন কথা নয়। এমন প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন আমাদের হামেসাই হতে হয়। আমাদের দুর্ভাগ্য যে, দেশটা ঐ সব কুসংস্কারাচ্ছন্ন কূপ-মণ্ডূকদের আজও মাথায় করে রেখেছে। সে যাই হোক, আপনারা যে কোন কিছুতেই দমেননি এতেই আমি আশার আলো দেখতে পাচ্ছি। বাধা যতই আসুক, আমরা সত্যপথ থেকে বিচ্যুত হব না।'

—ওঁর মত লোকের মতই কথা বলেছেন। কী বিশ্রি সমালোচনার সম্মুখীন হতে হচ্ছে ওঁকে। ডঃ মজুমদারের প্রবন্ধটা পড়েছেন তো?

—তা আর পড়িনি? ডঃ মজুমদার হচ্ছেন ওঁর সবচেয়ে বড় শত্রু—ডঃ ত্রিবেদী নিজেই তাই বলেছেন। এই বৈজ্ঞানিক সমীক্ষার ভিতর কোন একটিমাত্রও 'রিডিমিং ফিচার' দেখতে পাননি ডঃ মজুমদার! পরিকল্পনাটাকে আদ্যন্ত গালাগালি দিয়ে গেছেন।···এনি ওয়ে, তুমি একটু আগে করে এস মিটিঙে। মিনিট দশেক আগে পাঁচটা পঞ্চাশে; আমি গেটেই থাকব। কেমন?'

করবী আজ-সকাল-থেকে-করা সিদ্ধান্তটা ওঁকে জানাতে পারেনি অতঃপর।

কী অদ্ভুত এই দেশটা! একটা সৎ বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা করবার জন্য ডঃ ত্রিবেদী প্রাণপাত করছেন, আর তাঁকে আপ্রাণ বাধা দিয়ে চলেছে—না, রাম-শ্যাম-যদু নয়, পল্লীসমাজের বেণীমাধব আর শিরোমণিমশাই নয়,—রীতিমত উচ্চশিক্ষিত একদল পণ্ডিতম্মন্য! ঐ সব ডক্টর ত্রিদিবেশ ব্যানার্জি, এম. এ.; পি এইচ. ডি. অথবা ডঃ অবনী মজুমদার, এম. ডি.; ডি. জি. ও.; এম. আর. সি পি। কী কারণ? ত্রিদিবেশের মতে এ বাধাদানের ব্যবস্থা এজন্য যে, মনু-সংহিতায় এর বিধান নেই. আর অবনী মজুমদার সম্ভবত ভুগছেন সর্বশেষ রিপুর তাড়নায়—মাৎসর্যে! ডঃ ত্রিবেদীর সাফল্যে তিনি ক্ষিপ্ত হয়ে গেছেন! ত্রিবেদীর পূর্বপ্রকাশিত গ্রন্থ—'লাল ত্রিকোণের প্রথম কোণ—পুরুষ' বইটাকে তিনি খণ্ড খণ্ড করে কেটেছেন; ঠিক যে ভাবে মাংসের দোকানে কিমা বানায়! করবী সে বইখানা পড়েছে, যত্ন নিয়েই পড়েছে; নিঃসন্দেহে একটি সৎ এবং মহৎ প্রচেষ্টা। জন্মনিয়ন্ত্রণে বিবাহিত পুরুষদের সমস্যা ও তার সমাধানের সমীক্ষা। ইতিপূর্বে ত্রিবেদী ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলে একই রকম পরীক্ষা চালিয়ে দু-হাজার সাঁইত্রিশটি বিবাহিত পুরুষের মতামত সংগ্রহ করে ঐ

BanglaBook.org

প্রামাণিক গ্রন্থটি রচনা করেছেন। হু-হু করে সংস্করণের পর সংস্করণ হয়েছে—এক বছরে এগারোটি সংস্করণ। তাই বোধকরি অবনী মজুমদার ক্ষিপ্ত হয়ে গেছেন। বিদ্যে জাহির করেছেন ঐ গ্রন্থটাকে কঠোর সমালোচনা করার নামে মাত্রাতিরিক্ত খিস্তি করে! নাঃ! উপরোধে করবী ঢেঁকি গিলবে না। ত্রিদিবেশের অনুরোধ উপেক্ষা করে সে গিয়ে দাঁড়াবে ঐ প্রমীলাদির পাশে, ঐ বক্তৃতা সভায়। হ্যাঁ, ইন্টারভিয়ু দিতেও সে যাবে। যা সত্য, নগ্ন সত্য, যতই কঠোর হোক, আদ্যন্ত স্বীকার করবে সে!

আবার বেজে উঠল টেলিফোনটা। এবার শ্যামলা। বললে, করবীদি, একটা উপকার করবে আমার? ব্যাপারটা গোপন কিন্তু—

করবীর মনে পড়ল শ্যামলী ইতিপূর্বে তাকে 'আপনি' বলে কথা বলত। তার হঠাৎ এই 'তুমি' সম্বোধনে বোঝা গেল যে কোন কারণেই হোক সে করবীর সঙ্গে বন্ধুতার সম্পর্কটা দৃঢ়তর করতে চায়। তাই সেও ওর পারিবারিক ডাকনামের সম্বোধনে ঘনিয়ে আসতে চাইল; বলল, বল শমু, তোমার কী উপকারে লাগতে পারি? গোপনীয়তার প্রতিশ্রুতি নিশ্চয় দিচ্ছি—

—তুমি আজ রাত্রে আমার সঙ্গে নৈশ-আহার সারবে, রাজি?

—এ আবার কী জাতের উপকার?

—একটু অপেক্ষা কর, আমি আধঘণ্টার মধ্যেই আসছি। তখন খোলাখুলি সব কথা বলব।

তাই এল শ্যামলী। আধঘণ্টার মধ্যেই জি. এম.-এর কালো মার্সেডিজখানা শ্যামলীকে নামিয়ে দিয়ে গেল ওর বাড়ির গেটে। শ্যামলী আজ পরেছে হালকা ফিরোজা রঙের একটা মুর্শিদাবাদ শাড়ি, ঐ রঙেরই ব্লাউজ। গাড়িটাকে বিদায় দিয়ে ঘনিয়ে এসে বসল সে করবীর ড্রইংরুমে। বললে, করবীদি শোন, ব্যাপারটা বুঝিয়ে বলি। ড্যাডি হুকুমজারি করেছে—ত্রিবেদী-সাহেবের খেউড় শুনতে আমার যাওয়া চলবে না। আমি ব্যাপার বেগতিক বুঝে তৎক্ষণাৎ বললুম—আমি কেমন করে যাব? করবীদি আজ রাত্রে ডিনারে নেমন্তন্ন করেছে যে! ড্যাডি খুশি হয়েছে—কারণ তুমিও খেউড় শুনতে যাচ্ছ না এটা প্রমাণিত হল। তাই সেজে-গুজে আমি তোমার বাড়ি ডিনারের নিমন্ত্রণ রাখতে চলে এসেছি। রাত দশটায় গাড়ি আবার আমাকে নিতে আসবে!

—বুঝলাম। মানে, বুঝলাম না। অতঃপর?

—তুমি চট করে তৈরি হয়ে নাও। এখান থেকে দুজনে ট্যাক্সি নিয়ে চলে

boiRboi.net

যাব 'চিত্রলেখায়'। সেখানে বক্তৃতা শেষ হবে রাত আটটা সাড়ে-আটটার মধ্যে। তারপর আমরা কোন রেস্তোরাঁয় খেয়ে নিয়ে সাড়ে-নটার মধ্যে তোমার বাড়ি ফিরে আসব। দশটার সময় গাড়ি এলে গুটিগুটি বাড়ি ফিরব।

—এতক্ষণে তোমার সমস্ত পরিকল্পনাটা হৃদয়ঙ্গম হল; কিন্তু এমন মরিয়া হয়ে বক্তৃতা শুনতে যাবার আসল কারণটা কী?

—তোমাকে খোলাখুলি বলব করবীদি। কারণ ত্রিবিধ। প্রথম হেতু, দুরন্ত কৌতূহল। দ্বিতীয় কারণ, খোলাখুলি বিদ্রোহ করবার তাগৎ নেই তবু ড্যাডির এই অপরের ব্যাপারে নাক-গলানোটা আমার ভাল লাগেনি। তৃতীয়ত, প্রণবের কাছে আমি ছোট হয়ে যেতাম!

—বুঝেছি। ঐ শেষ কারণটাই সেরা কারণ!

ওদের ট্যাক্সিটা যখন 'চিত্রলেখা' সিনেমা হাউসের সামনে গিয়ে দাঁড়ালো ছটা বাজেনি। প্রবেশপথেই দেখা হয়ে গেল প্রমীলাদির সঙ্গে; কিন্তু মনে হল তিনি খুব ব্যস্ত। করবীকে দেখতে পেয়ে বললেন—কী ঝামেলা হল বল দেখি—মিসেস নোয়ামি স্মিথ এসেছেন তাঁর ষোল বছরের খুকিকে সঙ্গে করে। আমি গেট-এ ওঁদের রুখেছি। মিসেস স্মিথ ডঃ ত্রিবেদীর সঙ্গে দেখা করতে চান—ওঁর ঐ নাবালিকা অবিবাহিতা মেয়েকে কেন ঢুকতে দেওয়া হবে না তিনি তা জানতে চান। যত্ত সব!

শ্যামলীর মনে পড়ল—মিসেস স্মিথের এ জাতীয় সংকল্পের কথা তার জানা ছিল। সে ভেবেও রেখেছিল করবী অথবা প্রমীলাদিকে ব্যাপারটা জানিয়ে সাবধান করে দেবে। নানান ঝামেলায় সেটা ভুলে বসে আছে। তাই আপাতত সে কথা চেপে যাওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ হবে বলে মনে হল তার। বললে, কী কাণ্ড!

করবী বললে, তারপর? কী হল শেষ পর্যন্ত? মিসেস স্মিথ তো জানেন যে এ সভায় একমাত্র বিবাহিতা মহিলাদেরই প্রবেশাধিকার আছে।

—সবই জানেন। ন্যাকা সাজছেন। যা হোক, তোমরা ভিতরে গিয়ে বস।

করবী প্রবেশপথের দিকে পা বাড়াতেই শ্যামলী ওর হাতটা চেপে ধরে। বলে, করবীদি, আমরা একটু পরে ঢুকব। অডিটোরিয়ামের আলো নিভে গেলে—

করবী বললে, তার মানে তোমার অপরাধবোধটা ঠিকই আছে। ড্যাডির চর তোমাকে দেখে ফেলবে, তাই নয়?

boiRboi.net

—অস্বীকার করে লাভ কি ? এস, ঐ দোকানে গিয়ে ততক্ষণ দু-কাপ কফি গেলা যাক। উপরোধের ঢেঁকি।

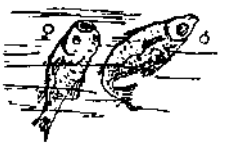

কেটি আশ্বস্ত করল তার মাকে, কেন এমন পাগলামি করছ মা ? তোমার বক্তৃতা না শোনার কী আছে ? তুমি যাও ভিতরে, আমি বাড়ি ফিরে যাচ্ছি।

নোয়ামি আবার একটা সিগারেট ধরালো। কাঠিটা কোথায় ফেলবে বুঝে পেল না। চিত্রলেখা সিনেমা হাউসের সামনের 'প্যাশিও'তে কথা বলছিল ওরা। সবুজ ঘাসের আস্তরণ ; কিন্তু দেশলাইয়ের কাঠিটা সেখানে ফেলতে পারল না নোয়ামি, অন্যমনস্কভাবে রাখল পকেটে। বললে, আমার একটুও ইচ্ছে করছে না, এরপর বক্তৃতা শুনতে। আমি আশা করেছিলাম যে, অন্তত ডক্টর ত্রিবেদী তোকে ভিতরে আসার অনুমতি দেবেন—

—তুমি কিন্তু অন্যায় রাগ করছ মাম্মি। ডক্টর ত্রিবেদী তো বললেনই—তোমার সঙ্গে তিনি একমত ; কিন্তু তিনি সরকারের কাছে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ যে কেবলমাত্র বিবাহিতদের নিয়েই তিনি সমীক্ষা চালাবেন। ওঁর কত শত্রু তা তো তুমি জানই। এ নিয়ে তিনি অহেতুক ঝামেলা বাড়াতে চান না। আমি কিন্তু ওঁর সঙ্গে একমত।

—তুই তাহলে এখন কী করবি ?

—বাড়ি ফিরে যাব। লাইব্রেরি থেকে যে বইটা এনেছি সেটা শেষ হয়নি এখনও—

—বাসভাড়া আছে তো সঙ্গে ?

—আছে। তুমি যাও এবার ভিতরে। ছ'টা বেজে গেছে।

অগত্যা বাধ্য হয়েই নোয়ামি ভিতরে ঢুকে পড়ল।

কেটি অপেক্ষা করল কিছুক্ষণ। মায়ের মূর্তিটা প্রবেশ-পথের ওপারে অদৃশ্য

boiRboi.net

হবার পরেও সে মিনিটপাঁচেক অপেক্ষা করল। তারপর ধীর পদে বেরিয়ে এল গেট দিয়ে। পাশেই একটা পাবলিক টেলিফোন বুথ। ঢুকে পড়ল সেখানে। চিহ্নিত ছিদ্রপথে তিনটি মুদ্রা ফেলল একের পর এক। তারপর শুনল ওপ্রান্তে রিঙিং টোন।

—হ্যালো

—কেটি!

—মা?

—ঘন্টা দু'য়েকের মত নিশ্চিন্ত!

—অর্থাৎ দু-ঘন্টার মত কেটি সুন্দরী মুক্তপক্ষ বিহঙ্গী? ভেরী গুড! কতক্ষণের মধ্যে এসে পৌঁচাচ্ছ?

—আমি আছি তোমার কাছাকাছি—চিত্রলেখা হাউসের সামনে—হেঁটেই আসছি, মিনিট পনেরর ভিতর।

—রাইট ও! ভাল কথা···আজও ফ্রক পরে? খুকুমণিটি?

—আমি কি শাড়ি পরি? ন্যাকামি কর না···

টেলিফোনটা স্বস্থানে রেখে কেটি এদিক ওদিক তাকিয়ে দেখে—নাঃ, কেউ তাকে লক্ষ্য করছে না। গুণ গুণ করে তান ভাঁজে: আই অ্যাম সিক্সটিন, গোয়িং অন সেভেনটিন···

ভ্যানিটি ব্যাগটা খোলে। তার গর্ভ থেকে বার করে দামী একটা বিলাতি লিপস্টিক। আনকোরা নতুন। এখনই প্রথম ব্যবহার করছে। হাত-বটুয়ার আয়নায় নিজের মুখখানা দেখে—হালকা করে ঠোঁটে লিপস্টিক মাখায়, ম্যাক্সফ্যাকটার ভারমিলিয়ান।

ওদিকে ততক্ষণে নোয়ামি প্রবেশ করেছে প্রেক্ষাগৃহে। আলো-আঁধারি। কিছুই ঠাওর হয় না। কে একজন মহিলা সেবিকা টর্চ ধরে ওকে নিয়ে গিয়ে বসালো সামনের দিকের একটি ফাঁকা চেয়ারে। প্রেক্ষাগৃহে তিল-ধারণের ঠাঁই নেই। চীফ মেট্রন মিসেস নোয়ামি স্মিথ ওদের মহিলা-সমিতির কর্মী-পরিষদের সভ্যা—তার জন্য নির্দিষ্ট একটি আসন ছিল। না হলে নোয়ামিকে দাঁড়িয়ে থাকতে হত। মঞ্চের উপর জোরালো আলো। ডঃ ত্রিবেদী মাইকের সামনে দাঁড়িয়ে ভাষণ দিচ্ছেন। মনে হল, ওঁর বয়স ষাটের ওপারে। দীর্ঘদেহী, সুপুরুষ। পরিধানে খদ্দরের পাঞ্জাবি এবং চোস্ত, ঊর্ধ্বাঙ্গে একটি জওহর কোট, মাথায় টুপি। দেখলে মনে হয় বুঝি কোন প্রবীণ কংগ্রেস-কর্মী, যৌনতত্ত্ববিদ নন। ওঁর চেয়ারের

উপর মূর্ছিত হয়ে ঝুলছে একটা সাদা-ফুলের মালা। বক্তার সম্মুখে উঁচু রিডিং টেবল্, গ্লাস-হোল্ডারে একগ্লাস জল। কিছু দূরে, মঞ্চের অপরপ্রান্তে বসে আছেন মহিলা-সমিতির সভানেত্রী মিসেস প্রমীলা দাশগুপ্তা। বুঝতে অসুবিধা হয় না ইতিপূর্বে তিনি বক্তাকে পরিচিত করিয়ে দিয়েছেন সকলের সঙ্গে এবং কোন একটি বাচ্চা মেয়ে 'হল' থেকে বিতাড়িত হবার পূর্বে তাঁকে মালাভূষিত করেছিল। কিন্তু আর সবাই কোথায়? ডক্টর ত্রিবেদীর তিন সহকর্মী? তাঁদের নামগুলোও তো এখনও জানে না নোয়ামি। মঞ্চের উপর তাঁদের দেখতে পাবে আশা করেছিল। তাঁরা কি আদৌ এসে পৌঁছাননি এখনও? সে যাই হোক বক্তৃতায় মনোনিবেশ করল নোয়ামি—

…সুতরাং পরিবার পরিকল্পনার প্রয়োজনীয়তার কথা বিস্তারিতভাবে আপনাদের জানানো নিষ্প্রয়োজন। আমাদের সরকারের এটি একটি স্বীকৃত প্রকল্প বলেই শুধু নয়, আমি ও-বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা থেকে বিরত থাকছি এজন্য যে, আপনারা সকলেই শিক্ষিতা, আলোকপ্রাপ্তা। এ বিষয়ে আপনারা সম্যক অবহিত। আমি শুনে সুখী হয়েছি যে, আপনারা নিজেরাই একটি বেসরকারী পরিবার পরিকল্পনা কেন্দ্র পরিচালনা করে থাকেন। তবু আমার গবেষণা এবং সমীক্ষার সঙ্গে এই পরিকল্পনা এত ওতপ্রোতভাবে জড়িত যে, সেবিষয়ে একটা মোটামুটি আলোচনা আমার মূল বক্তব্যের প্রারম্ভিক অধ্যায় হিসাবে আমি অপরিহার্য মনে করছি।

আপনারা জানেন, ১৯৭১ সালের আদমসুমারী অনুসারে ভারতবর্ষের লোক-সংখ্যা প্রায় পঞ্চান্ন কোটি এবং ভারতের ভূমিমাপ বা ক্ষেত্রফল ৩·২ মিলিয়ান বর্গ-কিলোমিটার। সংখ্যা দুটি এতই বৃহৎ যে, আমাদের ধারণাই হয় না—অনেকটা জ্যোতির্বিজ্ঞানের আলোকবর্ষের খতিয়ানের মতো! তাই বরং একটি সংখ্যাকে দ্বিতীয়টি দিয়ে ভাগ করে আমরা সহজ করে বলি: আমাদের দেশে প্রতি বর্গ-কিলোমিটারে বাস করেন ১৭৮ জন মানুষ। তা ঐ বর্গ-কিলোমিটার বস্তুটাও আমাদের আজও ঠিকমত রপ্ত হয়নি। বর্গমাইল বস্তুটাকে আরও চেনা চেনা লাগে। আসুন, আমরা বরং আরও সরল করে বলি—এদেশে প্রতি বর্গমাইলে বাস করেন ৪৫৬ জন মানুষ—তার অর্ধেক স্ত্রী, অর্ধেক পুরুষ। ঠিক অর্ধেক অবশ্য নয়, হিসাবমত ঐ ৪৫৬ জনের মধ্যে আছেন ২৩৬ জন পুরুষ এবং ২২০ জন রমণী। এখন প্রশ্ন হচ্ছে প্রতি বর্গমাইলে ঐ প্রায় সাড়ে চারশ লোকের বাসকে কী বলব? ঘন-বসতি, না স্বল্প-বসতি? এ বিষয়ে ধারণা করার সবচেয়ে ভাল উপায় হচ্ছে আমাদের মতো বৃহদায়তন অন্যান্য দেশের খতিয়ানটা তুলনা করে দেখা।

boiRboi.net

আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে অথবা সোভিয়েত ইউনিয়নে ঐ সংখ্যাটা যথাক্রমে মাত্র ৬৭ অথবা ২৮। এই সংখ্যাতত্ত্ব থেকেই বোঝা যাচ্ছে আমাদের দেশে জনবসতি অত্যন্ত ঘন। তা-থেকেই বুঝতে পারি—কেন এদেশে এত দারিদ্র্য। শুধু তাই নয়, আমাদের জনসংখ্যা বৃদ্ধির হারও অত্যন্ত বেশি। এত মহামারী, প্লাবন, দুর্ভিক্ষ সত্ত্বেও প্রতি বছরে আমাদের জনসংখ্যা বাড়ছে হাজারে উনত্রিশ জন। তাই আমাদের জাতীয় সরকার প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার আদি পর্ব থেকেই এ পরিকল্পনায় হাত দিয়েছেন। সারা ভারতবর্ষের খতিয়ানটা থাক, আমরা বরং এই পশ্চিমবাঙলার হিসাবটাই খতিয়ে দেখি—

পরিবার পরিকল্পনার জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বাজেটে ব্যয়বরাদ্দের পরিমাণ কী প্রচণ্ডহারে বাড়ানো হয়েছে সেটা লক্ষ্য করলেই বোঝা যাবে এই প্রকল্পের উপর সরকার কতটা গুরুত্ব দিচ্ছেন—

প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা	(১৯৫১-৫৬)···	৩৭ হাজার	টাকা
দ্বিতীয় " "	(১৯৫৬-৬১)···	১৪·৬২ লক্ষ	টাকা
তৃতীয় " "	(১৯৬১-৬৬)···	১০১·৫০	ঐ
	(১৯৬৬-৬৯)···	৪২৬·৬১	ঐ
চতুর্থ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা	(১৯৬৯-৭৪)···	১৪০০·০০ (বরাদ্দ)	ঐ
পঞ্চম " "	(১৯৭৪-৭৯)···	৪০০০·০০ (অনুমোদিত)	ঐ

জানি, আপনারা আবার প্রশ্ন করবেন—খরচ তো হচ্ছে, কিন্তু কাজ কিছু হচ্ছে কি? আমি বলব, আশানুরূপ না হলেও কাজ যথেষ্ট হয়েছে। অনেকে বলেন, আমি সরকার-বিরোধী প্রচার করে বেড়াই। আমি রাজনীতিতে নেই, আমি বিজ্ঞানী। সরকার যেখানে ভাল কাজ করছেন সেখানে কেন আমি তাকে অভিনন্দিত করব না? সম্প্রতি সঙ্কলিত একটি সরকারী খতিয়ান আপনাদের সামনে রাখছি, যা থেকে বুঝতে পারবেন চতুর্থ পরিকল্পনার শেষাশেষি পশ্চিমবঙ্গে কতটা কাজ হয়েছে:

(ক)	বিবাহিত নরনারীর কত শতাংশ এ পর্যন্ত পরিবার পরিকল্পনার আচ্ছাদনে এসেছেন? ···	১২ শতাংশ
(খ)	এ পর্যন্ত আনুমানিক কতগুলি শিশুর জন্ম রোধ করা গেছে? ···	১০ লক্ষ
(গ)	জন্মহার (প্রতি হাজারে) ১৯৬১ থেকে ১৯৭১ সালের ভিতর কী পরিমাণ কমেছে? ···	৪২·৯ থেকে ৩৮

boiRboi.net

(ঘ) কোন পদ্ধতিতে কতগুলি নর-নারীকে জন্মশাসনে সাহায্য করা হয়েছে?

(i) নির্বীর্যকরণ ... ৮০ লক্ষ পুরুষ, ১০ লক্ষ নারী, একুনে ৯০ লক্ষ

(ii) লুপ-পরিধান পদ্ধতি ৩০ লক্ষ

(iii) জন্মনিরোধের অন্যান্য পদ্ধতি (নিরোধ) ইত্যাদি ৭৫ হাজার।

ভুললে চলবে না, সারা ভারতবর্ষের তুলনায় আমাদের এই পশ্চিমবঙ্গে এ-সমস্যা আরও জটিল, আরও কঠিন। স্বাধীনতার সঙ্গে সঙ্গে বঙ্গদেশ দ্বিধাবিভক্ত হওয়ায় আমাদের ভূখণ্ড গেছে কমে, উদ্‌বাস্তু আগমনে লোকসংখ্যা গেছে বেড়ে। তাই সারা ভারতের ঐ ৪৫৬ সংখ্যাটির তুলনায় পশ্চিমবঙ্গে জনবসতির হার প্রতি বর্গমাইলে হাজারের উপর! ফলে আমাদের অবস্থা আরও শোচনীয়। আমাদের কাছে এটা সত্যই জীবন-মরণ সমস্যা। আমাদের জাতীয় সরকার প্রতিজ্ঞা করেছেন পঞ্চম পরিকল্পনা অন্তে, অর্থাৎ ১৯৭৯ সালের মধ্যে জন্মহার কমিয়ে আনতে হবে প্রতি হাজারে ৩৮ থেকে ২৫-এ। এজন্য পশ্চিমবঙ্গে ষোলটি জেলায় গ্রামাঞ্চলে ইতিমধ্যেই ৩০৬টি গ্রামীণ পরিবার পরিকল্পনা কেন্দ্র খোলা হয়েছে এবং ৮১৫টি উপ-কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এ ছাড়াও আছে ২৩টি বেসরকারী কেন্দ্র। অনুরূপভাবে শহরাঞ্চলে ৩১টি কেন্দ্র এবং ৩৩টি উপকেন্দ্র খোলা হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গ সরকার ঘোষণা করেছেন ১৯৭৯ সালের মধ্যে জন্মহার হাজার-করা ৩৮ থেকে ২৫-এ কমিয়ে আনতে হলে ঐ সময়কালে আমাদের লক্ষ্য হওয়া উচিত,

নির্বীর্যকরণ	২২ লক্ষ
'লুপ'-ধারণ	৩ ,,
অন্যান্য জন্মনিরোধ ব্যবস্থা	৬ ,,

মা-বোনেরা! আমি জানি, এ পর্যন্ত আমি যা বলেছি তা আপনাদের জানা কথা; সরকারী প্রচার-পুস্তিকা ঘাঁটলে অনায়াসেই এ তথ্যগুলি আপনারা সংগ্রহ করতে পারতেন। তাই এবার আমি আমার নিজস্ব বক্তব্যে আসি। আমার গঠনমূলক সমালোচনার প্রসঙ্গে। আমি কী চাই, আমি কী বলতে এসেছি—

আমার প্রথম বক্তব্য: ঐ যে সরকার বললেন ১৯৭৯ সালের মধ্যে ২২ লক্ষ বিবাহিত নরনারীকে নির্বীর্যকরণ করানো হবে এবং ৩ লক্ষকে 'লুপ' পরিধান করানো হবে—ঐ সংখ্যাগুলি তাঁরা কোথায় পেলেন? ওর পরিবর্তে যদি ৩ লক্ষকে নির্বীর্য-করণ করিয়ে ২২ লক্ষকে লুপ ধারণ করানো হয় তাহলেও তো ফল একই হবে! তাহলে কে ঐ সংখ্যাগুলি স্থির করলেন? কী পদ্ধতিতে? কাকে জিজ্ঞাসা করে?

আপনারা যদি বলেন সরকারী প্রচার পুস্তিকা বেদের মতে অপৌরুষেয়, আপ্ত-

boiRboi.net

বাক্য—তা সমালোচনার অতীত, তাহলে বিজ্ঞানী হিসাবে আমি প্রতিবাদ করব। আমি জানি, এ পরিকল্পনা রূপায়ণের জন্য দিক্‌পাল পণ্ডিতেরা ল্যাবরেটরিতে গবেষণা করে চলেছেন। কেন্দ্রীয় ক্যাবিনেটে পর্যন্ত একটি কনধার কমিটি আছে, স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী যার সভানেত্রী। সারা ভারতে ছয়টি ডেমোগ্রাফিক রিসার্চ সেন্টার খোলা হয়েছে, তার একটি আছে কলকাতায়। সারা ভারতে আটটি ফ্যামিলি প্ল্যানিং কম্যুনিকেশন সেন্টার খোলা হয়েছে, যার একটি আছে কলকাতায় ইণ্ডিয়ান স্ট্যাটিসটিক্যাল ইন্সট্যিটে। ফোর্ড ফাউণ্ডেশনের বদান্যতায় বিভিন্ন রিসার্চ সেন্টারে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে নানান জাতের পরীক্ষা-নিরীক্ষা হচ্ছে। প্রতিটি ল্যাবরেটারিতেই ওঁরা হুমড়ি খেয়ে কাজ করছেন।

কিন্তু মা-বোনেরা! সেটাই কি যথেষ্ট? এ তো গিনিপিগ নিয়ে 'ক্রমোসম্‌স্' এবং 'জীনস্'-এর পরীক্ষা নয়! ল্যাবরেটরিতে তো শেষ উত্তর এ ক্ষেত্রে পাওয়া যাবে না। মাইক্রোস্কোপ আর কম্পুটারেই তো এর শেষ জবাব নেই!

এইটেই আমার বক্তব্য: ওঁরা ভুলে যাচ্ছেন—'লাল-ত্রিকোণে' আছে তিনটি কোণ। ইকুইলাটারাল ট্রায়াঙ্গেল—সমবাহু ত্রিভুজ, সমকোণও বটে। তার প্রতিটি কোণ তুল্যমূল্য—ষাট ডিগ্রি করে। ওঁরা যেটাকে একমাত্র বিবেচ্য বলে মনে করেছেন—সেই জ্ঞানী-গুণী পণ্ডিতদের বিজ্ঞানাগারের আপ্তবাক্যের মূল্য এ পরিকল্পনায় এক-তৃতীয়াংশ মাত্র। দ্বিতীয় কোণটি হচ্ছে এ দেশের যাবতীয় বিবাহিত পুরুষ, এবং তৃতীয় কোণ হচ্ছেন আপনারা—আমার মা-জননীরা। আপনাদের কী সুবিধা-অসুবিধা;—কী পছন্দ-অপছন্দ তা পরিকল্পনাকারদের বুঝে নিতে হবে। সেই নির্দেশেই এ পরিকল্পনাকে রূপায়িত করতে হবে।

আপনারা হয় তো জানেন, আমি ইতিপূর্বে বিবাহিত পুরুষদের ভিতর একটি সমীক্ষা করেছি—তার ফলাফল গ্রন্থাকারে প্রকাশিতও হয়েছে। বর্তমানে আমি এবং আমার তিন সহকর্মী ভারতীয় মহিলাদের দ্বারস্থ হয়েছি। আমি কিছুই দিতে আসিনি, শুধু নিতে এসেছি। আমি জানতে এসেছি, বুঝতে এসেছি, আপনাদের সমস্যা এবং ইচ্ছাটা।

আপনারা হয়তো প্রতিপ্রশ্ন করবেন: কেন? সরকার কি 'ডেমোগ্রাফিক সার্ভে' করছেন না? জবাবে আমি স্বীকার করব, করছেন; কিন্তু যে পদ্ধতিতে আমি করতে চাইছি সেভাবে নয়। ওঁরা জনতার স্বরূপটাই বেশি করে বুঝে নিতে চাইছেন, তাদের সমস্যাটা নয়। একটা উদাহরণ দিই—কী পদ্ধতিতে একটি এলাকায় জন্ম-নিরোধের প্রচেষ্টা ইতিপূর্বে করা হয়েছে সে প্রশ্ন ওঁরা করছেন; কিন্তু কী তাঁদের

boiRboi.net

অসুবিধা, কেন অন্যান্য পদ্ধতি তাঁরা পছন্দ করছেন না সে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা হয় না। কেন হয় না? জিজ্ঞাসা করেছিলাম আমি। ওঁরা বললেন, সে প্রশ্নের জবাব 'হ্যাঁ-না'র মধ্যে সীমিত করা যায় না। তাতে অনেক অবান্তর আলোচনা এসে পড়ে, যা তালিকাকারে প্রকাশ করা মুশ্‌কিল। আমি বলব, মুশ্‌কিল বলে তো হাত-পা ছেড়ে বসে থাকলে চলবে না—মুশ্‌কিল-আসান করতে হবে। এমন প্রশ্ন আছে এমন সমস্যা আছে, যা 'হ্যাঁ-না'-র মধ্যে জবাব দেওয়া যায় না। আপনারা সেই উকিলবাবু আর সাক্ষীর সওয়াল-জবাবের কথা শুনে থাকবেন। উকিলবাবু সাক্ষীকে ধমক দিয়ে বললেন—বাজে কথা বলবেন না, যা জানতে চাইছি তার জবাবে বলুন—'হ্যাঁ, না 'না'। সাক্ষী তখন করজোড়ে বলেছিল, স্যার, এমন প্রশ্ন আছে যার জবাব ওভাবে দেওয়া যায় না। আমি যদি প্রশ্ন করি—'আপনি ইদানীং রাস্তায় মাৎলামি করা বন্ধ করেছেন?' আপনি শুধু 'হাঁ-না'-র মধ্যে জবাব দিতে পারেন?

প্রেক্ষাগৃহে একটা হাস্যরোল উঠল। ডঃ ত্রিবেদী অভিজ্ঞ বক্তা। একটু সময় দিলেন হাসির আমেজটা মিলিয়ে যেতে। তারপর শুরু করলেন, উকিলবাবু 'হ্যাঁ' বললে প্রমাণিত হয় ইতিপূর্বে তিনি মাৎলামি করতেন, 'না' বললে বোঝায় এখনও তিনি তাই করেন! এ-ক্ষেত্রেও তাই। ডেমোগ্রাফিক সার্ভেতে ওঁরা উত্তর-দানকারীর সঙ্গে আলোচনা করতে নারাজ—জবাবে শুধু 'হ্যাঁ-না' শুনতে চান। আমি এ-ব্যবস্থায় বিশ্বাসী নই। আমি চাই আপনাদের সঙ্গে বিস্তারিত আলোচনা করতে। কথোপকথনের মধ্যে দিয়ে আপনাদের প্রকৃত সমস্যাটা প্রণিধান করতে।

এবার বরং বলি—কী তথ্য আমি সংগ্রহ করতে চাই। আমার ভাষণের শেষে আপনারা এই প্রেক্ষাগৃহ থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়ে দেখবেন, বাইরে তিন প্রান্তে তিনটি টেবিল পাতা আছে। আপনাদের মহিলাসমিতির দুই স্বেচ্ছাসেবিকা এবং আমার স্টেনো মিস মেহ্‌তা সেখানে অপেক্ষা করছেন। তিনটি টেবিলে তিনটি চিহ্ন আছে—'A-H', 'I-P' এবং 'Q-Z'। আপনি যদি ইন্টারভিয়ু দিতে রাজি থাকেন—আমার বিশ্বাস সকলেই আমার সঙ্গে সহযোগিতা করতে প্রস্তুত—তাহলে আপনার উপাধি অনুসারে ঐ চিহ্নিত টেবিলের একটিতে উপস্থিত হয়ে নিজের নাম ও ঠিকানা লেখান। কাল পরশুর মধ্যেই আপনি একটি কার্ড পাবেন, তাতে কবে, কখন, কোথায় আপনার জবানবন্দি নেওয়া হবে তার উল্লেখ থাকবে। আপনারা নির্দিষ্ট সময়ে উপস্থিত হবার চেষ্টা করবেন, যাতে পূর্ববর্তী সাক্ষাৎকারীর কোন অসুবিধা না হয়। এক-একজনকে প্রশ্ন করতে আধঘণ্টা সময় লাগবে।

আপনারা নিভৃত-সাক্ষাৎ কক্ষে এসে দেখবেন ঘরের মাঝখানে একটি অনুচ্চ

পার্টিশান দেওয়াল আছে। তার এক পাশে বসবেন আপনি, অপর প্রান্তে আমার কোন সহকারী। তিনি প্রশ্ন করে যাবেন একটি তালিকা ধরে এবং আপনার জবাব লিপিবদ্ধ করে যাবেন। প্রশ্নকারী আপনাকে দেখতে পাবেন না, আপনার পরিচয়ও জানতে পারবেন না। শুধু আপনার কণ্ঠস্বর শুনবেন।

আমি জানি, আপনাদের মনে কী-জাতের প্রশ্ন জেগেছে: কেমন করে আপনাদের নাম-ধাম-পরিচয় গোপন রাখা হচ্ছে? সেটা নিঃসন্দেহে আপনাদের পক্ষে অত্যন্ত গুরুতর বিষয়। সুতরাং সে-প্রসঙ্গে আসা যাক:

আজ ঐ টেবিলে গিয়ে আপনি আপনার নাম-ধাম লেখানোর মুহূর্ত থেকে আপনাকে একটি সংখ্যা দ্বারা সূচীত করা হবে। ধরুন আপনার নম্বর হল ২০২৩। যেদিন প্রশ্নকারী আপনাকে প্রশ্ন করবেন, সেদিন তাঁর কাছে আপনার পরিচয় মিসেস ২০২৩। ঐ সংখ্যাটি যে আপনার তা জানবেন শুধু আপনি এবং আমার একান্ত শ্রুতিধর মিস মেহ্‌তা। প্রশ্নোত্তরকালে আপনি যা জবাব দেবেন তা আমার সহকারীরা লিখবেন একটি সাঙ্কেতিক ভাষায়। সে ভাষার অবিষ্কারক একজন পোলিশ চক্ষু চিকিৎসক। ভাষাটার নাম 'এস্‌পেরেন্টো'। ১৮৮৭ সালে তিনি এই ভাষাটির উদ্ভব করেন; কিন্তু এ-ভাষা কোন দেশেরই কথ্য ভাষা নয়। মিস মেহ্‌তা এ-ভাষা জানেন না। ফলে আপনার উত্তরসম্বলিত কাগজটি ঘটনাচক্রে মিস মেহতার হাতে পড়লেও—যাতে না পড়ে তার ব্যবস্থা আমরা করেছি—তিনি তার বিন্দুমাত্র পাঠোদ্ধার করতে পারবেন না। অপর পক্ষে আমার সহকর্মীরা উত্তরগুলি জানতে পারবেন; কিন্তু জানবেন না—কে সেই চিহ্নিত মিসেস ২০২৩। এইভাবে সকলের উত্তরপত্র সঙ্কলিত হলে আমরা একটি কম্প্যুটারকে সেগুলি কাঁচা-মাল হিসাবে খাওয়াব। কম্প্যুটার তার জারকরসে জীর্ণ করে যখন প্রতিটি উত্তরের শতাংশ নির্ধারণ করবে তখন আপনার ব্যক্তিগত উত্তরের আর চিহ্নমাত্র অবশিষ্ট থাকবে না। প্রতিটি ব্যক্তিসত্তা সমষ্টির মাঝে হারিয়ে যাবে। ঠিক যেভাবে একজন ভোটারের ভোট নির্ধারণ করে প্রার্থীর ভাগ্য, অথচ কে কাকে ভোট দিয়েছে তার চিহ্ন থাকে না।

আর একটা কথা বলি। আপনাদের মধ্যে কেউ কেউ হয়তো আছেন, যিনি মনে করতে পারেন যে, তাঁর যৌনজীবন একটা ব্যতিক্রম—এমনটা আর কখনও কারও জীবনে ঘটেনি, ঘটতে পারে না। এটা আমাদের সম্পূর্ণ ভুল ধারণা। সব রকমের অদ্ভুত কথা শুনতেই আমরা অভ্যস্ত। বিশ্বাস করুন, এমন কোন যৌন-বিকৃতির—ঐ শব্দটাই আমি বিশ্বাস করিনা অবশ্য—কথা আপনারা আমাকে বা আমার সহ-

boiRboi.net

কর্মীদের শোনাতে পারবেন না, যা আমরা ইতিপূর্বে শুনিনি। বিশ্বাস না হয়, আপনি প্রশ্নকারীকে জিজ্ঞাসা করে সহজ হয়ে নেবেন—তিনি বলবেন, এমন কথা তিনি ইতিপূর্বে বহুবার শুনেছেন। সুতরাং আপনাদের নাম-পরিচয় যখন গোপন থাকছে, লজ্জা-সঙ্কোচের প্রশ্নই যখন উঠছে না, চক্ষুলজ্জার বালাইও নেই—এবং যখন আপনাদের আমি আশ্বাস দিচ্ছি কোন মতেই কোন নতুন কথা আপনারা শোনাতে পারবেন না তখন অকপটে আপনারা আপনাদের বক্তব্য আমাকে পেশ করবেন, এই বিশ্বাস নিয়ে এবং ধন্যবাদ জানিয়ে আমার ভাষণ শেষ করছি। আপনাদের মনে যদি প্রশ্ন জেগে থাকে অসঙ্কোচে জিজ্ঞাসা করতে পারেন।

ডঃ ত্রিবেদী জলের গ্লাসটা টেনে নিয়ে আসন গ্রহণ করেন।

প্রেক্ষাগৃহের সামনের একটি সারি থেকে উঠে দাঁড়ালো নোয়ামি। বললে, ধন্যবাদ ডক্টর ত্রিবেদী। আপনি বললেন, আপনার তিনজন সহযোগীও এসেছেন আপনার সঙ্গে। তাঁদের নামগুলি আপনি ঘোষণা করেননি, এ-মঞ্চে তাঁদের দেখতেও পাচ্ছি না—

পিছন থেকে কে-যেন বলে ওঠে, তাঁরা বোধকরি পর্দানসীন!

নোয়ামি ভ্রূক্ষেপ করে না। শেষ করে বক্তব্য, আমরা তাঁদের অভিনন্দন জানাতে এবং স্বাগত জানাতে পারলে খুশী হতাম।

ডক্টর ত্রিবেদী উঠে দাঁড়ালেন। মাইকের সামনে এসে বললেন, না! তাঁরা পর্দানসীন নন। তাঁরা সবাই পুরুষ মানুষ।

হাস্যরোল উঠল প্রেক্ষাগৃহে।

ডক্টর ত্রিবেদী হাত তুলে শান্ত হতে বললেন সবাইকে। নোয়ামির দিকে ফিরে বললেন, কথা দিচ্ছি—আপনাদের অভিনন্দন এবং স্বাগত ভাষণ আমি তাঁদের কাছে কাছে পৌঁছে দেব। এবার আমার কৈফিয়ৎটা দিই: নাটকে যেমন সূত্রধার অপরিহার্য কিন্তু তাঁকে মঞ্চের পিছনে রাখাটাই বিধেয়, আমার এ সমীক্ষায় আমার তিন সহ-কর্মীর অবস্থাও সেই রকম। আমার বিশ্বাস তাঁদের চাক্ষুষ দেখলে বা পরিচয় পেলে আপনাদের উত্তরগুলি অকুণ্ঠ থাকবে না। ওঁদের মধ্যে দুজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ চিকিৎসক —আপনাদের কেউ কেউ তাঁদের পেসেন্টও হতে পারেন। তাই অনিচ্ছাসত্ত্বেও আমি তাঁদের নেপথ্যে রেখেছি। এই সঙ্গে বলি, আমার গ্রন্থে তাঁদের নাম, ধাম, আলোকচিত্র সমেত আমি তাঁদের কাছে অকুণ্ঠ কৃতজ্ঞতা স্বীকার করব।

এবার উঠে দাঁড়ান ডক্টর মিস দাশগুপ্তা। বলেন, ডক্টর, আমি যতদূর জানি ডক্টর মেরী স্টোপস্, ডক্টর কিন্‌যে প্রভৃতি ও-দেশে লিখিত জবানবন্দি নিয়েছিলেন। আপনি এই মৌখিক প্রশ্নোত্তরের ব্যবস্থা করলেন কেন?

—সঙ্গত প্রশ্ন। আমার বিশ্বাস কথোপকথনের মাধ্যমেই প্রকৃত সত্য উদ্ঘাটিত হতে পারে। একটা উদাহরণ দিই। ধরুন, আপনাকে প্রশ্ন করা হল বিবাহের কতদিন পরে আপনার প্রথম স্বামী-সহবাস ঘটেছিল ?···

শ্যামলী প্রেক্ষাগৃহের অপর-প্রান্তে কবরীর কর্ণমূলে বলে, এই কবরীদি! বুড়োটা কাকে কী বলছে ? মোটে মা রাঁধে না, তার তপ্ত আর পান্তা। মিস দাশগুপ্তা··· কবরী ধমক দেয়, 'চুপ কর'!

ডক্টর ত্রিবেদী বলে চলেছেন, আমার সংখ্যাতত্ত্ব বলছে, শতকরা তেরটি জনের প্রথম জবাব হচ্ছে, ঠিক মনে নেই। তখন হয়তো প্রশ্নকারী বলেছেন, তবু কি মনে হয় ? দু-তিন দিন, দু-চার সপ্তাহ ? দেখা গেছে এভাবে কথোপকথনের মাধ্যমে শতকরা বাইশজন পরে সঠিকভাবে তারিখটা মনে করতে পেরেছেন, এগারো শতাংশ সম্ভাব্য দিনের ব্যবধানটা বলতে পেরেছেন, এবং আরও বিশ শতাংশ বলেছেন সপ্তাহের ব্যবধানে। আমার বক্তব্য—লিখিত জবাব চাইলে 'ঐ ঠিক মনে নেই' প্রত্যুত্তরেই সন্তুষ্ট থাকতে হত আমাকে।

শীলা কাপুর এবার উঠে দাঁড়ায়। বলে, কী জাতীয় প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হবে তার দু-একটা নমুনা কি আমরা পেতে পারি ?

বক্তা হেসে বলেন, পারেন। আমি জানি স্টলের শো-কেসে কেন শাড়ি ঝুলিয়ে রাখা হয়। ভিতরে কী-জাতের পণ্য আছে না জেনে মহিলারা দোকানে ঢোকেন না। তাই বলছি, আমাদের প্রশ্নগুলি তিন জাতের। প্রথম পর্যায়ে উত্তরদানকারীর একটা পরিচয় সংগ্রহ করা হবে—নাম-ধাম-বাদে। কত বয়স, কবে বিবাহ হয়েছে, কয়টি সন্তানের জননী, শিক্ষার মান কতদূর, রোজগারের পরিমাণ, পূজা-আর্চা করেন কিনা, রান্না বা ঘরের কাজ কতখানি করেন, অবসর যাপনের পদ্ধতি ইত্যাদি। দ্বিতীয় পর্যায়ে দাম্পত্য জীবনের গোপনতর সংবাদ লিপিবদ্ধ করা হবে। জন্মনিয়ন্ত্রণের কী কী ব্যবস্থা তাঁরা পরখ করে দেখেছেন, কী কী সুবিধা অসুবিধা তাঁরা ভোগ করেছেন, বর্তমানে কী পদ্ধতি অবলম্বন করেন এবং কেন ইত্যাদি। তৃতীয় পর্যায়ে কোন বাঁধাধরা প্রশ্ন নেই; এ পর্যন্ত কথোপ-কথনের পরে প্রশ্নকারী যদি বৈজ্ঞানিক গবেষণার অথবা তথ্য সংগ্রহের প্রয়োজনে কোনও বিশেষ প্রশ্ন করতে চান, তবে তা করে থাকেন। সচরাচর এই তৃতীয় পর্যায়ে আলাপচারীর মাধ্যমে প্রশ্নকারী কতকগুলি উত্তর সংগ্রহ করার চেষ্টা করেন, যার জবাব ঐ 'হ্যাঁ-না'র মধ্যে সীমিত করা যায় না।

বক্তা থামতেই শীলা প্রশ্ন করে, তার একটা নমুনা ?

—তারও একটা নমুনা? ধরুন প্রশ্নকারী জানতে চান উত্তরদানকারিণী দাম্পত্য জীবনে 'সুখী' কি না। এক কথায় এর জবাব হয় না। আপনারা প্রতিপ্রশ্ন করতে পারেন; এ প্রশ্নের জবাব জেনে লাভ? লাভ আছে। এই সংখ্যাতত্ত্ব সরকারী 'ডেমোগ্রাফিক সার্ভে'তে কখনও রাখা হয়নি। সরকারী অফিসার বোধ হয় ভাবেন সুখের 'মাপকাঠি' কী? তার ইউনিট কোনটা? জরিপে এ প্রশ্ন তোলা হয় না। কিন্তু আমি আমার বৈজ্ঞানিক সমীক্ষায় জানতে চাই কত পার্সেন্ট বিবাহিতা ভারতীয় নারী দাম্পত্যজীবনে অসুখী—বিশ্লেষণ করে দেখতে চাই সেই 'অসুখের' কত পার্সেন্ট যৌন-সমঝোতার অভাবে। ধরুন আর একটা প্রশ্ন: আপনি কি আপনার স্বামীকে সর্বান্তঃকরণে ভালবাসেন? কিংবা আপনি কি আপনার স্বামীর ভালবাসা পুরোপুরি পেয়েছেন? এ সংখ্যাতত্ত্ব সরকারী জরীপকারীর পক্ষে অকল্পনীয়—তাঁরা যে গিনিপিগ নিয়ে পরীক্ষা করতে অভ্যস্ত। গিনিপিগদের তো এ জাতীয় সমস্যা নেই। আমাকে এ ধরনের প্রশ্ন করতে হবে; কিন্তু এও জানি, হঠাৎ অমন একটা চরম প্রশ্ন বেমক্কা পেশ করলে অনেকেই রীতিমত বিচলিত হয়ে পড়বেন। তাই কথোপকথনের প্রয়োজন, আলাপচারীর আবশ্যকতা। প্রশ্নটা সরাসরি না-করে এভাবে হয়তো পেশ করবেন প্রশ্নকারী: ধরুন আপনি জানতে পারলেন যে, আপনার বিবাহটা আইনত সিদ্ধ নয়। আপনি প্রথমে কার সাথে কথা বলবেন? আপনার স্বামীর সঙ্গে, না আপনার অ্যাডভোকেট দাদা, কাকা অথবা উকিল মামার সঙ্গে? ওই জবাব থেকেই কিন্তু আপনি ক্রমশ ধরা পড়তে শুরু করেছেন···

হঠাৎ থেমে পড়েন ডক্টর ত্রিবেদী। বলেন, আয়াম সরি! এভাবে আমার হাতের সব তাস আগে-ভাগেই দেখিয়ে দেওয়াটা ঠিক হবে না।

পুনরায় হাস্যরোল উঠল প্রেক্ষাগৃহে।

boiRboi.net

'আপ্যায়ন' হোটেলটা কারখানা-এলাকার বাইরে, টাউনশিপের সবচেয়ে চওড়া রাস্তাটার উপর তিনতলা প্রকাণ্ড বাড়ি। একতলায় ঢুকতেই বাঁ-দিকে হোটেলের নামটি সার্থক করার জন্য চিহ্নিত অফিস, বাঁয়ে আসবাগার, ডাইন ভোজনাগার। মাঝখান দিয়ে চওড়া মোসেইকের সিঁড়ি উঠে গেছে। দ্বিতলে এবং ত্রিতলে আবাসিকদের ঘর। আটটি ডবল্-বেড এবং ষোলটি এককশয্যা বিশিষ্ট কামরা। সংলগ্ন স্নানাগার, ডানলোপিলো গর্দি, মায় ঘরে ঘরে টেলিফোন। প্রমীলা দেবী শেষ মুহূর্তে এখানেই আগন্তুক বিজ্ঞানীদলকে আপ্যায়িত করার ব্যবস্থা করেছেন—অন্তিম মুহূর্তে জেনারেল ম্যানেজার-সাহেব তাঁকে লেঙ্গি-মারার চেষ্টা করার পরে। দুর্ভাগ্যবশত এই শেষ সময়ে সব কয়টি পৃথক একক-শয্যা বিশিষ্ট কক্ষ সংগৃহীত হয়নি। দলে ওঁরা পাঁচজন। পাওয়া গেছে তিনটি সিঙ্গল-সীটেড এবং একটি দ্বৈতশয্যার কামরা।

সেই নিয়েই কথা হচ্ছিল তিনজনের মধ্যে। ডক্টর ত্রিবেদী এবং মিস মেহ্‌তা গেছেন চিত্রলেখা প্রেক্ষাগৃহে। বাকি তিনজনের এ-বেলা ছুটি! তাঁরা তিনটি প্রাণী আসর জমিয়েছেন একতলার বাতানুকূল করা আসবাগারে।

বয়ঃজ্যেষ্ঠ হচ্ছেন ডাক্তার এ. এস. আয়াঙ্গার। ত্রিবেদীর চেয়ে অনেক ছোট। প্রৌঢ় মানুষটি চল্লিশের কোঠায়; এখনও যৌবনের ঘাট পার হননি। মাথার চুলগুলো পাতলা হয়ে এসেছে অবশ্য, গায়ের চামড়ায় ঢিল ধরেনি! দীর্ঘদিন মার্কিনমুলুকে ছিলেন বলেই বোধহয়—তাঁর কথা-বার্তা, হাব-ভাব, চাল-চলন সবই সাহেবি-কেতায়। একমাত্র নামটা নিতান্ত ভারতীয়—অনন্তশয়নম আয়াঙ্গার। আমেরিকার পশ্চিম উপকূলে কোথায় কোন হাসপাতালে কাজ করছেন দীর্ঘ ষোল বছর। দেশে ফিরেছেন সম্প্রতি। বিপত্নীক, নির্ঝঞ্ঝাট মানুষ—রোজগারের প্রয়োজন ছিল না; যা আছে তাতেই তাঁর চলে যাওয়া উচিত বাকি জীবন। কিন্তু আয়াঙ্গার তাতে রাজি নন। অ্যাক্টিভ থাকতে হবে তাঁকে। তাই জুটেছেন ডক্টর ত্রিবেদীর দলে।

দ্বিতীয় জন হচ্ছেন ডক্টর টি. এন. শর্মা। চল্লিশ ছুঁই ছুঁই। তাঁর নিজের ভাষায় 'কনফার্মড ব্যাচিলার'। ছটফটে, ফুর্তিবাজ, চোখে-মুখে কথা। হঠাৎ মনে হতে পারে 'সিনিক', লোকটা তা নয় কিন্তু আদি-রসাত্মক রসিকতা পছন্দ করে, যদিও তার কোন দুর্বলতা নেই। 'ম'-কারান্ত অনেকগুলি দ্রব্যের প্রতিই তার আসক্তি আছে, কিন্তু ঐ একটি ব্যতিক্রমও লক্ষণীয়।

ত্রিবেদী যাত্রাপার্টির তিন-নম্বর সভ্যটি হচ্ছেন শ্রীমান অলক রায়। নিতান্ত ভেতো-বাঙালি। চিকিৎসা-বিদ্যার ধারে কাছেও যায়নি। এম. এ. পাশ করেছিল ইংরাজিতে। চাকরি জোটেনি, টিউশানি পোষায়নি এবং ব্যবসা করবার মূলধন নেই। অগত্যা হয়েছিল খবরের কাগজে 'ফ্রি-লান্সার'। মাঝে মাঝে এখান-ওখানে প্রবন্ধ লিখত। হঠাৎ বেমক্কা এই চাকরিটা জুটে গেছে তার। ভালই লাগছে। আর যাই হোক চাকরিটায় 'থ্রিল' আছে। পর্দার আড়াল থেকে কত অচেনা অজানা সীমন্তিনীর কত অদ্ভুত কাহিনী শুনতে হয়েছে তাকে। ওর নিজস্ব ইন্টারভিয়ুর সংখ্যা চারশ' সাতাশি। লালগড়ে একাধিক অর্ধসহস্র রমণীর সাক্ষাৎ পাবে বলে আশা করছে!

দলে যাঁর মক্ষীরাণী হওয়ার কথা তিনি মিস মেহতা। ডক্টর ত্রিবেদীর একান্ত শ্রুতিধর। মধ্যবয়স্কা, স্থূলাঙ্গিনী, শ্যামবর্ণা। শর্মার মতে—মিস হিপ্পি! মার্কিন হিপ্পি নয়, স্রেফ হিপ্পো-স্ত্রিয়াম-ঈপ।

ওরা তিনজনে 'বার'-এ এসে বসেছে অনেকক্ষণ। স্প্রিং-চিকেন সহযোগে দু-তিন পেগ করে করে প্রত্যেকেই চড়িয়েছে। সান্ধ্য-মজলিসটি জমেছে ভালই। এ জাতীয় আসরে যাঁরা কখনও-সখনও যোগ দিয়েছেন তাঁরা জানেন—এমন একটা পর্যায় আসে যখন পা টলে না, কিন্তু মনের আগল সরে যায়। কিন্তু সেটা আবার দু-জাতের। কারও মনের আগলের সঙ্গে মুখের আগলও যায় সরে। বিড়-বিড় করে, বকবক করে,—কবে কোন কাঁকনপরা হাতের চোট লেগেছিল বুকে সেটা টন্‌টনিয়ে ওঠে, সেই কাহিনী শোনাতে বসে। আবার কারও বা মুখে কুলুপ। বিস্মৃত অতীতের মানুষগুলো ছায়াবাজির মত সামনে এসে দাঁড়ায়, ট্যাবলোতে অভিনয় করে। ওদের তিনজনেরই এখন সেই অবস্থা—তুরীয় নয়, তরলিত, তুড়ি মেরে জীবনটাকে বাজি ধরার পর্যায়।

অলক বললে, না, না, ব্যবস্থাপনাটা তোমার ঠিক হয়নি শর্মা। তোমরা তিনজনে সিঙ্গল-সাটেড কামরা নিয়ে আমাকে ঠেলে দিয়েছ আয়াঙ্গার সাহেবের ঘরে। ভেরি ব্যাড। আমার আদৌ আজ ঘুম হবে না। আয়াঙ্গার-সাহেবের প্রচণ্ড নাক ডাকে। কী সাহেব? ডাকে না?

আয়াঙ্গার নীমিলিত নেত্রে শুধু বললে, নেভার হার্ড অব্, ইট।

—আপনি শুনবেন কেমন করে? শুনবার মত অবস্থায় যখন আসে তার আগেই তো নাকটা ডাকা বন্ধ করে।

—আই সেড: নেভার হার্ড 'অব্,' ইট, ইয়ংম্যান! তুমি ইংরাজিতে এম.

boiRboi.net

এ. পাশ করলে কেমন করে? স্বকর্ণে নাকডাকাটা শুনিনি বলছি না, বলছি, সে-কথা কখনও কেউ বলেনি!

—অথচ আমরা শুনেছি ঐ কারণেই মিসেস আয়াঙ্গার তোমাকে ডিভোর্স করেছিল?

আয়াঙ্গারের চোখ খুলে যায়। টক্‌টকে লাল চোখ। বললে, কে? ডরোথি! নাক-ডাকা-টাকা নয়, সে-মাগী তার নাগরের জন্যই আমাকে এমন দ'য়ে মজিয়ে কেটে পড়ল! শুনবে তার কেচ্ছা?

অলকের অবস্থা অতটা ঘোলাটে নয়। সে জানত কালো-সাহেব আমেরিকাতেই দু-দুবার বিবাহ করেছেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ হবার পরে তিনি আমেরিকায় পাড়ি জমান। প্রথম যে মার্কিন মহিলাটির পাণিপীড়ন করেন তিনি ওঁর মায়া কাটান মাত্র এক বছরের ভিতরেই। দ্বিতীয়া দীর্ঘদিন ওঁকে বরদাস্ত করেছেন বটে তবে শেষ-বেশ তিনিও তাঁকে তালাক দিয়েছেন। ডক্টর আয়াঙ্গার তারপর ফিরে এসেছেন ভারতবর্ষে। ডরোথি তাঁর প্রথমা না দ্বিতীয়া তা ঠিক জানা ছিল না—কিন্তু তাঁর কেচ্ছা এখন শুনবার মত মুডও ছিল না অলকের। বললে, থাক আয়াঙ্গার-সাহেব, তাঁর কথা থাক। তোমাকে তিনি দাগা দিয়েছেন বুঝতে পারছি; কিন্তু তিন পেগ্ হুইস্কির নেশা তাঁর কথা আলোচনা করে নষ্ট করাটা কি বুদ্ধিমানের কাজ হবে?

এক গাল হাসলেন আয়াঙ্গার, একেবারে খাঁটি কথা! তিন পেগ্ হুইস্কির নেশা তোমাকে ভাঙতে দেব না, ডরোথি! হুঁ হুঁ বাবা! আমি অত কাঁচা পোলা নই।

শর্মা বললে, অলক, তুমি মিথ্যে আমাকে দোষারোপ করছ ভাই। তোমাকে ঐ আয়াঙ্গার-সাহেবের ঘরে আমি পাচার করিনি—ব্যবস্থাটা করেছে বুড়ো ভাম নিজে।

অর্থাৎ ডক্টর ত্রিবেদী। শর্মার এটা আদরের ডাক। শর্মা আরও বলে, আমার হাতে যদি ব্যবস্থাপনার ভার থাকত তাহলে আমরা থ্রি মাস্কেটিয়ার্স নিতুম তিনখানা সীঙ্গল-সীটেড রুম। ডব্‌ল্ ঘরটা ছেড়ে দিতুম বুড়ো ভাম আর মিস হিপ্পির জন্যে!

অলক খিলখিলিয়ে হেসে ওঠে। বলে, গ্র্যাণ্ড আইডিয়া!

—নয়? বুড়ো ভাম তামাম ভারতবর্ষ চুঁড়ে যা জানতে চাইছে, মিস হিপ্পি এক রাতের ভিতর সেটা তাঁকে বেবাক্ সমঝিয়ে ছাড়ত!

boiRboi.net

আয়াঙ্গার শুধু বললে, দ্যাটস্ কারেক্ট! হি নীডস্ প্র্যাক্‌টিক্যাল ডিমন্সট্রেশান!

আবার তিনজনে নীরবে পান করতে থাকে। শেষে নীরবতা ভেঙে অলকই নূতন প্রসঙ্গের অবতারণা করে, শর্মা তুমি প্র্যাকটিস ছেড়ে দিয়ে এই খোঁয়াড়ে ঢুকলে কেন বল তো?

শর্মা ঘোলাটে চোখ তুলে অলককে একবার দেখে নিয়ে বললে, আমি? কি ব্যাপার হল জান? আমি তো একলা মানুষ—না জরু, না গরু; ভাবলুম প্র্যাকটিস করে টাকা জমাবো কার জন্যে?···আর তাছাড়া সত্যি বলতে কি, বুড়ো ভামের একটা প্রবন্ধ পড়ে আমার দুরন্ত কৌতূহল হয়েছিল, অস্বীকার করব না। মনে হল বুড়োটা একটা কাজের মত কাজ করছে! এসে দেখা করলাম বুড়োর সঙ্গে। দিল্ চাইল—ঝুলে পড়লাম।

—আর কিছু নয়?

—আবার কী?

—ওঁর এই ব্যাপারটার মধ্যে আলাদা জাতের একটা থ্রিল তো আছে। সে লোভে নয় তো?

—দু—র! মেয়েমানুষ জাতটার প্রতি কোন কৌতূহল নেই আমার।

—সেটা আমিও লক্ষ্য করেছি। কিন্তু কেন বলতো? জীবনে কখনও কাউকে ভালবাসনি শর্মা?

—ভালবাসা? প্রেম! প্যার? মহব্বৎ!—হিহিহি!

—তোমার বিয়ে করা উচিত। এমনভাবে জীবনটা কেন বরবাদ করছ?

শর্মা জবাব দেবার সুযোগ পেল না। তার আগেই আয়াঙ্গার বলে ওঠেন, খবর্দার শর্মা, ও ফাঁদে পা দিও না! ভুক্তভোগীর উপদেশটা শোন। ও জাতটা স্রেফ নেমকহারাম্! অ্যাগ্‌নেস যে-ভাবে আমাকে···

বাধা দিয়ে অলক বলে, অ্যাগ্‌নেস্? এই না বললে ডরোথি?

—আমি আমার অপর স্ত্রীর কথা বলটি এখন। এ্যাগ্‌নেস্ যে-ভাবে···

আবার বাধা দিয়ে অলক বলে, তাঁর কথা থাক আয়াঙ্গার। তোমার নেশা ছুটে যাবে। কিন্তু এ কথাও বলি বন্ধু, ঐ অ্যাগ্‌নেস্ আর ডরোথিই দুনিয়ার সব মেয়েকে প্রতিনিধিত্ব করে না। তোমার দুর্ভাগ্য, তুমি জীবনে একনিষ্ঠ প্রেমের সন্ধান পাওনি—

এবার খাড়া হয়ে উঠে বসে আয়াঙ্গার। ঠক্ করে মদের পাত্রটা নামিয়ে রাখে টেবিলে। বলে, এতবড় কথাটা তুমি আমাকে বলতে পারলে অলক? তুমি

boiRboi.net

কতটুকু জান হে দুনিয়াদারীর ? হে দুগ্ধপোষ্য শিশু—শুনে নাও—অতবড় হতভাগা আমি নই। আমার জীবনেও প্রেম এসেছিল—সাচ্চা প্রেম—তবে আমি নির্বোধ, তার মূল্য বুঝতে পারিনি সেদিন—

শর্মা বললে, এই শুরু হল মাতলামি—

অলক বললে, না না, গল্পটা জমবে মনে হচ্ছে। তুমি বল আয়াঙ্গার, আমরা শুনছি। বল সেই মেয়েটির কথা। তোমার সেই সাচ্চা প্রেমের কেচ্ছা! কোথায় পেয়েছিলে তাকে ? আমেরিকায় ?

—না! সে আমার জীবনের প্রথম প্রেম। এই ভারতবর্ষেরই মেয়ে।

—ভেরি গুড। জমিয়ে বল। আর এক পেগ করে দিতে বলি, বয় !

আয়াঙ্গার তার প্রথম প্রেমের গল্প ফাঁদল। সেই মামুলী প্রেমের জোলো গল্প। ডাক্তার এবং নার্স। সদ্য ডিগ্রি পাওয়া হাউস-সার্জেন এবং তারই ওয়ার্ডে চাকরী করতে আসা অষ্টাদশী নার্স।

শর্মা ঘড়ি দেখল। রাত নয়টা। বুড়ো ভাম আর হিপ্পি আর আধঘন্টা-খানেকের মধ্যেই এসে যাবে মনে হচ্ছে। তার মধ্যে আশা করা যায়, আয়াঙ্গারের ঐ মামুলি প্রেমের গল্পটা শেষ হবে। শর্মা জানে, তার অনিবার্য পরিসমাপ্তি। হতাশ-প্রেমের উপাখ্যান যে-ভাবে শেষ হয় আর কি। মেয়েটির অন্যত্র বিয়ে হয়ে যাবে। কিংবা মারা যাবে ; কিংবা—

আয়াঙ্গার নেশার ঝোঁকে গল্পের জাল বুনে যায়।

পুনা হাসপাতালে সিনিয়ার হাউস্-সার্জেন ডক্টর এ. এস. আয়াঙ্গার। কর্মচঞ্চল সুদর্শন মানুষটিকে সবাই ভালবাসে। ঐ হাসপাতালেই চাকরি করতে এল মেয়েটি। অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান। বুদ্ধিদীপ্ত উজ্জ্বল চেহারা—এক মাথা সোনালী চুল, নীল চোখ। আঠারোটি বসন্তের দান তার যৌবনোদ্ধত তনুদেহের কানায় কানায় টলমল। সব কয়টা ডাক্তারের নজর পড়ল তার উপর—সবাই ছোঁক-ছোঁক করে, ঘুর-ঘুর করে! নার্স কাউকে পাত্তা দেয় না। আপন মনে কাজ করে যায়। একদিন কী একটা রুগীর ব্যাপারে আয়াঙ্গারকে সারা রাত থাকতে হল ঐ রোগীর শিয়রে। সঙ্গী ছিল ঐ নার্সটি। সে রাত্রেই দুজনের মন জানাজানি হল—ঐ মরণোন্মুখ রোগীর শয্যাপার্শ্বে। প্রথম প্রেমের পক্ষে পরিবেশটা উপযুক্ত নয়, তবু সত্যের খাতিয়ে আয়াঙ্গার স্বীকার করে বাস্তবে তাই ঘটেছিল। পেশেন্টটি বাঁচেনি, কিন্তু ওদের পরিচয়টা পরিণত হল প্রেমে। ক্রমে, যেমন হয়ে থাকে—ডিউটির পরে দুজনের দেখা হত চিহ্নিত স্থানে! সারা পুনা শহর চষে ফেলল দুজনে।

বন্ধুরা আয়াঙ্গারকে বলত 'লাকি ডগ্'। শেষে আয়াঙ্গার বলে বসল, চল ডার্লিং, কদিনের ছুটি নিয়ে বম্বে বেড়িয়ে আসি। বলার অপেক্ষা। মেয়েটি রাজী হল। ছুটি নিয়ে চলে গেল বোম্বাই। হোটেলে নাম লেখাতে হল মিস্টার অ্যাণ্ড মিসেস বলে। না হলে একঘরে ঠাঁই হত না। গিয়েছিল দুদিনের জন্য; কিন্তু ছুটি বাড়াতে হল। সে এক অদ্ভুত জগৎ! কী ছেলেমানুষী করেছে দুজনে—মেরিন ড্রাইভে, জুহু বীচে, এলিফ্যান্টায়!

বেয়ারা আর এক পেগ করে হুইস্কি দিয়ে গেল। খালি সোডার বোতলগুলি উঠিয়ে নিয়ে যায়। আয়াঙ্গার শূন্যগর্ভ গ্লাসটা পূর্ণ করতে করতে বললে, শী ওয়াস হেড-ওভার হীলস্ ইন লাভ উইথ মি! তিন মাসের মধ্যে আমাকে ছাড়া আর কারও সঙ্গে ডেটিং করেনি। আশ্চর্য একমুখী প্রেম তার, মেয়েটা ডানে তাকায়নি, বাঁয়ে তাকায়নি—

শর্মার নাকে জাগল কুঞ্চন। বললে, এতই একনিষ্ঠ প্রেম বলে যদি মালুম হয়ে থাকে তবে তাকে বে করলে না কেন বাওয়া?

ঐ যে বললাম; তখন আমার উদ্‌ভ্রান্ত যৌবন। ফুলে ফুলে মধু খাওয়ার যুগ যে সেটা! ইন-ফ্যাক্ট তাকে না জানিয়েই বিলাতে পালিয়ে গিয়েছিলাম আমি—কেটে পড়েছিলাম! ফুরুৎ!

অলক অবাক হয়ে বলে, বল কি! তাকে না জানিয়ে পালিয়ে গেলে?

এক চুমুকে অনেকটা গলাধঃকরণ করে আয়াঙ্গার বলে, সেই পাপের প্রায়শ্চিত্তই তো করছি সারা জীবন। তার প্রতি যে অন্যায় করেছিলাম তার শাস্তি দু-দুবার পেলাম—অ্যাগ্‌নেদ্ অ্যাণ্ড ডরোথি! না, না, ওদের কথা থাক। আমি শুধু আমার প্রথম প্রেমের কথাই আজ শোনাব তোমাদের। নোয়ামীর কথা—

শর্মা বললে, নোয়ামি! এই যে বললে ভারতীয় মেয়ে?

—বললাম না অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান?

অলক বললে, এবার ভারতবর্ষে ফিরে এসে তার খোঁজ করনি?

—করেছিলাম! ওর পার্মানেন্ট ঠিকানাটা জানতাম। খুঁজে খুঁজে সেই গ্রামে গিয়েছিলাম। রোমান ক্যাথলিক চার্চ আছে একটা—কেরালার গ্রাম। চার্চের পাদরী-সাহেব বললেন নোয়ামি গত বিশ বছরের ভিতর দেশে আসেনি। তবে এটুকু খবর জানেন যে, মিস নোয়ামি বর্তমানে মিসেস স্মিথ, তাঁর সন্তানাদিও হয়েছে। বড়টি মেয়ে। তার পরের খবর আর উনি রাখেন না।

অলক আরও কিছু বলতে যাচ্ছিল, বাধা পড়ল। ডক্টর ত্রিবেদী এসে উপস্থিত

হলেন। পিছন পিছন মিস মেহ্‌তা। তার হাতে প্রকাণ্ড একটা ফুলের মালা। ত্রিবেদী বললেন, খুব জমিয়ে বসেছ মনে হচ্ছে? নৈশ আহারটা এবার সেরে ফেললে কেমন হয়?

অলক বললে, আমরা আপনাদের জন্য অপেক্ষা করছি। মিটিং কেমন হল?

ডঃ ত্রিবেদী জবাব দেবার আগেই মিস মেহ্‌তা বললে, গ্র্যাণ্ড। মেয়েরা তোমাদের খোঁজ করছিল—

শর্মা প্রায় লাফিয়ে ওঠে, রিয়ালি?—তার পরেই হতাশ হবার ভঙ্গি করে, ও! আয়াম সরি। আমাদের তো পার্টিশানের এধারে থাকতে হবে!

ডঃ ত্রিবেদী বলেন, জোকস্, অ্যাপার্ট, আমার মনে হয় হাণ্ড্রেড পার্সেণ্ট অ্যাটেণ্ডেন্স হবে। সবাই তো নাম লেখালো—

মিস মেহ্‌তা বললে, ওদের সভ্যা সংখ্যা একশ সাতাশ, তার ভেতর একশ তেরজন নাম-ঠিকানা লিখিয়ে গেছে।

ত্রিবেদী বলেন, আজ রাত্রেই আমরা লিস্ট করে ফেলব! কাল সকালের জন্য আমি ওখানেই তিন-ছয় আঠারো জনকে কার্ড বিলি করে এসেছি। সকাল নয়টা থেকে ইণ্টারভিয়ু শুরু হবে—সুতরাং হিসেব করে ঐ সব ছাই-ভস্ম খাও! হ্যাং-ওভার না হয়।

শর্মা বললে, আমরা পোড়-খাওয়া পুরোনো পাপী! কিস্সু হবে না। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। ব্যাগ-ট্যাগ রেখে চলে আসুন। এখানেই খাওয়া-দাওয়া সেরে উঠব আমরা।

ত্রিবেদী ঘড়ি দেখে বললেন, এখন দশটা পঁয়ত্রিশ, আমরা দশ মিনিটের ভিতরেই আসছি। খাবারের অর্ডার দিয়ে রাখ। আর অলক, তোমার সঙ্গে আহারের পর আমার কিছু কথা আছে। আমার ঘরে একবার এস।

ওরা চলে যান অতঃপর।

অলক বললে; মনে হচ্ছে 'নিশি ভোর হবে রাতি জাগিয়া!'

তা অবশ্য হয়নি, পুরো রাত জাগতে হয়নি অলককে; কিন্তু ইংরেজি হিসাবে সে রাত্রে ঘুমাতে যেতেও পারেনি। ডঃ ত্রিবেদীর সঙ্গে কথাবার্তা সেরে যখন শুতে গেল রাত তখন প্রায় পৌনে একটা।

ডঃ ত্রিবেদী একটি ইজিচেয়ারে অর্ধশয়ান অবস্থায় আলোচনা করছিলেন অলকের সঙ্গে। ত্রিবেদী একজন নিটোল টিটোটেলার—সিগ্রেট নয়, চুরুট নয়—পান তো নয়ই, দু-অর্থেই-অর্থাৎ 'বার'-জ নয় এবং বরোজ-ও নয়! মায় বিবাহও নয়! শর্মা

boiRboi.net

বলত মানুষমাত্রেই একটা না একটা 'ভাইস' থাকে। এ বৃদ্ধ ভদ্রলোকের নেশাটা কী? মদ নয়, মেয়েমানুষ নয়, রেস নয়, জুয়া নয়, পাপ করল না জীবনে?

অলক বলত, নরক দর্শন হবে না আর কি, অক্ষয় স্বর্গবাস!

—স্বর্গবাস! অসম্ভব! চিত্রগুপ্ত মশাই আগেই শুধোবেন—তাহলে ভবে এসে করলি কী? কী জবাব দেবে ঐ বুড়ো ভাম?

ফলে আহারান্তে এক টুকরো হরতুকি মুখে ত্রিবেদী বসেছিলেন আরাম-কেদারায়। অলক তাঁর মুখোমুখি, ঘুম-ঘুম চোখে।

ওঃ ত্রিবেদী বললেন. কয়েকটা জরুরী কথা তোমাকে বলব বলে ডেকেছি। শোন, আমার মনে হচ্ছে, এখনই আমাদের ঐ দ্বিতীয় বইটি লেখা শুরু করা উচিত।

অলক অবাক হয়ে বলে, সে কি স্যার? আমাদের সমীক্ষা যে এখনও শেষ হয়নি—

—এই লালগড়েই সেটা শেষ হচ্ছে। ইতিমধ্যে আমরা দু হাজার সতেরটি প্রশ্নোত্তর সংগ্রহ করেছি, এখানে একশ তেরটি যোগ হচ্ছে—একুনে হচ্ছে ২১৩০। এখানেই আমরা 'বাস' করছি।

—তা তো বুঝলাম, কিন্তু সেই উত্তরগুলি তো সাজাতে হবে, তার ফলাফলের শতাংশ বার করতে হবে। তার আগে কেমন করে লেখা শুরু করবেন আপনি? কী লিখবেন তাই তো এখনও জানেন না—

সোজা হয়ে বসেন ত্রিবেদী। বলেন, প্রথম কথা, আমি লিখব না; লিখবে তুমি। দ্বিতীয় কথা ফলাফল কী-জাতের হবে তা আন্দাজ করতে পারা যাচ্ছে এখন থেকেই। সেটাতো গ্রন্থ শেষে তালিকাকারে সাজাতে হবে। তার আগেই মুখবন্ধ হিসাবে যা লিখবার তা এখনই শুরু করতে অসুবিধা কোথায়?

অলক উত্তরোত্তর বিস্মিত হচ্ছে! অন্যান্য বিষয় ছেড়ে দিয়ে সে শুধু প্রথম প্রসঙ্গটার বিষয়েই সীমিত করল তার প্রশ্ন, আমি লিখব? মানে?

—শোন। তুমি আমার ছেলের বয়সী। শুধু তাই নয়, আমি স্থির নিশ্চয় বুঝেছি—তুমিই আমার উত্তরাধিকারী। আয়াঙ্গার থাকবে না, শর্মা খেয়ালি—একমাত্র তোমার উপরেই আমার ভরসা। তাই এতকথা বলছি। প্রথম কথা হচ্ছে, আমি হিন্দিতে লিখতে অভ্যস্ত। ইংরাজি লিখতে হলে আমাকে লঙ-হ্যাণ্ডে লিখতে হয়; তাতে সময় লাগে বেশি। চিঠিপত্র ডিক্টেশানে লিখতে পারি—কিন্তু কোন গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধের ভাষা কিছুতেই ডিক্টেশানে আসে না। তাই আমি চাইছি—তুমি একটা খসড়া তৈরি কর; পয়েন্টস্ আমি লিখে দেব, অধ্যায়গুলি কী-

BanglaBook.org

ভাবে সাজানো হবে তাও লিখে রেখেছি। তুমি মিস মেহেতাকে ডিক্টেশান দিতে থাক, ও এক-এক পাতা করে ছেপে দিক। আমি সঙ্গে সঙ্গে সংশোধন করতে থাকি—

অলকের মনে যে প্রশ্নটি জেগে ওঠে সে বিষয়ে জিজ্ঞাসা করতে ওর সঙ্কোচ হচ্ছিল—উনি কী-ভাবে আগের বইটি লিখেছেন! তার ইংরাজী তো ভালই ছিল! ত্রিবেদী নিজে থেকেই সে প্রসঙ্গ তুললেন, প্রথমবার, বুঝলে অলক, আমি হিন্দিতেই বইটি রচনা করি, ইংরাজী অনুবাদ করে দেন একজন ইংরাজীর অধ্যাপক। অবশ্য আমি কাটাকুটি করে সংশোধন করে দিয়েছিলাম।

এটা রীতিমত চমকপ্রদ সংবাদ, কারণ অলকের মনে পড়ল আগেকার গ্রন্থে এ তথ্য আদৌ পরিবেশিত হয়নি। বইটির 'টাইট্‌ল্ পেজ' পড়লে মনে হয় ডক্টর ত্রিবেদীই ইংরাজি বইটির একক লেখক।

অলক সে-কথা বলল, আমার ধারণা ছিল ইংরাজি থেকে আপনিই পরে হিন্দিতে অনুবাদ করেন। ইংরাজি বইতে তো অনুবাদকের নামটা নেই—

এ-কথাই ভাবছিলেন বোধহয় ত্রিবেদী। বললেন, তার কারণ সেই শর্তেই তাঁকে নিয়োগ করেছিলাম আমি, অত্যন্ত উচ্চ মূল্যে। প্রতি পৃষ্ঠা অনুবাদ করতে তিনি পাঁচটাকা চার্জ করেছেন—এবার অবশ্য তা করব না আমি। আমরা দুজন হব 'জয়েন্ট অথর'।

অলক ভাবছিল, অর্থমূল্যে কি একজন সাহিত্যিকের কৃতিত্ব এভাবে ক্রয় করা যায়? কে সেই অনুবাদক ও জানে না—তবে নিশ্চয় তাঁর অর্থাভাব প্রচণ্ড ছিল, তাই তাঁর বিনিদ্র-রজনীর পরিশ্রম এভাবে টাকার হিসাবে মিটিয়ে নিয়েছেন। ত্রিবেদী ওর চিন্তাধারা অনুমান করেই বললেন, ও-সব চিন্তা থাক অলক। কাজের কথায় আসা যাক। যে কাজটা তোমাকে দিয়ে বর্তমানে করাচ্ছি সেটা ঠিক তোমার কাজ নয়। তুমি চিকিৎসা-বিজ্ঞানীও নও, স্যোশাল-সায়েন্স সম্বন্ধেও তোমার কোন পড়াশুনা নেই।

—তাহলে আমাকে চাকরিতে নিয়েছিলেন কেন? এই ইংরাজি বই লিখতে হবে বলে?

—তুমি রাগ করেছ মনে হচ্ছে। কিন্তু একটু ভেবে দেখ অলক, আমি অন্যায় কিছু বলছি না। তুমি কাজ খুব ভাল করছ—কিন্তু এই গ্রন্থ-রচনায় তোমার ট্যালেন্ট আরও বিকশিত হবে। তোমার লেখা প্রবন্ধ আমি পড়েছি। ইংরাজিতে তোমার দখল আছে। তাছাড়া যেজন্য তোমাকে ডেকেছি সেটা

boiRboi.net

এখনও বলা হয়নি। এ পরিকল্পনার উজ্জ্বল ভবিষ্যতের কথা। তোমার এবং আমার সম্ভাবনার কথা—

সমস্ত কথা উনি খুলে বললেন। এই সমীক্ষার জন্য যাবতীয় ব্যয়ভার বহন করেছেন একজন ধনকুবের—রামসুন্দর* কানোরিয়া। কিন্তু তাঁর উদ্দেশ্য এইটুকু নয় যে, খানকতক বই লিখে তার বিক্রয়-লব্ধ অর্থ পকেট-জাত করা। বই বিক্রি করে আর কত টাকা হতে পারে? দশ-বিশ-পঞ্চাশ হাজার? সেটা কানোরিয়ার কাছে এমন কিছু নয়। আসল কথা হচ্ছে কানোরিয়া এই প্রকল্পের বিরাট একটা সম্ভাবনা দেখতে পেয়েছেন। তিনি চান, এই দুটি সমীক্ষা শেষ হবার পর ডক্টর ত্রিবেদী আরও ব্যাপকভাবে আরও বৃহৎ আকারে একটি সমীক্ষা চালাবেন। তার কেন্দ্রীয় অফিস থাকবে দিল্লীতে। সারা ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে—বোম্বাইয়ে, কলকাতায়, মাদ্রাজে, বাঙ্গালোরে এবং লক্ষ্ণৌতে থাকবে শাখা অফিস। পাঁচ-সাতশো কর্মীকে নিয়োগ করা হবে একটা বিরাট জরীপ করার জন্য। যেভাবে ডঃ কিনযে আমেরিকায় গবেষণা করে পঞ্চাশের দশকে রচনা করেছিলেন দু-খানি প্রামাণিক যৌন গ্রন্থ—Sexual Behaviour in the Human Male এবং Human Female। প্রথম গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়েছিল ১৯৪৮-এ—পাঁচ হাজারের উপর মার্কিন পুরুষের বিভিন্নমুখী যৌন-অভিজ্ঞতা সংগ্রহ করেছিলেন তিনি। তাঁর প্রথম গ্রন্থে প্রকাশিত হয় মার্কিন যুবকদের শতকরা শতজনই বিবাহ-পূর্ব যুগে নারীদের দেহস্পর্শ ও চুম্বন করেছেন, শতকরা অন্তত পঞ্চাশ ভাগের আছে প্রাক-বিবাহ সহবাসের অভিজ্ঞতা। বইটি নিয়ে তুমুল ঝড় উঠেছিল। একদিকে যেমন লক্ষ লক্ষ কপি বিক্রি হল, অপরদিকে প্রাচীনপন্থী সংস্থানগুলি এবং চার্চ-সম্প্রদায় ডঃ কিনযেকে গালাগাল দিতে শুরু করলেন। কেউ কেউ বললেন, কিনযেকে যাঁরা ঐসব রঙ-চড়ানো অভিজ্ঞতার কথা বলেছেন তাঁরা 'ডন-জুয়ানী'-ভঙ্গিতে অতিশয়োক্তি করেছেন। আমেরিকান মহিলারা নিশ্চয়ই এত সহজলভ্যা নয়। বাক-বিতণ্ডা চরমে উঠল। ডঃ কিনযে সে তর্কে অংশগ্রহণ করেননি আদৌ। কিন্তু পাঁচ বছরের মধ্যে তিনি দাখিল করলেন তাঁর দ্বিতীয় গ্রন্থ Sexual Behaviour in the Human Female। সেই একই ইতিহাস। হাজার পাঁচেক বিবাহিত মার্কিন যুবতী ও মহিলার ভিতরে সমীক্ষা করে তিনি দেখালেন, শতকরা প্রায় ৯৯ জন প্রাক-বিবাহ চুম্বন-আলিঙ্গনের অভিজ্ঞতা লাভ করেছিলেন, শতকরা ৪০ জনের বিবাহ-পূর্ব সহবাসের অভিজ্ঞতা ছিল। রক্ষণশীলরা যতই গালাগাল করুন, সমস্ত দুনিয়া মেনে নিয়েছে

boiRboi.net

দুটি বই বিশ্বযৌনসাহিত্যের অন্যতম উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। পুরুষ ও নারীর যৌন ব্যবহার ও অভিজ্ঞতার এমন তথ্যনির্ভর, পুঙ্খানুপুঙ্খ, বিজ্ঞানসম্মত আলোচনা আর কোনও বইতে পাওয়া যায় না।

কিন্তু! ডঃ কিনসের গ্রন্থ শুধুমাত্র আমেরিকান নর-নারীর কথাই বলেছে। তা দিয়ে সারা পৃথিবীকে বিচার করা চলে না। আমাদের সমাজ-ব্যবস্থা, ধর্মীয় ধ্যান-ধারণা, স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কের উপর সমাজ ও ধর্মের বিধি-নিষেধ, শিক্ষা ও অর্থ নৈতিক চাপ যৌন-জীবনে কী ভাবে প্রভাব বিস্তার করেছে সেটা নিয়ে কেউ কোন গবেষণা করেনি। কানোরিয়া-সাহেব সেই কাজের জন্য ডক্টর ত্রিবেদীকে নিয়োগ করতে চান।

সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ে ত্রিবেদী নিম্নস্বরে বললেন, অত্যন্ত গোপন খবরটা বলি এবার—টাকা কানোরিয়া নিজে ঢালছেন না; একটি বিদেশী সংস্থা ঢালছেন। আমেরিকার টাকা—ডলারে! এ মিলিয়ান-ডলার প্রজেক্ট।

অলক নির্বাক বিস্ময়ে চুপ করে বসে শোনে!

—শোন! কানোরিয়া দুঁদে লোক। সে জানে দেশটা ভারতবর্ষ। এখানে হিন্দু কোড বিল পাশ করাতে কী প্রচণ্ড বাধার সম্মুখীন হতে হয়েছে তা তিনি দেখেছেন। গো-মাতা রক্ষার জন্য এখানে আন্দোলন হয়। এতবড় একটা প্রজেক্টে নেমে পড়ার আগে কানোরিয়া দেশটাকে একটু বাজিয়ে দেখতে এই দুটি ছোট্ট জরীপ করালেন—এই 'লাল-ত্রিকোণের' জরীপ। যেহেতু এই সার্ভে সরকারের পরিবার-পরিকল্পনা প্রকল্পের সঙ্গে একসুরে বাঁধা, তাই এক্ষেত্রে আমাদের খুব বেশি বাধার সম্মুখীন হতে হয়নি—এমনটা আমরা আশাও করেছিলাম। হলও তাই। কিন্তু এবার বৃহত্তম রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ হবার আগে আমাদের ঘর সামলাতে হবে—

—কী করতে চান আপনি?

—অলক! আমি প্রথমত চাই তোমাকে! ইয়েস! অলক রায়কে! আমার একান্ত-অনুগত নেক্সট-ইন্-কমাণ্ড রূপে। এই নূতন প্রকল্প চালু হলে তুমি আমি দিল্লীর হেড-কোয়ার্টার্সে থাকব। আমার বয়স হয়েছে। বেশি ঘোরাঘুরি পোষাবে না। তুমি ঘুরে ঘুরে তদারকি করবে। বর্তমানে তুমি যা পাচ্ছ নিঃসন্দেহে তার দ্বিগুণ রোজগার হবে তোমার। সময়াভাবে সমস্ত ঘোরাঘুরি তোমাকে করতে হবে প্লেনে। ফার্স্টক্লাস হোটেলে রাখা হবে তোমাকে। আরাম-অর্থ-প্রতিপত্তিই শুধু নয়, নাম-যশ-নটোরিটি!

অলক রীতিমত অভিভূত। বললে, কতদিন লাগবে মনে হয় সেটা চালু হতে?

—যত শীঘ্র তুমি বর্তমান বইটি লিখে ফেলতে পারবে। আমার তো মনে হয় বছরখানেকের মধ্যেই—আগেও হতে পারে। মিস্টার কানোরিয়া দিন পাঁচ-সাতের মধ্যে এখানে আসছেন। তাঁর সঙ্গে কথা হলে বোঝা যাবে।

—ঠিক আছে। আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করছি। তাহলে কি কাল থেকে আমি মহিলাদের ইন্টারভিউ নেব না?

—না, তা হবে না। যতদিন না তোমার জন্য বিকল্প ইন্টারভিয়ুয়ারের ব্যবস্থা হচ্ছে ততদিন এটা তোমায় চালিয়ে যেতে হবে। তবে তোমার পরিবর্তে যাঁকে এ কাজে নিতে চাই তিনি বর্তমানে লালগড়েই আছেন। তাঁকে দলভুক্ত করার দায়িত্বটাও তোমাকে দিচ্ছি অলক। তুমি কাল সন্ধ্যার পর তাঁর সঙ্গে দেখা কর। যেমন করে হক, তাঁকে আমার চাই—এই কথা বলতেই আজ তোমাকে ডেকেছি—

—কে তিনি? তাঁর নাম আর পরিচয়?

—ডক্টর অবনী মজুমদার এম. বি., ডি. জি. ও.!

—বলেন কী? সেই যে ভদ্রলোক আপনার আগের বইখানার কঠোর সমালোচনা করেছিলেন? তিনি লালগড়ের বাসিন্দা?

—হ্যাঁ। তবে পাকাপাকি বাসিন্দা নন—তিনি সাময়িক ভাবে আছেন এখানকার গেস্ট-হাউসে। তাঁর সঙ্গে তুমি দেখা কর, আমার অফারটা তাঁকে দাও—ব্যবস্থা কর যেন অবিলম্বে তিনি তোমার কাজের দায়িত্বটা নিতে পারেন; তাহলেই তুমি গ্রন্থ-রচনায় পূর্ণ-সময় দিতে পারবে। মিস মেহতা তোমার ডিকটেশন নেবে।

অলক বলে, আপনি ধরে নিচ্ছেন কেন যে ডঃ মজুমদার আপনার অফার পাওয়া মাত্র এখানে জয়েন করবেন? তাঁর সরকারী চাকরী ছেড়ে?

—তার আদ্যন্ত ইতিহাসটা শুনলেই সেটা বুঝতে পারবে।

সেই আদ্যন্ত ইতিহাসটা বলে গেলেন ত্রিবেদী।

ডঃ অবনী মজুমদার সরকারী চাকরী করেন বটে তবে ক্যাডার পোস্ট নয়, কন্ট্রাক্ট-সার্ভিস। ওঁর বর্তমান চাকরির মেয়াদ শেষ হবে মাস তিনেকের ভিতরে। উনি আছেন কেন্দ্রীয় সরকারের 'ডেমোগ্রাফিক সার্ভে' প্রকল্পে। ত্রিবেদী বিশ্বস্ত সূত্রে জানেন যে, অবনী মজুমদারের এবার আর চাকরির মেয়াদ বৃদ্ধি করা হবে

pathagar.net

না। অর্থাৎ কন্ট্রাক্ট শেষ হলেই তাঁকে বেকার হতে হবে। তিনি কর্তৃপক্ষের স্নজরে নেই আদৌ—তার মূল কারণ মতের পার্থক্য। ডঃ মজুমদার মনে করেন তিনি তাঁর 'বস'-এর চেয়ে বেশি বোঝেন—ফলে যা হবার তাই হয়েছে। কর্তৃপক্ষ শুভদিনের অপেক্ষায় আছেন—সে শুদিনের আর বোধকরি নব্বই দিন বাকি। অর্থাৎ মজুমদার একটা শাঁসালো চাকরির জন্য মুখিয়ে আছেন। ভাল টার্মস পেলে এখনই পদত্যাগ করে যোগ দিতে রাজী।

অনেক প্রশ্ন করে, উনি লালগড়ে কী করছেন?

—সে আর এক ইতিহাস। এখানকার মহিলা সমিতির প্রেসিডেন্টের কাছে যা শুনেছি তা এই: লালগড় কারখানার জি. এম.-পত্নী রত্না দেবী ওদের মহিলা সমিতির সভানেত্রী হবার ইচ্ছা জ্ঞাপন করেছিলেন। হয়তো ভেবেছিলেন পদাধিকার বলেই লালগড়ে ফার্স্ট লেডি ঐ আসন অলঙ্কৃত করবেন; কিন্তু তাঁর আশা পূর্ণ হয়নি। সভ্যরা ব্যালট-ভোটে জি. এম.-সহধর্মিণী রত্না ব্যানার্জিকে উপেক্ষা করে সভানেত্রী করেছে জি. এম.-এর অধঃস্তন কর্মচারীর স্ত্রী মিসেস প্রমীলা দাশগুপ্তাকে। এই অপরাধে জি. এম.-সাহেব ঐ মহিলা সমিতির উপর বর্তমানে খড়্গহস্ত। আর তাই সম্ভবত আমাদের ঠাঁই দেওয়া হল না এখানকার গেস্ট-হাউসে। সে যাই হোক, আমরা যে সমীক্ষা করছি এর বিরোধিতা করায় পাছে লোকে ডক্টর ব্যানার্জিকে প্রাচীনপন্থী কূপমণ্ডূক বলে মনে করে, তাই তিনি আমার বিরুদ্ধ-পন্থী এবং আমার সবচেয়ে বড় শত্রু ঐ অবনী মজুমদারকে আহ্বান জানালেন। মজুমদার যদি তাঁর কারখানার বস্তি অঞ্চলে একটি 'ডেমোগ্রাফিক সার্ভে' চালান তবে জি. এম. তাঁকে সব রকমে মদৎ দেবেন। যার ফলশ্রুতি ডঃ মজুমদার এসে উঠেছেন ঐ গেস্ট-হাউসে, আমার আসার আগেই। কারখানার বস্তী অঞ্চলে তাঁর টীম কাজ করছে—সেই মামুলি বস্তাপচা ঢঙে; 'হ্যাঁ-না'-র মধ্যে প্রশ্নোত্তর সীমিত রেখে।

অনেক বললে, বুঝলাম। কিন্তু ডক্টর মজুমদার এভাবে উঠে পড়ে লেগেছেন কেন আপনাকে অপদস্থ করতে? ওঁর সমালোচনা পড়ে আমার মনে হয়েছিল যেন অ্যাকাডেমিক ইন্টারেস্ট নয়, ব্যক্তিগত বিদ্বেষের বশেই তিনি আপনাকে আঘাত করে চলেছেন।

—ঠিকই ধরেছ তুমি। লোকটাকে আমি চিনি না, দেখিনি। আমাদের কোনদিন সাক্ষাৎ পরিচয় হয়নি। কিন্তু তৃতীয় পক্ষের মাধ্যমে আমরা দু-জনেই দুজনকে চিনি।

boiboi.net

—তৃতীয় পক্ষ' মানে ? কার কথা বলছেন আপনি ?

—ধনকুবের রামসুন্দর কানোরিয়া। আমার কাছে আসার আগে সে ঐ অবনীর দ্বারস্থ হয়েছিল। অবনী প্যাঁচ কষায় কানোরিয়া বীতশ্রদ্ধ হয়ে সরে আসে।

—প্যাঁচ কষায়, অর্থ ?

—হ্যাঁ, অর্থই ! সে না কি এত মোটা টাকা দাবী করেছিল যা পূরণ করতে রাজী হননি কানোরিয়া।

—মাহিনা ছাড়া ?

—তাই তো শুনেছি। কানোরিয়া অতঃপর আমার দ্বারস্থ হয়। আমি রাজি হয়ে যাই ! আফটার অল, আমার উদ্দেশ্য হচ্ছে বৈজ্ঞানিক গবেষণা। আমি সরকারের পরিবার-পরিকল্পনা প্রকল্পকে শুভপথে পরিচালিত করতে চেয়েছিলাম শুধু ! অফ কোর্স, মাহিনা আমি নিচ্ছি—পেটের চিন্তাটাও তো করতে হয় ; কিন্তু তুমি তো জান অলক আমার খরচপাতি কত কম ? আমি চিরকাল কংগ্রেসের সেবা করেছি। যখন প্র্যাক্‌টিস করতাম—রোজগারের প্রায় সবটাই দিয়ে দিতাম কংগ্রেস ফাণ্ডে। বিয়ে-থা করিনি, নেশাভাঙ করি না, খদ্দর পরি, নিরামিষ খাই। টাকা নিয়ে আমি কী করব বল ? তুমি জান, আমি কত করে অ্যালাউয়েন্স ড্র করি ? বা মাহিনা নিই ?

—ঠিক জানি না।

—তোমার চেয়েও কম। মাসিক পাঁচশ' টাকা !

—মাত্র পাঁচশ টাকা ?

—ঐটেই তো কংগ্রেস নির্ধারিত ঊর্ধ্বতম সীমারেখা অলক !

শ্রদ্ধায় নত হয়ে আসে অলকের মাথা। আশ্চর্য মানুষ তো ! এতবড় সংবাদটার প্রচার পর্যন্ত করেননি এতদিন। বললে, কিন্তু কানোরিয়া সাহেব যদি ফরেন-কোলাবরেশনে বৃহত্তর পরিকল্পনার দায়িত্ব আপনার স্কন্ধেই আরোপ করেন তখনও কি—

—যদি কেন অলক ? সেটা তো স্থির হয়েই গেছে। না। আমি ঐ পাঁচশ' টাকার উপর এক নয়া পয়সাও নেব না। ওটা আদর্শগত কারণে।

অন্যদিক থেকে আক্রমণ করল এবার, আর একটা কথা। আপনি বলেছিলেন সরকারী প্রকল্পের ভুলত্রুটি শুধরে দেবার ব্রত নিয়েই এ-কাজে নেমেছেন ; কিন্তু কানোরিয়া-সাহেবের পরবর্তী প্রকল্পে তো জন্ম-শাসনের ব্যাপার নেই—

—না নেই। কিন্তু আমি মনে করি সেটা শুভপ্রচেষ্টা। ডক্টর কিনযে যৌন-

boiRboi.net

বিজ্ঞানে যা করেছেন তা শাশ্বত-কীর্তি। ভারতীয় বাতাবরণে আমি যদি অনুরূপ সমীক্ষার কর্ণধার হতে পারি তবে নিজেকে সৌভাগ্যবান বলে মনে করব। তুমি প্রশ্ন করতে পার, তবে কি আপনি যশের কাঙাল? যৌন-বিজ্ঞানে নামটা চিরস্থায়ী করবার জন্যই এ সাধনা করছেন—তাহলে জবাবে বলব—হ্যাঁ এবং না। বিজ্ঞানে স্থায়ী ছাপ রেখে যাবার ইচ্ছা কার না-ছিল? মেরী কুরির ছিল না? আইনস্টাইনের ছিল না? কিনযের ছিল না? কিন্তু সেটাই শেষ কথা নয়। তাঁরা একনিষ্ঠভাবে যখন বিজ্ঞানের সাধনা করে গেছেন তখন তাঁদের চেতন মনে ও কথা ছিল না নিশ্চয়।

অলক বললে, বুঝলাম। বেশ। ডঃ মজুমদারের সঙ্গে আগামীকালই আমি দেখা করব। কী অফার দেব তাঁকে?

—উনি বর্তমানে মাসিক যতটাকা মাহিনা পাচ্ছেন তার দ্বিগুণ।

—দ্বিগুণ! বলেন কি?

—তাই বলছি! কানোরিয়া এ টাকা দেবে বলেছে। বুঝছ না? ওর কলম-টাকে বন্ধ করতে হবে। একটা মিলিয়ান-ডলার প্রজেক্ট আমরা বানচাল হতে দিতে পারি না, ঐ একটা আধা-পাগলা ডাক্তারের খামখেয়ালির জন্য!

অলক মণিবন্ধের দিকে তাকিয়ে বললে, ঠিক আছে। কাল সকালেই আমি অ্যাপয়েন্টমেন্ট করব এবং রাত্রে তাঁর সঙ্গে গিয়ে দেখা করব।

—লোকটা ভীষণ ধূর্ত, ওর ফাঁদে পা দিয়ে বস না যেন। অনেক কথা সে বলবে তোমায়—মানে আমার বিরুদ্ধে। টাকার থাঁই তার আকাশ-ছোঁয়া; কিন্তু এখন সে নিজেই নিজের জালে জড়িয়েছে। অতি লোভে একবার কানোরিয়াকে সে প্রত্যাখ্যান করে মরেছে। এখন সেই শেষ সুযোগ বোধহয় ছাড়বে না।

অলক বললে, আমারও তাই বিশ্বাস। সরকারী কন্ট্রাক্ট সার্ভিস শেষ হচ্ছে তিন মাসের মধ্যে। এখন এতবড় অফার। নিশ্চয় রাজী হবে লোকটা।

boiRboi.net

ডঃ অবনী মজুমদারের যে মানসচিত্রটা এঁকে রেখেছিল তার সঙ্গে বাস্তবের মানুষটির ফারাক আশমান-জমিন। অলকের কল্পনায় তিনি ছিলেন ডঃ ত্রিবেদীর সমবয়সী, ঐ রকমই, দীর্ঘদেহী—একই রকম একটা উদ্ধত দার্ঢ্য এখানে দেখতে পাবে বলে সে আশা করেছিল। বাস্তবের মানুষটি মোটেই তা নয়। বয়স আন্দাজ পঁয়তাল্লিশ, বেঁটে-খাটো, শান্ত স্বভাবের মানুষ বলে মনে হল প্রথম দর্শনে। চোখে মোটা-ফ্রেমের চশমা, মাথার চুলগুলো অবিন্যস্ত। খদ্দরধারী নন কিন্তু।

গেস্ট-হাউসে ঢুকে বাঁ-হাতে দক্ষিণ-খোলা ঘরখানাতে আজ দিন-দশেক আছেন তিনি। অলক সকালবেলা টেলিফোনে যোগাযোগ করে অ্যাপয়েন্টমেন্ট করে রেখেছিল। নিজের পরিচয় দিয়ে বলেছিল একটি বিশেষ প্রয়োজনে সে ডক্টর মজুমদারের সাক্ষাৎপ্রার্থী। উত্তরে ডঃ মজুমদার বলেছিলেন, আপনি আমার অপরিচিত নন। সুতরাং আলাপ করতে আমিও আগ্রহী। আপনি ডঃ ত্রিবেদীকেও সঙ্গে করে আনতে পারেন। অলক তার জবাবে জানিয়েছিল, ডঃ ত্রিবেদী অন্য কাজে ব্যস্ত আছেন। সে একাই আসবে। রাত সাড়ে-আটটা নাগাদ।

কাঁটায়-কাঁটায় সাড়ে আটটাতেই সে এসেছে। ডঃ মজুমদারের ঘরের সামনে দাঁড়িয়ে সে বললে, ভিতরে আসতে পারি? আমার নাম অলক রায়—

ঘরে দুজন লোক। কে যে ডঃ মজুমদার আন্দাজ করে উঠতে পারছিল না। ওর সংশয় অবশ্য ক্ষণস্থায়ী। বিছানার উপর বসে থাকা ভদ্রলোক উঠে দাঁড়ালেন, আসুন, আসুন মিস্টার রায়, বসুন।

অলক আসন গ্রহণ করা মাত্র ডঃ মজুমদার আনুষ্ঠানিকভাবে অপরিচিত তৃতীয় ব্যক্তির সঙ্গে অলকের আলাপ করিয়ে দেন, ইনি হচ্ছেন শ্রীনীরদ মুস্তাফি, নাম শুনেছেন নিশ্চয়ই—প্রখ্যাত সাহিত্যিক। আর ইনি হচ্ছেন আমার বন্ধু মিস্টার অলক রায়, সম্প্রতি বেড়াতে এসেছেন লালগড়ে।

অলক লক্ষ্য করল তার প্রকৃত পরিচয়টা গোপন করে গেলেন মজুমদার। সে খুশিই হল। লালগড়ে সে অজ্ঞাতবাস করতে পারলেই নিশ্চিন্ত বোধ করবে।

অলক বললে, আপনাদের কী একটা আলোচনা হচ্ছিল। আমি এসে বাধা দিলাম।

মজুমদার বললেন, না, আলোচনা বিশেষ কিছু নয়। মিস্টার মুস্তাফি এখানে এসেছে একটি ভদ্রমহিলার জবানবন্দি নিতে, ইন ফ্যাক্ট, ভদ্রমহিলার স্বামীর একটা জীবনী লিখছেন উনি।

boiRboi.net

—জীবনী ?—উৎসাহিত হয় অলক। বলে, স্বনামধন্য কোন লোক ?

মুস্তাফি বলেন, স্বনামধন্য কিনা জানি না—তবে তাঁর জীবনী লিখিত হওয়া উচিত। দেশের জন্য যাঁরা প্রাণ দেন তাঁদের কথা ভবিষ্যদ্বংশীয়রা যাতে স্মরণ করতে পারে। আমরা পাইলট শহীদ জিতেন্দ্রনাথ বাসুর কথা আলোচনা করছিলাম।

অলক ঠিক চিনতে পারে না। তবে মন দিয়ে শোনে। উৎসাহ দেখায়। মুস্তাফি তাঁর খেই-হারানো গল্পের সূত্র নূতন করে তুলে নিলেন। বলতে থাকেন সেই দুর্ধর্ষ বৈমানিকের কথা। অলক লক্ষ্য করে দেখল, জিতেন্দ্রনাথের কথা উনি যত বলছেন তার চেয়ে বেশী বলছেন তার বিধবার কথা। মহীয়সী মহিলা! রূপের যে বর্ণনা দিলেন তাতে অলকের মনে প্রশ্ন জাগছিল ভদ্রমহিলা ফিল্ম লাইনে গেলেন না কেন ? সেটা বোঝা গেল গুণের প্রসঙ্গে আসার পর, সতী-সাধ্বী ভারতীয় রমণীর একটি জ্বলন্ত উদাহরণ। মুস্তাফি উপসংহারে বললেন, ভদ্রমহিলাকে দেখে মনে পড়ল দেড়শ বছর আগেকার লেখা এক সাহেবের রচনা—সতীদাহের মর্মন্তুদ কাহিনী! স্বামীর সঙ্গে জ্বলন্ত চিতায় সহমরণে বসেছেন—দাউ-দাউ করে আগুন ঢেকে দিল তাঁর সোনার অঙ্গ—মুখের একটি পেশী কুঞ্চিত হল না! লালগড়ে এসে এ মেয়েটিকে দেখে মনে হল, রামমোহন সতীদাহ প্রথা বন্ধ না করলে আবার সেই দৃশ্য আমরা প্রত্যক্ষ করতাম!

অলক ফস করে বলে বসে, ছেলেপুলে নেই ভদ্রমহিলার ?

মুস্তাফি স্পষ্টই আহত হলেন এই অপ্রাসঙ্গিক প্রশ্নে। মজুমদার বিচিত্র হেসে বললেন, না! সম্ভবত লাল-ত্রিকোণের প্রভাব। লাল-ত্রিকোণ বোঝেন তো ?

অলক ভয়ে ভয়ে মজুমদারের দিকে তাকিয়ে দেখে। তিনি জেনে-শুনেই মায়ের কাছে মাসীর গল্প পেড়েছেন মনে হল। মুস্তাফির উৎসাহে কিন্তু ভাঁটা পড়েনি। তিনি তাঁর পাণ্ডুলিপি থেকে অনেকখানি পড়ে শোনালেন—যেখানে ঐ ভদ্রমহিলার লেখনী-আলেখ্য এঁকেছেন। অলকের ভালই লাগছিল শুনতে, কিন্তু বাধা দিলেন ডক্টর মজুমদার। বললেন, কিছু মনে করবেন না মুস্তাফি-সাহেব, আজ ঐ পর্যন্তই থাক। মিস্টার রায়ের সঙ্গে আমার কিছু জরুরি আলোচনা ছিল।

—ও! আয়াম সো সরি—খাতা বন্ধ করে মুস্তাফি উঠে দাঁড়ান। বলেন, আচ্ছা, আচ্ছা আজ তাহলে চলি।

অলক বললে, আজ অব্যাহতি পেলেন বটে, কিন্তু আমি আবার আসব। বাকিটা শুনে যাব।

boiRboi.net

—খুব আনন্দের কথা। যে কোন দিন সন্ধ্যায়। আমি এখনও দিন সাতেক আছি।

মুস্তাফি বিদায় নিলে ডক্টর মজুমদার বলেন, ইচ্ছে করেই আপনার পরিচয়টা ওঁকে দিইনি। আপনারা তো এখানে অজ্ঞাতবাসে আছেন। তাই নয়? কিন্তু সে-কথা পরে। আগে বলুন কী খাবেন? এখানকার সার্ভিস চলে 'স্লো অ্যাণ্ড স্টেডি' আইনে। এখন অর্ডার দিলে ভোর রাত নাগাদ কিছু পেতে পারেন।

অলক হেসে বললে, আমি নৈশ আহার সেরে এসেছি ডঃ মজুমদার।

—তা কি হয়? চা কিংবা কফি অন্তত হোক। বলুন কী অর্ডার দেব?

—যা হোক—আপনার যা ইচ্ছা।

—আমার ইচ্ছা? আমার ইচ্ছা অবশ্য অন্য রকম। এমন শীতের রাত্রে আমি অন্য জাতের পানীয় গ্রহণ করে থাকি। চলবে?

—আপত্তি নেই। চলুক!

—ভেরি গুড! আমি বলতে সাহস পাচ্ছিলাম না। খদ্দরধারী খাঁটি টিটোটালারের চ্যালা তো আপনি!

ডঃ মজুমদার কাবার্ড খুলে বার করে আনলেন হুইস্কির একটি বোতল। বেয়ারা রেখে গেল বরফের কুচি আর সোডার বোতল, দুটি গ্লাস, আর সোডা খোলার চাবি। কাজুবাদামের একটা প্লেট। জমিয়ে বসলেন অবনী। বললেন, সিগ্রেট কিন্তু আমার কাছে নেই। চুরুট চলবে?

—ধন্যবাদ। না, আমার নিজস্ব ব্র্যাণ্ডই চলুক।

গ্লাসে পানীয় ঢালতে ঢালতে মজুমদার বলেন, আপনার বড়কর্তাকে বলেছিলেন, আমি তাঁকেও আসতে আমন্ত্রণ করেছিলাম?

—বলেছিলাম। কিন্তু টেলিফোনেই তো জানিয়েছি উনি আসতে পারবেন না। আজ থেকে ইন্টারভিয়ু শুরু হল। সেইসব কাগজ-পত্র নিয়ে উনি আজ অনেক রাত পর্যন্ত কাজ করবেন।

—তাই বুঝি অপ্রিয় কাজটা করার দায়িত্ব আপনার ঘাড়ে চাপাতে হল?

—অপ্রিয় কাজ? মাপ করবেন, ডঃ মজুমদার, আমি ঠিক বুঝতে পারলাম না—

—না বোঝার কিছু নেই। আমি বিশ্বাস করতে পারছি না আপনি আজ রাত্রে আমার সঙ্গে নিছক খোশ গল্প করতে এসেছেন। অবশ্য আমার ভুলও হতে পারে। সে ক্ষেত্রে আমি অগ্রিম মাপ চাইছি। আসুন—

একটি পানপাত্র বাড়িয়ে ধরেন অলকের দিকে। নিজের পাত্রটি ওর স্বাস্থ্য-পানের

BanglaBook.org

ভঙ্গিতে একবার উঁচু করে ধরে বললেন, অবশ্য এ-কথাও স্বীকার করব, ডঃ ত্রিবেদী যে আমার আমন্ত্রণ গ্রহণ করেননি এতে আমি খুশিই হয়েছি। দেখুন মশাই, আমি খোলা কথা ভালবাসি—যে মানুষটাকে আপনি বরদাস্ত করতে পারবেন না বলে স্থির জানেন, সে আপনার নিমন্ত্রণ পেয়ে এসে হাজির হলে আপনি বিড়ম্বিত হবেন না ?

অলক বললে, আপনি তো ডঃ ত্রিবেদীকে ব্যক্তিগতভাবে জানেন না। তাহলে কেন মনে করছেন তাঁকে বরদাস্ত করতে পারবেন না ?

—তাঁর লেখার মধ্য দিয়েই তাঁকে আমি চিনি।

—আমার ধারণা আলাপ হলে আপনার ধারণাটা পালটাবে। ভদ্রলোক অতি অমায়িক।

—অ-'মাইক' হলে নিশ্চয়ই এতটা বীতশ্রদ্ধ হতাম না আমি ; কিন্তু আমার জানা আছে তিনি রীতিমত 'মাইকাসক্ত'। মাইক সামনে পেলে তিনি আর থামতে চান না! ভদ্রলোকের দৃষ্টিভঙ্গিটাই···যাক ও কথা। আপনাকে ও-সব কথা বলা বৃথা। আপনি নিশ্চয় তাঁর পন্থায় এবং পরিকল্পনায় সন্তুষ্ট ?

—নিশ্চয়। না হলে তাঁর সহকর্মী হয়ে কাজ করব কেন ?

—বটেই তো। সুতরাং দেখা যাচ্ছে আপনি টেবিলের ও-প্রান্তে, আমি এ-প্রান্তে। সুরার খেয়ায় পারাপার হবার আশা নেই। ও-প্রসঙ্গ থাক।

অলক একটা সিগ্রেট ধরাতে ধরাতে বললে, থাকবে কেন ডঃ মজুমদার ? সুরার খেয়া-নৌকায় পারাপার করা যায় কিনা পরখ করতে ক্ষতি কি ? আসলে আপনি যেটাকে 'অপ্রিয়' কাজ বলবেন, আর আমি যেটাকে 'শুভ প্রচেষ্টা' বলে মনে করছি সেটার ফয়শালা তো করতে হবে। দেখাই যাক না—খেয়া-নৌকায় টেবিলের এ-প্রান্ত ও-প্রান্তের সঙ্গে হাত মেলাতে পারে কি না!

—সহজেই।—বলে ডঃ মজুমদার বাড়িয়ে দিলেন তাঁর হাতটা। যোগ করলেন, আপনার বড়কর্তার সঙ্গে আমার মতের অমিল যতই থাক, আপনাকে 'বন্ধু' বলে স্বীকার করলাম।

অলক ওঁর হাতটা ঝাঁকানি দিয়ে বললে, সে-ক্ষেত্রে ও আলোচনাটা এভাবে মাঝ-পথে বন্ধ হতে দিতে পারি না। বলুন, আপনার কী অভিযোগ আছে ?

ডঃ মজুমদার হাতটা টেনে নিলেন। সোজা হয়ে বসলেন। বললেন, আমিও খোলাখুলি কথা ভালবাসি মিস্টার রয়—ঐ ঢাক-ঢাক গুড়-গুড় আমারও বরদাস্ত হয় না। আমার মতে ডঃ ত্রিবেদী যা করছেন তা শুধু পণ্ডশ্রম নয়, ক্ষতিকর। আর সেটা জেনেশুনেই তিনি তা করছেন!

boiRboi.net

অলক হেসে বললে, আপনার দ্বিতীয় অভিযোগটা নতুন হলেও, প্রথম মতামতটা আপনি ইতিপূর্বেই প্রকাশ করেছেন। ডঃ ত্রিবেদীর প্রথম গ্রন্থটা সমালোচনা করার নাম করে সেটাকে 'কিমা'য় পরিণত করেছেন!

—কিমা? মাংসের কিমা?

—করেননি? বইটাকে আপনি ঐভাবে থুড়ে থুড়ে কাটেননি?

এক চুমুক পান করে ভেবেচিন্তে নিয়ে ডঃ মজুমদার স্বীকার করেন: করেছি! এখন বুঝছি সেটা ভুল করেছি আমি।

অলক উৎফুল্ল হয়ে ওঠে ওর সাফল্যে। বলে, ভুল স্বীকার করছেন তাহলে?

—করছি। বইটির সমালোচনা করায় সেটাকে অবাঞ্ছনীয় গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। আমার উচিত ছিল 'সমালোচনার অযোগ্য' বলে বইটি ফেরত পাঠানো এবং ২৯২ ধারার আশ্রয় নেওয়া—

—২৯২ ধারা মানে?

—আই. পি. সি. টু-হাণ্ড্রেড এ্যাণ্ড নাইন্টি টু। ল অব অবসিনিটি। 'বইটি অশ্লীল', এই অভিযোগ এনে মামলা রুজু করা।

অলক পানপাত্রটা নামিয়ে রেখে শুধু বললে, একটু বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে না কি ডঃ মজুমদার? 'ল অব অবসিনিটি' থেকে বৈজ্ঞানিক গ্রন্থ ছাড় পেয়ে থাকে। 'গ্রে'-র অ্যানাটমিতে যৌন অঙ্গের যে চিত্র আছে তা কোন সচিত্র উপন্যাসে ছাপা যায় না। কিন্তু—

—আই নো মিস্টার রয়। কিন্তু আপনার 'বস'-এর ঐ বইটিকে আমি আদৌ বৈজ্ঞানিক গ্রন্থের মর্যাদা দিতে পারি না। ওটা একটা নিছক 'পর্নোগ্রাফিক লিটারেচার'!

—এতবড় অভিযোগ আপনি কিন্তু আপনার সমালোচনাতেও করেননি।

—তখনও আমি জানতাম না এর পিছনে আসল উদ্দেশ্যটা কী। তখনও আমার ধারণা ছিল এর পিছনে আছে শুধু টাকার খেলা—

—এখন?

—এখন শুনছি শুধু টাকা নয়, ডলার!

অলক চুপ করে যায়। মজুমদার নিজেই প্রশ্ন করেন, আপনার অবস্থাটা আমি বুঝতে পারছি অলকবাবু—আপনার পরিস্থিতি এখন দুর্গেশ দুমরাজের মতো। গেলাসের বন্ধুত্ব এবং বসের প্রতি আনুগত্য, দুটি বিপরীত আকর্ষণে আপনি

boiRboi.net

বিপর্যস্ত। সুতরাং ও-কথা থাক। বরং বলুন—আপনি কেন ওটাকে বৈজ্ঞানিক গ্রন্থ বলতে চাইছেন?

—সে-কথা ডঃ ত্রিবেদী নিজেই বলেছেন তাঁর গ্রন্থের ভূমিকায়। সরকার পরিবার-পরিকল্পনার জন্য কোটি কোটি টাকা ব্যয় করছেন; অথচ তাঁরা স্টিয়ারিং ঘোরাচ্ছেন নিজেদের খেয়াল-খুশি মতো! ডঃ ত্রিবেদীর মতে লাল-ত্রিকোণে আছে তিনটি কোণ—

—জানি মশাই জানি। শুনতে শুনতে কান পচে গেছে! কিন্তু কে আপনাদের বলেছে যে, সরকার সাধারণ মানুষদের মতামত গ্রহণ করছেন না? পরিবার-পরিকল্পনা প্রকল্পে প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই শুরু হয়েছে 'ডেমোগ্রাফিক সার্ভে'। সারা ভারতে তার ছয়টি মূল কেন্দ্রীয় অফিস—দিল্লি, বোম্বাই, কলকাতা, ত্রিবেন্দ্রাম, ধারওয়ার এবং পুনা। অসংখ্য কর্মী গ্রাম গ্রামান্তরে ঘুরে তথ্য সংগ্রহ করছেন। এছাড়া আছে আটটি 'ফ্যামিলি প্ল্যানিং কমুনিকেশন রিসার্চ সেন্টার্স'—লক্ষ্ণৌ, বোম্বাই, কলকাতা, মাদুরাই, ত্রিবেন্দ্রাম এবং দিল্লিতে তিনটি দপ্তর। যে অঞ্চলে পরিবার-পরিকল্পনার কাজ শুরু হয়নি সেখানে গিয়ে তাঁরা জানছেন—জন্মনিয়ন্ত্রণ সম্বন্ধে তাদের কী ধারণা, কী তারা চায় বা চায় না। যে অঞ্চলে পরিবার-পরিকল্পনার কাজ চালু হয়েছে সেখানেও গিয়ে খোঁজ-খবর নেওয়া হচ্ছে—তার ফলাফল কী হচ্ছে, কতদূর হচ্ছে। আমি নিজেই ঐ দফ্‌তরের একজন অফিসার; ফলে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে বলতে পারি অত্যন্ত নিষ্ঠাভরে কর্মীরা তথ্য সংগ্রহ করছেন। ভারতবর্ষের বিশালতার পরিপ্রেক্ষিতে এই জরিপের কাজ অবশ্য যৎসামান্য; কিন্তু এঁদের আন্তরিকতায় কোন ঘাটতি নেই। অথচ ডঃ ত্রিবেদী তাঁর গ্রন্থে, তাঁর বক্তৃতায় ক্রমাগত বলে চলেছেন যেন তিনি এ-বিষয়ে প্রথম ভাবছেন, তিনিই এই ধ্যান-ধারণার পথিকৃৎ!

—না, তিনি তা বলছেন না। বলছেন যে, সরকারী তথ্য সন্ধানে আপনারা যৌন-সমস্যাকে যথেষ্ট গুরুত্ব দিচ্ছেন না। অর্থ নৈতিক, সামাজিক, ধর্মীয় সমীক্ষার দিকেই জোর দিচ্ছেন। সাধারণ দম্পতির যৌন-জীবনের সমস্যাটা—

বাধা দিয়ে অবনী বলে ওঠেন, সাধারণ? লালগড়ের মহিলা সমিতি কি ভারতীয় 'সাধারণ' রমণীর একটি প্রতিনিধি দল?

—না। এঁরা উচ্চবিত্ত সম্প্রদায়ের; কিন্তু—

—কিন্তু কী? এর আগে আপনারা কোথায় কোথায় ক্যাম্প করেছেন?

boiRboi.net

বলুন ? না, না, আপনার স্মৃতির উপর অত্যাচার করব না আমি। এই দেখুন আপনাদের ভ্রমণসূচী।

টানা-ড্রয়ার থেকে একটি ফাইল বার করে একটি চিহ্নিত কাগজ উনি মেলে ধরেন, দেখুন! কোথায় কোথায় আপনারা গবেষণা করেছেন—কলকাতা, বোম্বাই, টাটানগর, বাঙ্গালোর, মাদ্রাজ, লক্ষ্ণৌ, কানপুর, পাটনা, ভুবনেশ্বর···কেন ? ভারত-বর্ষে কি গ্রাম নেই ? বস্তি নেই ? লালগড়েও কি মজদুর রমণীর অভাব ?

অলক একটু অস্বোয়াস্তি বোধ করে। নড়ে-চড়ে বসে বলে, কিন্তু এটা তো মানবেন, কিছুটা শিক্ষা যার নেই সেই জাতের কৃষকবধূ অথবা কারখানার কামিন আমাদের প্রশ্নের জবাব দেবে না ? দিতে জানে না, পারে না ? নারীর সহজাত সঙ্কোচ আর লজ্জা এসে সে-ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করত !

—তাই বুঝি ? বেশ তো, তাহলে বলুন, 'লাল ত্রিকোণের প্রথম কোণ—পুরুষ' গ্রন্থ রচনা করবার আগে আপনারা কোন কোন গ্রামে গিয়েছিলেন ? সেখানে তো লজ্জা-সঙ্কোচের বালাই ছিল না ? সব পুরুষমানুষ।

—সে সময় আমি ওঁর টীমে ছিলাম না।

—আমিও ছিলাম না মিস্টার রয় ; কিন্তু বইটাতো দুজনেই পড়েছি। এই তো, খুঁজে বার করে একটা গ্রামের নাম দেখান, একটা ক্যাম্প-সাইট, যেখানে লোকসংখ্যা বিশ হাজারের কম ?

টেবিলের উপর থেকে বইটা পেড়ে নামান মজুমদার-সাহেব। অলক সেখানা গ্রহণ করে না। মরিয়া হয়ে বলে, সো হোয়াট ? যে-লোকগুলোর ইন্টারভিয়ু নেওয়া হয়েছে তারা নিম্নবিত্তের না হলেও ভারতীয় তো ? আপনিই বললেন—ভারতবর্ষ বিশাল, 'সর্বত্রগামী' হতে না পারলেও 'বিচিত্রগামী' হতে ক্ষতি কি ?

—ক্ষতি আছে রায়-সাহেব। প্রচণ্ড ক্ষতির সম্ভাবনা তাতে। ডঃ ত্রিবেদী উপকার তো করছেনই না, করছেন অপকার। শুনুন। লাল ত্রিকোণের প্রচার চালাতে হবে এইসব কারখানা বস্তীতে, ডক-ইয়ার্ডের মজুর-পাড়ায়, খনি-অঞ্চলের কুলি-ধাওড়ায় এবং গ্রামাঞ্চলের একেবারে হৃদপিণ্ডে গিয়ে। কেন জানেন ? শহরের শিক্ষিত লোকেরা বিনা-প্রচারে স্বভাবতই জন্ম-শাসন করে থাকে। গ্রামাঞ্চলের অশিক্ষিতরা করে না। ফলে আপনারা যা করতে চাইছেন তাতে বছর পঞ্চাশ পরে দেখা যাবে বংশানুক্রমে যারা উন্নত মস্তিষ্কের অধিকারী—বুদ্ধিজীবী, শিক্ষিত, পণ্ডিত, জ্ঞানীগুণী, তাদের সন্তান-সন্ততি সংখ্যায় গেছে কমে ; তার স্থান নিয়েছে যারা দেহ-নির্ভর অশিক্ষিত মানুষ। সমগ্র জাতির গড়

boiRboi.net

'আই, কিউ' হ্রাসপ্রাপ্ত হবে। যার সুদূরপ্রসারী ফল এমনও হতে পারে যে, দেশটাকে শাসন করতে আসবে ভিনদেশের উন্নত-ধী-সম্পন্ন কোন জাতি!

অলক সশব্দে হেসে ওঠে। বলে, এটা কিন্তু, ডক্টর মজুমদার, আপনার একটা দিবাস্বপ্ন! এটাকে হজম করতে হলে আমাকে আরও দু-তিন পেগ চড়াতে হয়!

ডঃ মজুমদার হাসলেন না। গম্ভীর হয়ে বললেন, আয়াম সরি, আমি লক্ষ্য করে দেখিনি, আপনার গ্লাসটা খালি হয়ে গেছে।

অলক হুমড়ি খেয়ে পড়ে, আই ডিডন্ট মীন ইট! না, না, আর নেব না।

মজুমদার কর্ণপাত করেন না। জোর করে এক পেগ আন্দাজ ঢেলে দিলেন ওর গ্লাসে। নিজেও নিলেন। প্রশ্ন করলেন, আপনার পুরো পরিচয়টা জানি না। আপনি মেডিক্যাল্‌ম্যান এটুকুই জানি। আপনার সাবজেক্ট কী ছিল? সোশাল-সায়েন্স, সাইকলজি না ইকনমিক্স?

—তিনটের একটাও নয়। এম. এ-তে ইংরিজি নিয়েছিলাম আমি।

—গুড হেভেন্স! ইংরিজি! তা হঠাৎ এ লাইনে এসে গেলেন কেন?

—ভবিতব্য বলতে পারেন। চাকরি-বাকরি সুবিধামত পাইনি। খবরের কাগজে ফ্রি-লান্সার ছিলাম—অবশ্য ছদ্মনামে। ডঃ ত্রিবেদীর বিজ্ঞাপন দেখে দরখাস্ত করেছিলাম, উনি পছন্দ করলেন—

—কী ছদ্মনাম বলুন তো? যদি অবশ্য আপত্তি না থাকে—

—সে যুগ তো পার হয়ে এসেছি। ছদ্মনাম নিয়েছিলাম AIR—আমারই নামে দুটি ইনিশিয়াল—মাঝখানে I অর্থাৎ আমি, উত্তম পুরুষ!

—আ—ছা! আপনিই 'AIR'! আপনার লেখা আমিও পড়েছি। ব্লিৎসে—ও এতক্ষণে বুঝলাম, কেন আপনার চাকরি হয়েছে!

—কেন বলুন তো? আমি সেটা আজও জানি না—

—জানেন না? কেন, ত্রিবেদী সাহেবের হিন্দি লেখার তর্জমা করতে হয় না!

অলক সজ্ঞান মিথ্যাভাষণ করল—মিথ্যাভাষণ নয়, সত্য গোপন। বললে, আজ পর্যন্ত একখানাও তো করিনি।

ডঃ মজুমদার চুপ করে গেলেন। প্রসঙ্গান্তরে যাবার জন্য বললেন, ডেমোগ্রাফিক সার্ভের কাজে ভারতবর্ষে এ পর্যন্ত কি কাজ হয়েছে খবর রাখেন?

—না!

—এই উত্তরই আশা করেছিলাম আমি। জানলে, আপনার ধারণা অন্য রকম হত। অসংখ্য স্ট্যাটিস্টিক্স-এর ভিতর থেকে দুটি মাত্র উদাহরণ আপনার

BanglaBook.org

সামনে রাখি। একটি গ্রামাঞ্চলের একটি শহর এলাকার। তাহলে বুঝবেন লোক চক্ষুর অন্তরালে কী জাতীয় কাজ হচ্ছে। আমাদের দুর্ভাগ্য—এটার প্রচারের ব্যবস্থা আমরা এখনও ঠিকমত করে উঠতে পারিনি; আর তাই ডঃ ত্রিবেদীর মত স্বয়ংসিদ্ধ প্রচারক সর্বত্র কলকে পাচ্ছেন। প্রথমে বলি, গোখেল ইন্সটিট্যুট অফ পলিটিক্স অ্যাণ্ড ইকনমিক্স-এর একটা জরিপের কথা। আমেরিকার 'পপুলেশন কাউন্সিলে'র অর্থানুকূল্যে এই জরীপটি করানো হয়েছিল 'মাঞ্চার' নামে একটি গণ্ডগ্রামে—ছোট শহরই বলতে পারেন, আট হাজার তার লোকসংখ্যা, পুনা থেকে আটত্রিশ মাইল দূরে। এ-ছাড়া ঐ মাঞ্চার-এর আশেপাশে ছয়টি ছোট ছোট গ্রামেও জরীপ করা হয়। তার ফলাফলটা কৌতূহলোদ্দীপক। শুনুন—

মাঞ্চার। ছোট্ট শহর। মাত্র আট হাজার লোকের বাস। পোস্ট-অফিস একটা আছে, আছে পুলিশ-ফাঁড়ি। আর আছে একটা হাসপাতাল। সঙ্গে আউটডোর ডিস্পেন্সারি। ইণ্ডিয়ান মেডিকেল অ্যাসোসিয়েশনের বদান্যতায় ঐ ছোট্ট হাসপাতালটি টিকে আছে। ও-তল্লাটে রোগ-শোক-আধিব্যাধির হাত থেকে গাঁয়ের মানুষকে রক্ষা করার চেষ্টা করে। শহরের মানুষ নয়, গেঁয়ো মানুষ—যারা আছে মাটির কাছাকাছি, সর্বাঙ্গে কাদামাখা উদাম-গা, খালি-পায়ের গ্রাম্য মানুষ। সরকার পরিবার-পরিকল্পনা প্রকল্পটি অনুমোদন করার পর ঐ হাসপাতালের একটি গুদামঘর সাফা করে খোলা হল 'লাল-ত্রিকোণ' দফতর। দফতর তো হল, দেখভাল করে কে? নূতন কর্মী নিয়োগ করার মত আর্থিক সঙ্গতি নেই। হাসপাতালের লেডি-ডাক্তার বললেন, ঠিক আছে, আমিই না হয় দৈনিক দু-এক ঘণ্টা ঐ ঘরটায় গিয়ে বসব। তাই হল। স্থির হল—যারা মাতৃমঙ্গলের জন্য কিংবা সন্তান হতে ঐ হাসপাতালে আসবেন গ্রাম-গ্রামান্তর থেকে, লেডি ডাক্তার তাদের পরিবার পরিকল্পনার কথামৃত শোনাবেন! আসলে তিনি ঐভাবে বুঝে নিতে চেষ্টা করবেন যে, ঐ অঞ্চলে পরিবার পরিকল্পনার কাজটা কীভাবে হতে পারে। মেয়েরা কতটা কান দেয়, ব্যাপারটাকে কী নজরে দেখে। ঐ সঙ্গে দেওয়া হল কিছু জন্মশাসনের সরঞ্জাম—দেখাই যাক না, যদি কেউ পরখ করে দেখতে চায়। বিশেষ ফল হল না। গ্রাম থেকে ভরা হাসপাতালে আসে প্রাণের দায়ে—ঐসব তত্ত্ব-কথা শোনার তাদের না আছে মেজাজ, না সময়। তত্ত্ব-কথা বইকি! পেটে বাচ্চা নিয়ে যে খালাস হতে এসেছে তার কাছে এসব খেজুরে গল্পর কোন মানে হয়? এর পরের কথা? পরবর্তী সন্তান? সে সব কথা পরে হবে মাইজি, আগে এটাকে তো খালাস করুন!

BanglaBook.org

ওরা দিন আনে, দিন খায়। 'আজ' বোঝে, 'কাল' বোঝে, 'পশু'টা'ও বোঝে—বড় জোর 'ফিন হপ্তা'! তার পরের কথা ওরা ভাবে না। সেটা ভগবানের হাত!

বোঝা গেল—এভাবে হবে না। হাসপাতালে ওসব বেকার। কিছু করতে হলে গাঁয়ে গাঁয়ে ঘুরে প্রচার করতে হবে। যখন মরদরা থাকে ক্ষেতে খামারে। কর্তৃপক্ষ বললেন, এজন্য একজন সর্বক্ষণের কর্মী নিতান্তই প্রয়োজন। উপর থেকে অনুমোদন এল। ইতিমধ্যে প্ল্যান স্যাংশন হয়েছে। নাও—নতুন লোক নাও। এদিকে ঐ লেডি ডাক্তারের কিন্তু রোখ চেপে গেছে। তিনি বড় ডাক্তারকে গিয়ে বললেন, স্যার নতুন লেডি ডাক্তারকেই হাসপাতালে বসান আপনারা; আমি বরং গ্রামে গ্রামে ঘুরে প্রচার করে দেখি, এখানে কিছু করা যায় কি না।

কর্তৃপক্ষ রাজী হলেন। এ-কাজে পরিচিত মুখই বেশী কার্যকরী। লেডি ডাক্তার ইতিমধ্যেই ঐ অঞ্চলে সুপরিচিত। তাঁকেই দেওয়া হল এ দায়িত্ব। বেঁটে ছাতা আর ব্যাগ নিয়ে তিনি গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে ঘুরে বেড়াতে শুরু করলেন।

হিসাব মত দেখা গেল ওঁর এলাকায় আঠারো থেকে বেয়াল্লিশ বছর বয়সের মহিলা আছেন ১,২৫৪ জন। অদম্য উৎসাহে মাস-দেড়েকের ভিতর প্রত্যেকের সঙ্গে দেখা করে তিনি ব্যাপারটা বোঝালেন—অধিকাংশ ক্ষেত্রে গাঁওবুড়োর বাড়িতে বিশ-পঁচিশজন গ্রাম্য সীমন্তিনীকে একসঙ্গে বোঝালেন। ওরা মুখে কাপড় চাপা দিয়ে হাসি লুকালো, চোখ বড় বড় করে শুনল, গা-টেপাটেপি করল—বয়স্কদের উপস্থিতিতে লজ্জা পেয়ে অল্পবয়স্করা পালিয়ে গেল। লেডি ডাক্তার তাদের তাড়া করে আবার ধরলেন, আবার শোনালেন। বুঝিয়ে দিলেন—সন্তান কোলে আসে রামজীর দয়ায়, একথা সত্য; তবু রামজী লোকটা বিজ্ঞান মেনে চলেন। ব্যবস্থা নিলে তিনি জোর করে কারও কোলে ছেলে ফেলে দেন না। শেষ-মেশ কুল্লে ৩৮৮ জন বিবাহিত গ্রাম্য রমণী আদৌ উৎসাহিত হল—বেশ, তারা চেষ্টা করে দেখবে 'ডাকটর মাইজি'র কথায়। ১২৫৪ জনের মধ্যে ৩৮৮ জন।

অলক না-বলে পারে না, মাত্র ৩৮৮ জন? এক তৃতীয়াংশেরও কম?

—হ্যাঁ। কিন্তু আপনি যতটা হতাশ হয়েছেন মনে হচ্ছে, সেই লেডি ডাক্তার ততটা মুষড়ে পড়েননি। তার কারণটা কি জানেন? মাপ করবেন আমার রূঢ় ভাষণের জন্য—তিনি ইংরাজীতে এম. এ. পাশ করে এক স্বয়ম্ভূ ডাক্তারের সাগরেদ হয়ে একাজে নামেননি। তিনি সোশাল সায়েন্স সম্বন্ধে পড়াশুনা করেই এ কাজে হাত দিয়েছিলেন। এ জাতীয় জরিপের নানান দিক সম্বন্ধে তাঁর সম্যক ধারণা ছিল। তিনি তাঁর রিপোর্টে লিখলেন—১২৫৪ জনের মধ্যে

banglainternet

১৮৮ জন উৎসাহিত হওয়া খুবই স্বাভাবিক, কারণ বাকি ৮৬৬ জনের ঐ বিষয়ে আগ্রহ না থাকার সঙ্গত কারণ আছে। তিনি খোঁজ নিয়ে দেখেছেন ওর ভিতর ১৪২ জন নিঃসন্তান, ২১জনের সন্তান হয়েছিল—বাঁচেনি, তারাও বস্তুত নিঃসন্তান। বাকি ১০৯১ জনের পক্ষেই এ সম্বন্ধে উৎসাহিত হওয়া স্বাভাবিক ছিল; কিন্তু তার ভিতরেও ৭০৪ জনের এ বিষয়ে গরজ নেই অন্য কারণে। হিসাব মত দেখা গেল ২০৫ জনের একটি মাত্র সন্তান, ১৬৯ জনের একাধিক সন্তান আছে বটে, তবে পুত্র-সন্তান নেই; ৪৬ জন সে সময়ে ছিল গর্ভবতী, ৪১ জনের গত পাঁচ বছরের ভিতর সন্তান হয়নি। ২৯ জনের দু-তিনটি করে সন্তান আছে বটে তবে দীর্ঘ দিনের ব্যবধানে, ১১৮ জনের স্বামী বিদেশে—তাদের ও বিষয়ে মাথা না ঘামালেও চলে! ৯ জনের বয়স বেয়াল্লিশ না হলেও তাদের সন্তান হবার আর সম্ভাবনা নেই। ৬৫ জন মুসলমান, ধর্মীয় কারণে জন্মশাসনে তাদের আপত্তি এবং বাকি ৭২ জনের যুক্তি প্রাঞ্জল—তাদের সন্তান হয়েছে মাত্র এক-দেড় বছর। কোলের বাচ্চা বুকের দুধ খায়। বুকে যতদিন দুধ আছে কোলে ততদিন সন্তান আসে না—রামজীর বিধান! কথাটা বিজ্ঞানসম্মত না হলেও এটাই ওদের বিশ্বাস। একুনে ৭০৫। সোজা হিসাব।

অলক উৎসাহিত হয়ে বলে, আশ্চর্য। তা বাদবাকি ৩৮৮ জন গ্রাম্যবধূ কি শেষ পর্যন্ত পরিবার পরিকল্পনা করেছিলেন?

—আজ্ঞে না। তাঁরা বোধ করি উপরোধে ঢেঁকি গিলেছিলেন। চক্ষুলজ্জার খাতিরে মাইজীকে 'জবান' দিয়েছিলেন। কারণ কার্যক্ষেত্রে দেখা গেল ঐ ৩৮৮ জনের মধ্যে মাত্র ৫ জন নির্দিষ্ট দিনে এসেছেন হাসপাতালে। বাদবাকী সীমন্তিনী বেমালুম না-পাত্তা। কিন্তু ঐ লেডি ডাক্তারের ধমনীতে বোধ করি বইছিল রবার্ট ব্রুস-ধর্মী রক্ত। বেঁটে ছাতা আর ব্যাগ হাতে আবার রওনা হলেন তিনি গাঁয়ের দিকে —গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে। গরুর গাড়ি চেপে, পাল্কিতে, পায়ে হেঁটে, নৌকায়—যেখানে যা প্রয়োজন। শেষ-মেশ ১৭৫ জনকে প্রায় ধরে-বেঁধে তিনি রাজী করালেন।

—ঐ ১৭৫ জনের কে কোন পন্থা অবলম্বন করেছিলেন তার হিসাব আছে?

—আছে। উনি ঐ পৌনে দু-শ' গ্রাম্যবধূকে প্রতিটি পদ্ধতি পৈ-পৈ করে বোঝালেন—তার সুবিধা-অসুবিধা। সব জেনে বুঝে তাঁরা যে পদ্ধতি গ্রহণ করেছিলেন তার হিসাবটা এই রকম—৯২ জন অস্ত্রোপচারে রাজী হলেন, ৬৩ জন ফোম ট্যাবলেট, ১৫ জন ডায়াফ্রাম ও জেলি ব্যবহার করতে ইচ্ছা প্রকাশ করেন এবং বাকি পাঁচজন নিরাপদকালের ছন্দ মেনে চলতে স্বীকৃত হলেন। এ ঘটনা ১৯৬০ সালের। গোখেল ইন্সটিট্যুট কর্তৃক প্রকাশিত ৪৯ নং রিপোর্টে এর বিস্তারিত বিবরণ

boiboi.net

আপনি পড়ে দেখতে পারেন মিঃ রায়—কিন্তু সেই রিপোর্টে ঐ লেডি ডাক্তারের নামটা আপনি পাবেন না।

—কেন ? নামটা পাব না কেন ?

—ঐ বৈজ্ঞানিক সমীক্ষার রিপোর্টে তাই যে নিয়ম। আত্মপ্রচার তো ওঁদের লক্ষ্য নয়। কিন্তু সে কথা নয়, ঐ সমীক্ষা থেকে একটা জিনিস কি স্পষ্ট হয়ে উঠল না ? অধিকাংশ রমণীই সাময়িক সমাধান চায়নি, চিরতরে ঝামেলা মিটিয়ে দিতে চেয়েছিল। মজা কি জানেন ? শেষ পর্যন্ত ঐ ৯২ জনের মধ্যে ৫৪ জন অপারেশন করিয়ে যায়। বাদবাকি যাঁরা অন্যান্য পন্থায় জন্মশাসন করতে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন তাঁরা সময় মত ক্লিনিকে হাজিরা দিলেন না। আমাদের কাহিনীর নায়িকা—সেই অজ্ঞাতনামা রবার্ট ব্রুস—পুনরায় বার হলেন গ্রামের পথে। মহম্মদ যদি পর্বতের কাছে না আসেন তবে পর্বতকেই মহম্মদের কাছে যেতে হয়। বাড়ি বাড়ি গিয়ে পুরুষদের লুকিয়ে সাজ-সরঞ্জাম পৌঁছে দেন কৃষকবধূর কাছে—কেউ লুকিয়ে রাখে চুপড়িতে, কেউ বাঁশের চোঙায়, কেউ বা চালের বাতায়। কিন্তু মাস তিনেকের মধ্যেই রণে ক্ষান্ত দিতে হল তাঁকে।

আলপথ দিয়ে বেঁটে ছাতা মাথায় একটি পরিচিত মূর্তিকে গাঁয়ের দিকে আসতে দেখলেই সেই গ্রাম্যবধূর দল গা-ঢাকা দেয়, যেন উনি পাওনাদার। দু-একটি ক্ষেত্রে ক্ষুব্ধ মরদের দল এসে ওঁকে বেশ দু-চার কথা শুনিয়ে গেল। অনেকে দু-হাত জোড় করে অকপট ক্ষমা প্রার্থনা করল, ক্যা কহুঁ মাইজী—ঘর-ওয়ালা নারাজ হোতা হ্যায়। আপ্ বেফাজুল এৎনি পরিশান করতে হেঁ মাঈ, বহ ঝামেলা হম্‌সব্ ঔর নেহি চাতি।

সশব্দে হেসে ওঠে অলক। বললে, এতদিনে সেই লেডি ডাক্তারের জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত হল নিশ্চয় ?

মজুমদার এবারও হাসলেন না। বললেন, অথচ এইটাই ডঃ ত্রিবেদীর প্রশ্নের জবাব।

হাসি থামিয়ে অলক বললে, কোন প্রশ্নের ?

—চিত্রলেখা হাউসে আপনার বড়কর্তা সেদিন যে প্রশ্নটা তুলেছিলেন—কেন পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার টার্গেট বাইশ লক্ষ অস্ত্রোপচার, আর মাত্র তিন লক্ষ 'লুপ'। কেন নয় তার উল্টোটা ?

—আপনি শুনেছেন সে লেকচার ?

—স্বকর্ণে আর কেমন করে শুনি বলুন ? কানে জড়োয়া দুল না থাকলে

boiRboi.net

তো সে-সভায় কারও কান পাতার অধিকারই ছিল না। তবে রিপোর্টটা পড়েছি। দেখুন মিস্টার রায়, লাল ত্রিকোণের তিনটি কোণ আছে এ-কথা আমিও জানি—কিন্তু আমার বিশ্বাস বিজ্ঞান-ছাড়া বাকী দুটি কোণ আছে এই বিশাল উপদ্বীপের গ্রাম গ্রামান্তরে, কয়লাখনি, ডক আর কারখানার বস্তিতে। লালগড় সমিতির সভ্যদের কোন ভূমিকাই নেই সেখানে। শুধু তাই নয়—একই কথা বারে বারে বলছি, শহরাঞ্চলে এ জাতীয় প্রচার করে উপকারের চেয়ে অপকারই করা হচ্ছে।

—কিন্তু সেটা তো আপনারাই করছেন। পার্ক-স্ট্রীটের মোড়ে নিয়নবাতির বিজ্ঞাপন, ইংরাজি পত্র-পত্রিকায় লাল-ত্রিকোণের প্রচার তো সরকারই করছেন। এগুলো ভুল নয়?

—নিশ্চয় ভুল। কিন্তু সরকারী নীতি-নির্ধারণের অধিকার আমার নেই। আমি তারস্বরে প্রতিবাদ করি। অচলায়তনে আমার প্রতিবাদ প্রতিধ্বনিত হয়ে ফিরে আসে মাত্র। আমি আমার নিয়োগকর্তার কাছে অপ্রিয় হয়ে পড়ি, আর কিছু হয় না!

—কথাটা নতুন বলে বোধহয় কর্মকর্তারা সেটা বুঝতে পারেন না।

—কথাটা মোটেই নতুন নয়। বার্ট্রাণ্ড রাসেলের আত্মজীবনীতে বিশ্ববিশ্রুত পণ্ডিত উইল ডুরান্টের রাসেলকে লেখা একটি চিঠি ছাপা হয়েছে। তাতে ১৯৩১ সালেই ডুরান্ট বলছেন, "The Industrial Revolution has destroyed the home, and the discovery of contraceptives is destroying the family, the old morality, and perhaps (through the sterility of the intelligent) the race." [শিল্প-বিপ্লব ভাঙলো আমাদের ঘর, আর জন্মনিয়ন্ত্রণের সরঞ্জাম আবিষ্কৃত হবার পর ভাঙলো শুধু আমাদের পরিবার নয়, ঐ সঙ্গে সতীত্বের ধারণা এবং বোধ করি (বুদ্ধিমানদের জন্মক্ষমতা-হরণের মাধ্যমে) গোটা জাতটা।]

অলক বললে, আপনার কি মনে হয় না ডঃ মজুমদার—দার্শনিক উইল ডুরান্ট এখানে মাত্রাতিরিক্ত রক্ষণশীলতার পরিচয় দিয়েছেন? চল্লিশ বছর আগেকার উক্তি অবশ্য—তবু জন্মনিয়ন্ত্রণের সাজ-সরঞ্জাম আবিষ্কৃত হওয়ায় আমাদের পরিবার ভাঙল কি? জন্মনিয়ন্ত্রণে সতীত্বহানি হয় এটা কি—

অবনী মজুমদার বাধা দিয়ে বলে ওঠেন, মাপ করবেন, আমার মনে হয় উইল ডুরান্টের বক্তব্যটা আপনি ধরতে পারেননি। কোন বিবাহিতা রমণী তার পরিবারে

boiRboi.net

সন্তান সংখ্যা সীমিত করতে যদি ঐসব ব্যবস্থা নেয় তাহলে উইল ডুরান্ট নিশ্চয়ই আপত্তি করবেন না; তিনি বলতে চাইছেন যে, সেই অজুহাতে আপনারা যদি ঢালাও-ভাবে ঐসব সাজ-সরঞ্জাম-আমদানি করেন, জিনিসগুলো সহজলভ্য করে তোলেন, তাহলে অবিবাহিত নরনারীও সেগুলি সহজে পাবে। তার ফলটা কী হতে পারে? এতদিন একটা দুর্দৈবকে প্রতিরোধ করতে সমাজ একটা বর্ম ব্যবহার করছিল, তার নাম 'সতীত্ব'। তার মহিমাকীর্তনে এতদিন সমাজ ঠেকিয়ে রেখেছিল একটি মারাত্মক দুর্ঘটনাকে, যাকে গীতায় বলা হয়েছে, 'উৎসাদ্যন্তে জাতিধর্মাঃ কুলধর্মাশ্চ শাশ্বতাঃ'। সমাজে সেই দুর্দৈব কোন পথে আসতে পারে? 'স্ত্রীষু দুষ্টাসু বার্ষ্ণেয় জায়তে বর্ণসঙ্করঃ'—অর্থাৎ স্ত্রীলোকেরা যদি ভ্রষ্টাচারী হয় তবে বর্ণসঙ্করের সংখ্যাবৃদ্ধি ঘটে। জন্মনিয়ন্ত্রণের সরঞ্জাম সহজলভ্য হওয়ার পরে দেখা যাচ্ছে স্ত্রীলোকেরা দুষ্ট হলেও বর্ণসঙ্কর জন্মগ্রহণ করছে না—উইল ডুরান্ট তাই বলেছেন, এতে সতীত্বের ধারণাটা পরিবর্তিত হয়ে যেতে বাধ্য।

অলক হেসে বললে, রাগ করবেন না ডঃ মজুমদার, সংস্কারমুক্ত মন নিয়ে কয়েকটা কথা বিবেচনা করুন। প্রথমত গীতা একথা বললেন না যে, জাতিধর্ম ও কুলধর্মকে রক্ষা করতে নরনারী উভয়কেই সংযমী হতে হবে। পুরুষ ভ্রষ্টাচারী হয় হোক, স্ত্রীলোক যেন না হয়! কেন? পুরুষ বহির্মুখী, তার পাপের ফল সংসারকে কলুষিত করবে না, যতক্ষণ ঘরের লক্ষ্মী বিপথে যেতে রাজী না হচ্ছেন। সুতরাং 'সতীত্ব' জিনিসটা কোন ধর্মীয় কন্‌সেপ্ট নয়, তার নিতান্ত একটি কেজো ভূমিকা আছে—যাকে বলি ইউটিলিটেরিয়ান মূল্য। গীতা যে সময় লেখা হয় সে সময় ওর চেয়ে ভাল কোনও সমাধান তাঁরা খুঁজে পাননি। বিজ্ঞান যদি এখন উন্নততর কোন সমাধান দিতে পারে তাতে আপনার আপত্তি কোথায়?

—বলতে পারেন ও-কথা বিংশ শতাব্দীর শেষ পাদে দাঁড়িয়ে আপনি বলতে পারেন—'সতীত্বের ঐ ধ্যান-ধারণাটা এই পিতৃতান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থার উপকার করছিল, তাই এতদিন ওটাকে মেনে চলছিলাম—সে ব্যবস্থা যদি অন্যভাবে হয় তবে আর সতীত্বের ঐ ধারণাটাকে জিইয়ে রাখি কেন?' পারেন একথা বলতে; যদিও আমি আপনার সঙ্গে একমত নই। আমার মত অনেকেই একমত হবেন না। তার কারণ ইউরোপ আর আমেরিকার দিকে দৃষ্টি মেলে আমরা দেখতে পাচ্ছি—তাতে নতুন নতুন সমস্যা দেখা দিচ্ছে। সেখানে কন্যা বয়ঃপ্রাপ্তা হলে অনেক মা কুমারী মেয়েকে নিয়মিত পিল খাওয়ায়; ভাবে সাবধানের মার নেই!

অলক বললে, এটাও আপনার রাগের কথা। কিন্তু সংস্কারমুক্ত মন নিয়ে ভেবে

দেখুন ডঃ মজুমদার—সতীত্বের মহিমাকীর্তনের মাধ্যমে কি সত্যই ঐ দুর্দৈবকে আমরা ঠেকিয়ে রাখতে পারছিলাম? উইল ডুরাণ্ট যে সময় বার্ট্রাণ্ড রাসেলকে ঐ চিঠি লেখেন প্রায় সেই সময়েই এই বাঙলাদেশে রবীন মৈত্র লিখেছিলেন 'উদাসীর মাঠ'। একা উদাসী নয়, এমন কত হাজার হাজার মেয়ের জীবন নষ্ট হয়ে গেছে তা তো আপনি জানেন! আর কিছু না হোক, সেই হতভাগীরা হয়তো আত্মরক্ষা করতে পারত।

ডঃ মজুমদার কি যেন বলতে যাচ্ছিলেন, অলক বাধা দিয়ে বললে, না। ও তর্ক থাক। ও ব্যাপারে আপনার-আমার ধ্যান-ধারণায় প্রভেদটা এত বিরাট, এত ভিন্নমুখী যে তর্কে আমরা কোন সমাধানে আসতে পারব না। আপনি বরং আমার আর একটা কৌতূহল চরিতার্থ করুন। আপনি এখনই বললেন, মাঞ্চার গ্রামে পনেরটি মহিলা ছিলেন মুসলমান, ধর্মীয় কারণে তাঁরা জন্মশাসন করতে রাজী ছিলেন না। স্ট্যাটিসটিক্স বলছে, গত তিন বছরে এই পশ্চিমবঙ্গে ২ লক্ষ ৩০ হাজার ভ্যাসেকটমি ও ৫৪ হাজার টিউবেকটমি অস্ত্রোপচার হয়েছে। আপনি বলুন—এর মধ্যে কতজন ধর্মে মুসলমান?

—আমি জানি না। খোঁজ নিইনি।

—কিন্তু খোঁজ নেওয়া উচিত ছিল না কি? পরিবার-পরিকল্পনা একটা জাতীয় প্রকল্প। ভারতবর্ষ একটা ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র। এমন পরিকল্পনা কি রাষ্ট্রের নেওয়া উচিত যাতে একটি বিশেষ সম্প্রদায়ের জনসংখ্যা হ্রাস পাবে এবং অপর একটি ধর্মসম্প্রদায়ের জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাবে?

ডঃ মজুমদার একটু বিরক্ত হয়ে বলেন, কী আশ্চর্য! যে তিন লক্ষ নরনারী অস্ত্রোপচার করিয়ে গেছেন আমরা তো তাঁদের বাধ্য করিনি। তাঁরা স্বেচ্ছায় তা করেছেন! ধর্মীয় কারণে কেউ যদি আপত্তি—

বাধা দিয়ে অলক বলে, কথাটা আপনার ঠিক হল না ডঃ মজুমদার। ধর্মীয় কারণ যদি জাতীয় স্বার্থের পরিপন্থী হয় তবে সেই ধর্মসম্প্রদায়কে বলে বুঝিয়ে রাজী করাতে হবে। সুযুক্তিতে যদি না হয় তখন আইন প্রণয়ন করতে হবে! ধরুন যদি কোন সম্প্রদায়ের ধর্মপুস্তকে লেখা থাকে 'কাফের হত্যায় পাপ নেই', কিংবা 'যবন-নিধন ধর্মসঙ্গত কাজ',—তাহলে তাকে সেই ধর্মের নির্দেশ কি মানতে দিচ্ছি আমরা?

পুনরায় বিরক্তি প্রকাশ করে মজুমদার বলেন, আপনি বুঝতে পারছেন না! এসব জিনিস কি আইন করে হয়? প্রতিটি স্বাধীন ভারতীয় নাগরিকের ব্যক্তি-স্বাধীনতা আছে—তার সেই ব্যক্তি-স্বাধীনতায় হাত দেওয়া যাবে কেমন করে?

boiRboi.net

—সহজে। আইন করে। জাতীয় স্বার্থে! আমি উকিল, আমি ডাক্তার, আমি এঞ্জিনিয়ার! কারও খাই না, পরি না। মাথার ঘাম পায়ে ফেলে রোজগার করি। কিন্তু যেই আমার আয় একটা নির্দিষ্ট সীমার উপরে উঠছে আপনি তো আমাকে আয়কর দিতে বাধ্য করছেন! কেন? যেহেতু এই রাষ্ট্রে, এই সমাজ-ব্যবস্থায় আমি করে খাচ্ছি। একটা নির্দিষ্ট সীমার উপরে আমার রোজগার উঠলে সমাজের দিকে তাকিয়ে আমাকে আয়কর দিতে হবে। এবার ঐ 'অ্যানালজি'টা পরিবার-পরিকল্পনার দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বিচার করুন। আমি আটটা-দশটা-বারোটা সন্তান পয়দা করে যাচ্ছি, তাদের খাওয়াবার সংস্থান আমার নেই। রাষ্ট্রকে সে দায়িত্ব নিতে হচ্ছে। এক্ষেত্রে কেন রাষ্ট্র আমাকে বাধ্য করবে না অপ্রোপচার করাতে?

—আমি আপনার সঙ্গে একমত। কিন্তু এখানে ধর্মের কথা আসছে কোথা থেকে?

—আসছে। আপনি জানেন, ইতি-পূর্বে হিন্দু কোড বিল পাশ হয়েছে। কোন হিন্দু একাধিক বিবাহ করতে পারে না। মুসলমানেরা ঐ আইনের আওতায় আসেনি। ধর্মের অজুহাতে তারা ঐ জাতীয় আইন হতে দিচ্ছে না—ফলে ইতিপূর্বেই একটা 'ইম্‌ব্যালান্স' সৃষ্টি হয়েছে। পরিবার পরিকল্পনা প্রকল্পেও—

বাধা দিয়ে মজুমদার বলেন, কিন্তু আমি শুনেছি কোরাণ সরিফে—

—আমি তা শুনিনি! অবশ্য 'কোরাণ-সরিফ' খুব খুঁটিয়ে পড়িনি আমি; কিন্তু যতদূর জানি, কোরাণ কোথাও বলেননি যে, এক স্ত্রী বর্তমান থাকতে দ্বিতীয়বার দারপরিগ্রহ না করলে ধর্মে পতিত হবে। আমার ধারণা, কোরাণ এক সঙ্গে চারটি স্ত্রী পর্যন্ত সীমারেখা নির্দেশ করেছেন। ফলে, অত্যন্ত গোঁড়া মুসলমানের পক্ষেও এক স্ত্রীতে সন্তুষ্ট থাকায় বাধা দেখি না। হাজার সেকেণ্ডারীর সিলেবাস যদি বলে 'কম্পালসারি' বিষয়গুলি ছাড়া কোনও 'অপশানাল' বিষয়েও কেউ পরীক্ষা দিতে পারে, তার মানে এ নয় যে সবাইকে সেই বাড়তি বিষয়টা নিতেই হবে। কথা সেটা নয়, কথা হচ্ছে এই যে, ভারতবর্ষ ধর্ম-নিরপেক্ষ রাষ্ট্র হওয়া সত্ত্বেও এমন পরিকল্পনা নিতে পারে না যাতে ক্রমাগত একটি ধর্ম সম্প্রদায়ের ক্ষতি সাধন করা হবে—

মিঃ মজুমদার সকৌতুকে হাত দুটি জোড় করে বলেন, অলকবাবু, আমি মুসলমান এম. পি. নই; একথা আমাকে শুনিয়ে কোন লাভ নেই। আপনি বরং খবরের কাগজে প্রবন্ধ লিখুন—প্রগতিশীল মুসলমান সমাজকর্মীরা হয় তো সাড়া দেবে।

BanglaBook.org

জাতীয় স্বার্থে তারা 'মুসলিম ম্যারেজ অ্যাক্ট' পাশ করাতে চাইবে। বিশেষ, বর্তমান বৎসর হচ্ছে আন্তর্জাতিক মহিলা বৎসর। মুসলমান স্ত্রীরা, যারা সতীনের যন্ত্রণা ভোগ করছে, তারা হয়তো আপনার প্রবন্ধ পড়ে ঝাণ্ডা ঘাড়ে পথে বার হবে—

অলক হাসতে থাকে। বলে, যাক ও কথা। অন্য প্রসঙ্গে আসা যাক। আপনি একটু আগে বলেছিলেন, শহরাঞ্চলের একটি ডেমোগ্রাফিক সমীক্ষার কথা আমাকে শোনাবেন। সেটা মুলতুবি আছে। সেটাও কি মহিলাদের মধ্যে সীমিত সমীক্ষা? ঐ মাঞ্চারের মত?

—হ্যাঁ। যেহেতু আপনি স্ত্রীলোকদের মধ্যে জরীপ করছেন তাই অসংখ্য ডেমোগ্রাফিক সার্ভের ভিতর থেকে বেছে বেছে আমি শুধু প্রমীলারাজ্যের কথাই আপনাকে শোনাচ্ছি। এই জরীপটি করেন লক্ষ্ণৌ রিসার্চ সেন্টারের তরফে ডক্টর মিস হুসেন—১৯৬৭-৬৮ সালে। লক্ষ্ণৌ-এর জনসংখ্যা এ শতাব্দীতে অত্যন্ত দ্রুতহারে বেড়েছে। বিংশ শতাব্দীর শুরুতে ছিল প্রায় আড়াই লক্ষ, ১৯৭১-এর আদম-সুমারি অনুসারে ৮·৩ লক্ষ। এই বর্ধিষ্ণু শহরের একটি চিহ্নিত অঞ্চলে ডক্টর মিস হুসেন এলেন 'ডেমোগ্রাফিক সার্ভে' করতে—বাঙলায় কী বলব? 'মানবিকতার জরীপ'? প্রথম পর্যায়ে ৪৫১৮ জন মহিলাকে বেছে নেওয়া হল—সেই আঠারো থেকে বেয়াল্লিশ বয়সের। তা-থেকে প্রতিনিধিমূলক ১৪২৩ জন সীমন্তিনীকে চয়ন করা হল, ঘনিষ্ঠভাবে তাঁদের চরিত্রগত বৈশিষ্ট্যটুকু খতিয়ে দেখতে। প্রশ্নোত্তর হল—শুধু পরিবার-পরিকল্পনা নয়, জনগণেশজননীর স্বরূপটা ঠিকমত বুঝে নিতে—ওঁদের কত শতাংশ কতদূর শিক্ষিত, কী জাত, কী ধর্মবিশ্বাস, ওঁদের অর্থনৈতিক, সামাজিক, পারিবারিক অবস্থাটাই বা কী। বলতে পারেন লক্ষ্ণৌ শহরের প্রায় চার লক্ষ নারীর স্বরূপ কি ঐ প্রায় দেড়-হাজার মহিলার নাড়ি টিপে বোঝা যায়? আমরা বলব, মোটামুটি একটা ধারণা হয় বইকি। ভাতের হাঁড়িতে চাল সিদ্ধ হয়েছে কি না বুঝবার জন্যও তো আমরা উপর থেকে দু-একটি অন্ন টিপে দেখি। স্বীকার করছি, আপনারা যেভাবে শুধু যৌন-সমস্যার সন্ধান করছেন তা করেননি ডক্টর মিস হুসেন—তিনি চেয়েছিলেন ওঁদের সামগ্রিক স্বরূপটা বুঝে নিতে—যার একটি আবশ্যিক ভগ্নাংশ হচ্ছে দাম্পত্যজীবনের সমস্যা, অর্থাৎ যৌন-সমস্যা। সেই সমীক্ষার কয়েকটি কৌতূহলোদ্দীপক ফলাফল আপনাকে শোনাই—তাহলে হয়তো বুঝতে পারবেন আমার আপত্তিটা কোথায়। প্রথমেই বলি, যাঁদের মধ্যে এই জরীপ করা হল সেটা একটা মিশ্র জনতা—অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং ধর্মীয় বিচারে। এর ভিতর আমির-গরিব দুইই ছিল। যাঁদের

স্বামীর রোজগার মাসে ৭৫ টাকার (১৯৬৭ সালে) কম এমন মহিলার অনুপাত ছিল ৮ শতাংশ; ৭৫ টাকা থেকে ৫০০ টাকা রোজগারের ভাগ ৭৭·৪ শতাংশ এবং ৫০০ টাকা থেকে ১০০০ টাকা বা তার বেশি ছিল ১৪·৬ শতাংশ। অর্থাৎ আমরা যাকে মধ্যবিত্ত শ্রেণী বলি সেই বুদ্ধিজীবী মানুষের সহধর্মিণীর দল জরীপের সিংহভাগ দখল করে বসেছিলেন। এবার সংগৃহীত তথ্যের খতিয়ানটা দেখুন। সেই বিবাহিত মহিলাদের একটি প্রশ্ন করা হয়েছিল: কয়টি সন্তানের জন্মের পর আপনি থামতে চান? ওঁদের জবাবটা তালিকাকারে সাজিয়ে দিই—শতাংশের হিসাবে:

স্বামীর রোজগার (মাসিক টাকা)	জন্মনিয়ন্ত্রণ চাই এতগুলি সন্তান জন্মের পর				ঠিক বলতে পারছি না। কখনও ভেবে দেখিনি	জন্ম-নিয়ন্ত্রণ আদৌ করতে চায় না।
	এক	দুই	তিন	চার		
৭৫৲ টাকার কম	০	১৬	৪০	৩৬	৮	৩৪
১৫০৲—৩০০৲	১	২৭	৪৩	২৭	২	৪
৫০০৲—৭৫০৲	৩	৩১	৪৪	২১	১	০
১৫০০৲-এর ঊর্ধ্বে	১৪	৩১	৪৪	১১	০	০

অলক বললে, চার্টটা ঠিক বোধগম্য হচ্ছে না। শতাংশের হিসাবে মানে?

ডঃ মজুমদার বলেন, ধরা যাক যাঁদের রোজগার মাসে ৭৫৲ টাকার কম এই রকম ১৩৪* জনকে ঐ প্রশ্ন করা হল, তার ভিতর ৩৪* জন জন্মনিয়ন্ত্রণকে আদৌ বাঞ্ছনীয় মনে করেন না; বাকী ১০০ জনের মধ্যে ৮ জন বললেন এ বিষয়ে কখনও চিন্তা-ভাবনা করেননি; ৩৬ জনের মতে চারটি সন্তান না হলে ওসব চেষ্টা করবেন না ইত্যাদি ইত্যাদি। এখন ঐ তালিকাটি খতিয়ে দেখুন এবং বুঝবার চেষ্টা করুন কেন আমি বলতে চাই ডঃ ত্রিবেদী উপকারের বদলে অপকারই করছেন।

—আপনিই বলুন।

* সাধারণ পাঠকের খাতিরে শতাংশের হিসাবটা সরলীকরণ করেছি। শেষ স্তম্ভে '৩৪' সংখ্যাটা শতাংশ ঘোষণা করছে; অর্থাৎ ১৩৪-এর ভিতর ৩৪ নয়, ১০০-তে ৩৪।

BanglaBook.org

—লক্ষ্য করে দেখুন, উচ্চবিত্তের মহিলাদের ভিতরে এমন একজনও নেই যিনি জন্মনিয়ন্ত্রণ আদৌ করতে চান না, কিংবা সে-বিষয়ে তাঁদের স্পষ্ট মতামত নেই। অপরপক্ষে শতকরা ১৪ জন একটিমাত্র সন্তান জন্মের পরেই 'ব্যস' করতে চান। তুলনায় দেখুন নিম্নবিত্তের মহিলারা অধিক সন্তান চাইছেন—'এক'-এ কেউ থামতে চান না; চার-চারটি সন্তান চান এক-তৃতীয়াংশের বেশী। অদ্ভুত নয়?

অলক বললে, আচ্ছা আমরা যেভাবে প্রশ্ন করছি—কে কোন পদ্ধতি ইতিপূর্বে ব্যবহার করে দেখেছেন, কী তাঁদের সুবিধা-অসুবিধা হয়েছে তা মিস হুসেন জানতে চাননি?

—জবাবে বলব, 'হ্যাঁ' এবং না। অর্থাৎ ডঃ হুসেন জানতে চেয়েছেন কে কোনটা ইতিপূর্বে ব্যবহার করেছেন, প্রশ্ন করার সময় যে কোন পদ্ধতিতে জন্মশাসন করছেন; কিন্তু কোন পদ্ধতিতে কাজাতের সুবিধা-অসুবিধা ভোগ করেছেন তা জানতে চাননি—

—কেন? কেন জানতে চাননি?

—কারণটা শুনলে আপনি হাসবেন—যেহেতু তার জবাব 'হ্যাঁ'-না'র মধ্যে সীমিত করা যায় না। সেটা তালিকাকারে প্রকাশ করা যায় না। যাই হোক সেই তথ্যটাও তালিকাকারে সাজিয়ে দিই—সেই স্বামীর রোজগার অনুসারে:

স্বামীর রোজগার (মাসিক টাকা)	শতকরা কতজন ব্যবহার করে দেখেছেন	কোন পদ্ধতিতে (প্রতি একশ ব্যবহারকারীর)					
		নিরাপদ কাল	ডায়াফ্রাম ইত্যাদি	কনডোম	লুপ	পিল	অন্যান্য
৭৫্ টাকার নিচে	৪	০	৫০	২৫	২৫	০	০
১৫০্—৩০০্	২৫	৫	৫	৪৮	২১	৯	৯
৫০০্—৭৫০্	৫৩	১১	৫	৫০	১৯	৫	১০
১০০০্	৬২	৮	২১	৫৪	০	৪	৩

—এবারেও লক্ষ্য করে দেখুন মিস্টার রায়, নিম্নবিত্তের মধ্যে জন্মনিয়ন্ত্রণের প্রচেষ্টা কত অল্প। ৭৫ টাকার নিচে যাদের রোজগার তাদের মধ্যে মাত্র ৪ শতাংশ

boiRboi.net

এ প্রচেষ্টায় ইতিপূর্বে অংশ নিয়েছে, অথচ ১০০০ টাকার উপর যাদের আয় তাদের শতকরা ৬২ জন সন্তানকে ঠেকিয়ে রেখেছে। আরও দেখুন, লুপ-এর ব্যবহারটা গরিবদের মধ্যে—শহরে গরিবদের মধ্যে বেশি, আমিরেরা তুলনায় মৌখিক 'পিল'-এর পক্ষপাতী।

—এ-থেকে কী সিদ্ধান্তে আসতে চাইছেন?

—অন্তত একটা সিদ্ধান্ত তো সূর্যোদয়ের মত স্পষ্ট হয়ে উঠল—ডক্টর ত্রিবেদী যে মহল্লায় তাঁর সমীক্ষা চালিয়ে যাচ্ছেন তাতে জাতীয় সমস্যা আদৌ প্রতিফলিত হচ্ছে না—ডঃ ত্রিবেদী উপকারের বদলে অপকার করছেন। ঐ রিপোর্টের শেষ পংক্তিটাই হবে আপনাদের একবছরের গবেষণার ফলাফল—যাঁর ফলশ্রুতি ডঃ ত্রিবেদী প্রমাণ করবেন 'লুপ' কেউ চায় না, 'ওর‍্যাল পিল'-এর প্রডাকশান বাড়ানোই হওয়া উচিত আমাদের লক্ষ্য। তাতে লালগড়ে মহিলা সমিতির মত যে কয়টি এলাকায় আপনারা সমীক্ষা করেছেন তাঁরা খুশি হবেন নিশ্চয়; কিন্তু জাতির স্বার্থ তাতে ব্যাহতই হবে। নয় কি?

অলক চিন্তায় পড়ল। একটু ভেবে নিয়ে বললে, ডঃ মজুমদার, আপনার সঙ্গে কথা বলে ভাল লাগছে। সমস্যাটার এ দিকগুলো আমি আদৌ জানতাম না। হয়তো আপনি যা বলছেন তা ঠিক। আমি জানি না, হয়তো ডঃ ত্রিবেদী এসব প্রশ্নের জবাব দিতে পারতেন। আমার প্রস্তাব, আপনিও আমাদের সঙ্গে যোগ দিন না? আপনার কনট্রাক্ট সার্ভিসও তো শেষ হয়ে এল। তাহলে আপনি যেভাবে সমীক্ষাটাকে নিয়ন্ত্রিত করতে চাইছেন, সেইভাবেই করবার চেষ্টা করুন। ডঃ ত্রিবেদীর উপর চাপ সৃষ্টি করুন।

ডঃ মজুমদার তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে ওকে দেখতে থাকেন। মাতালের ঘোলাটে চোখ নয়, ঈগলের দৃষ্টি। তারপর ধীরে ধীরে প্রতিটি শব্দ স্পষ্ট উচ্চারণ করে বললেন, এই কথাটা বলতেই কি আপনি আজ রাতে এসেছেন মিস্টার রায়?

অলক তাড়াতাড়ি সামলে নেয়, না, তা ঠিক নয়। আমার মনে হল, আপনি এবং ডঃ ত্রিবেদী দুজনেই দিকপাল পণ্ডিত, দুজনেই একই বিষয়ে ভাবছেন, গবেষণা করছেন। দুজনের গন্তব্যস্থল এক, পথ আর মত হয়তো ভিন্ন। আপনারা দুজনে হাতে হাত মিলিয়ে কাজ করলে নিশ্চয়ই ফল ভাল হবে।

—আমি তা মনে করি না।

—কেন?

—কারণ ডঃ ত্রিবেদী বিজ্ঞানী নন। বিজ্ঞানের সাধনা তাঁর লক্ষ্য নয়—না

boiRboi.net

মেডিক্যাল সায়েন্স, না সোশাল সায়েন্স! তিনি চান পাবলিসিটি, গ্ল্যামার—সাদা বাঙলায় নাম, যশ, প্রতিষ্ঠা, অর্থ!—মাইণ্ড য়ু, অর্থ অর্থে টাকা নয়, ডলার!

অলকের আর সহ্য হয় না। দৃঢ়স্বরে বলে, বার বার আপনি ডলারের উল্লেখ করছেন। কেন? বিদেশী মুদ্রার আনুকূল্যে কি এদেশে কোন ভাল কাজ হয়নি? আপনাদের 'ডেমোগ্রাফিক সার্ভে'র কাজ কি বিদেশী অর্থানুকূল্যে হচ্ছেনা কোথাও?

—হচ্ছে। তবে তার উদ্দেশ্যটা মহৎ। প্রতিক্ষেত্রেই—

—আর ডঃ ত্রিবেদীর মূল উদ্দেশ্য?

—বিজ্ঞানের নামাবলী গায়ে চড়িয়ে একটা পর্নোগ্রাফিক রিপোর্ট প্রকাশ।

অলক বললে, আই থিংক য়ু আর হিটিং বিলো দ্য বেল্ট।

মজুমদার বললেন, আই ডু! দ্যাটস্ দ্য অ্যানাটমিকাল পার্ট অব দ্য নেশান ডঃ ত্রিবেদী ওয়ান্টস্ টু এক্সপোস্! তাই তো আমার দুঃখ মিস্টার রায়। ডঃ ত্রিবেদী যদি ভুল করতেন আমি গঠনমূলক সমালোচনা করে তাঁকে শুধরাবার চেষ্টা করতাম। কিন্তু ভুল তো তিনি করছেন না—তিনি সজ্ঞানে বিজ্ঞানকে অজ্ঞান করছেন! বিজ্ঞানীর ছদ্মবেশে তিনি ঝাঁঝালো 'অবসীন' বই ছাপতে চাইছেন। আপনিই বলুন না—অন্য কোন উদ্দেশ্য থাকতে পারে তাঁর পৃষ্ঠপোষকের?

—কে পৃষ্ঠপোষক?

—তা আপনি জানেন, আমিও জানি। বলুন, মিস্টার রায়, রামসুন্দর কানোরিয়া তাঁর সারা জীবনে বিজ্ঞানের উন্নতির জন্য কত টাকা ব্যয় করেছেন? কী তাঁর উদ্দেশ্য হতে পারে?

—আপনি কি কোন শর্তেই আমাদের সঙ্গে একযোগে কাজ করতে রাজী নন?

ডঃ মজুমদার বলেন, শর্ত? কই কোন শর্তের কথা তো শুনিনি এ পর্যন্ত?

—ধরুন আমি যদি বলি, আপনি বর্তমানে যা পাচ্ছেন তার দ্বিগুণ মাইনে দিয়ে আপনাকে মিস্টার কানোরিয়া নিয়োগ করতে চান?

—এই প্রস্তাবটা নিয়েই কি আপনি আজ এসেছেন মিস্টার রায়?

—ধরুন তাই।

—'ধরুন তাই' নয়, খোলাখুলি বলুন—খোলাখুলি জবাব দিই। এই অফারটাই কি সেই আজীব বস্তু যা আমার কাছে মনে হয়েছিল 'অপ্রিয় কাজ' এবং আপনার কাছে 'শুভপ্রচেষ্টা'?

অলক তার হাতের তাস বিছিয়ে দিল টেবিলে। শো-ডাউন, হ্যাঁ, তাই।

boiRboi.net

—আমার চাকরিতে এক্সটেনশন আর হবে না এ খবর পেয়ে ডঃ ত্রিবেদী আমাকে কিনে নিতে চাইছেন? ডবল মাইনে দিয়ে?

একটু ইতস্তত করে অলক বললে, রূঢ় ভাষায় ব্যাপারটা তাই দাঁড়াচ্ছে।

—কিন্তু আপনি—মিস্টার অলক রায়, ইংরাজী সাহিত্যের এম. এ.—আপনি কেন এই 'ঘুষ' লেন-দেনের মধ্যে নিজেকে জড়াতে রাজি হলেন? আপনি না-বিজ্ঞান-ভিক্ষু, না-চিকিৎসক, না সমাজ-সংস্কারক! আপনি এর ভিতর কেন মাথা গলালেন?

—আমি এটাকে ও দৃষ্টি থেকে দেখছি না ডঃ মজুমদার। 'ঘুষ'-এর প্রশ্ন উঠছে কোথায়? আপনি চাকরি করবেন, মাহিনা নেবেন—এখনও চাকরি করছেন, মাহিনা নিচ্ছেন। এটাকে 'ঘুষ' বলে না—

—তা হবে। কিন্তু আপনার স্বার্থটা কী তা তো বললেন না?

—আমি এ-প্রস্তাব শেষ করছি এই বিশ্বাসে যে, হয় আপনি ডঃ ত্রিবেদীর প্রস্তাবে রাজী হয়ে আমার সহকর্মী হবেন, অথবা সে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলেও, আমার বন্ধুত্ব স্বীকার করে নেবেন।

ডঃ মজুমদার পানপাত্রের তলানিটুকু কণ্ঠনালীতে ঢেলে দিয়ে প্রশ্ন করেন, আর একটু দিই রায়-সাহেব?

—না!—হাত নিয়ে গ্লাসটা চাপা দিয়ে দাঁড়ায় অলক। বলে, ধন্যবাদ, আর ড্রিংক্স নয়, এবার জবাবটা চাইছি। রাত অনেক হল।

ডঃ মজুমদার গ্লাসের উপর চাপা দেওয়া অলকের হাতটা চেপে ধরেন। বলেন, সন্ধ্যা থেকে অনেক অপ্রিয় কথা বলেছি, শেষ কথাটা অন্তত মোলায়েম করে বলি, আমি আপনার বন্ধুত্বটাই স্বীকার করে নিলাম!

অলক উঠে দাঁড়িয়ে ছিল আগেই। হাতটা ছাড়িয়ে নিয়ে বললে, আর একটা কৌতূহল চরিতার্থ করে যাই। ডঃ ত্রিবেদীকে ধরবার আগে মিস্টার কানোরিয়া কি আপনার দ্বারস্থ হয়েছিলেন?

—হয়েছিলেন।

—আপনি রাজী হননি কেন?

—যে কারণে আজ রাজী হচ্ছি না।

অলক হাসল! বললে, আজ তবে চলি! আশা করি আবার দেখা হবে।

ডঃ মজুমদার বললেন, এবার আমি তাহলে একটা প্রস্তাব দিই রায়-সাহেব?

—আপনি? আমাকে? বলুন?

—তিন মাস পরে আমি বেকার হব। তখন আমি নিজেই একটি 'সার্ভে'

boiRboi.net

করতে চাই। নিজের অর্থে। এই লালগড়ের বস্তি অঞ্চলে। যে কাজটা এখন হচ্ছে, যা তিন মাসে শেষ হবে না। আপনি কি আমার সঙ্গে যোগ দিতে চান? সেক্ষেত্রে আপনি বর্তমানে যা পান তার অর্ধেক মাইনা আপনাকে দেব?

অলক অবাক হয়ে গেল ভদ্রলোকের দুঃসাহসিকতায়। এমন অফার কেউ কাউকে দেয় নাকি? তিন পেগেই কি উনি বেসামাল হয়ে পড়েছেন? তবু জবাব একটা দিতে হয়। তাই হেসে বললে, আপনার অধীনে কাজে যোগ দিলে আর বন্ধু থাকব কেমন করে? তাই আমারও ঐ একই জবাব, আপনার বন্ধুত্বটাই স্বীকার করে নিলাম।

—থ্যাঙ্ক!

কলঘর থেকে টেলিফোনের আওয়াজটা কানে গেল শীলার। ক্রিরিং ক্রিং ক্রিরিং ক্রিং একটানা বেজে চলেছে। বাড়িতে দ্বিতীয় প্রাণী নেই। সদর দরজাটা বন্ধ। বেলা প্রায় এগারোটা। মুন্না চলে গেছে স্কুলে, তার বাপ্পি অফিসে, ঠিকে ঝিও কাজ সেরে চলে গেছে। জানলাগুলো পর্দা টানা আছে—তবু গায়ে কিছু না জড়িয়ে দরজা খুলতে বাধছে। গায়ে অবশ্য জল ঢালেনি তখনও—তবু বক্তিচেল্লির ভেনাসের মত অবস্থা তার। বড় টার্কিশ্ তোয়ালেটা জড়িয়ে ও বেরিয়ে এল ড্রইং-কাম-ডাইনিং রুমে। টেলিফোনটা তুলে নিয়ে বললে, হ্যালো!

—কী করছিলে?

—কী সর্বনাশ! তুমি নিজে থেকে ফোন করছ? ধর যদি কাপুর সাহেব ধরতেন?

—তিনি তো অফিসে বেরিয়ে গেছেন। দশটা পঞ্চাশ হয়ে গেছে—

—তিনি তো আজ ক্যাস্থয়াল-লীভেও থাকতে পারতেন!

—তাতেই বা কী? তেমন অবস্থার সম্মুখীন কি হইনি? দিন দুয়েক আগে

BanglaBook.net

তোমাকে ফোন করেছিলাম। রাসভ-নীন্দিত-কণ্ঠে তোমার কর্তা প্রশ্ন করলেন—হ্যালো!

শীলা চমকে ওঠে! কী কাণ্ড! সভয়ে প্রশ্ন করে, কী বললে? নাম বলনি তো কারও?

—পাগল! কণ্ঠস্বর শুনেই বুঝেছি কাপুর সাহেব। তৎক্ষণাৎ প্রশ্ন করলাম, শ্রীবাস্তব সা' হ্যায়? উনি বললেন, কোই শ্রীবাস্তব ইহাঁ নাহি রহ্‌তে। বললাম, তব রং নাম্বার হো গ্যায়া সায়েদ! কানেকশন কেটে দিলাম! ব্যস্!

—পাক্কা ক্রিমিনাল তুমি! এতও পার!

—পারব না? দু-দুখানা ক্রাইম-পিক্‌চারের স্ক্রিপ্‌ট্ লিখেছি! ওসব কায়দা আমার মুখস্ত—'শ্রীবাস্তব সাব্ হ্যাঁয়'? ওয়াইপ 'নহি রহ্‌তে'! কাট—'রঙ-নাম্বার'! মিক্স ইন্ট্—

—ফোন করছিলে কেন?

—এমনিই; কী করছ জানতে।

—স্নানে যাচ্ছিলাম!···এই জান···এখন তোমাকে ফোন করেছি একটিমাত্র টাওয়েল জড়িয়ে! বাথরুম থেকে বেরিয়ে এসে! বাড়িতে আর কেউ নেই!

—আসবে?

—আজ নয়। আজ মুন্নার দুটোয় ছুটি!

—তবে আমিই আসি? আধঘন্টার মধ্যে পৌঁছাবো। তোমার স্নান সারা হতে হতেই। দুটো বাজার অনেক আগেই ফিরে আসব—

শীলার মুখটা উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। সামনের আয়নাটার দিকে নজর পড়ে। একটি-মাত্র তোয়ালে জড়িয়ে মেয়েটি লজ্জা নিবারণ করছে। অভ্যাসবশে তাকে একটা ভেংচি কাটে। তারপর ফোনে বলে, বড় জ্বালাও বাপু তুমি! এস···

—থ্যাঙ্কু!···এই! স্নানের পরে কোন শাড়িখানা পরবে?

শীলা জবাব দিতে দেরী করে। তারপর বলে, পরতেই হবে এমন কী কথা?

লাইনটা কেটে দেয়।

বাথরুমে ফিরে আসে। থাক, শ্যাম্পু আজ আর করবে না। তাড়াতাড়ি স্নানটা সেরে ফেলা দরকার। গুণ গুণ করে গান ধরে শীলা। অন্যমনস্ক হয়ে যায়। ভাবে, কোথায় এর পরিণতি—এই লুকোচুরি খেলার শেষ কোথায়? আজ প্রায় তিন মাস ধরে যে কাণ্ডটা সে করছে—শীলা কাপুর, যশোবন্ত কাপুরের স্ত্রী এবং মুন্নার মা—এটা কি সে নিজেই কল্পনা করতে পারত ছ'মাস আগে? কেমন করে এমনটা

boiRboi.net

হয়ে গেল? ছ'মাস আগে সে মনমোহন দস্তর বলে কোন মানুষকে চিনতই না! আর আজ এমন অবস্থা হয়েছে পুরো দু-দিন তাকে কাছে না পেলে হাঁপিয়ে ওঠে! একেই বলে প্রেম? মহব্বৎ? কই নতুন বিয়ের পর যশোবন্তকে নিয়ে তো এমনটা হয়নি?···আচ্ছা ডঃ ত্রিবেদী কি মনমোহনের কথাও জানতে চাইবেন? নাকি শুধু ওর স্বামীসঙ্গের কথার মধ্যেই সীমিত থাকবে প্রশ্নোত্তর? এটা কি সম্ভব? একটি বিবাহিতা ভদ্রমহিলাকে প্রশ্ন করা, স্বামী ছাড়া কারও বিছানায় শুয়েছেন? প্রশ্নটাই যে অবৈধ। কিন্তু যদি করে? যদি ওরা জানতে চায়? যদি শীলাকে বলে তুলনামূলক বিচার করতে? পারবে···? দূর, এসব কী ভাবছে সে?

না। ছ'-মাস আগে শীলা কাপুর এমনটা ছিল না। এমনটা—হ্যাঁ, এমনটা অসতী ছিল না। যশোবন্তের বন্ধুরা এসেছে, হৈ-হুল্লোড় করেছে—পিক্‌নিকে গিয়ে উদ্দাম হয়েছে, কিন্তু সর্বদা ছোঁয়া বাঁচিয়ে। কাল হল তার গত বছর দশেরার সময়। মহিলা-সমিতির থিয়েটার করতে গিয়ে। এমন থিয়েটার ওদের প্রতি বছরই হয়। শীলা অনেকবারই অভিনয় করেছে; কিন্তু এমন কাণ্ড কখনও হয়নি। তা এমনিই তো হয়—ট্র্যাপিজের খেলা দেখায় যে মেয়ে সে তো জীবনে ঐ এক-আধবারই পা ফসকায়! এবার প্রমীলাদি বললেন, তাঁর এক বন্ধু বোম্বাই থেকে এসেছেন; ওঁর স্বামীর বন্ধু। কোন তা-বড় তা-বড় হিন্দি ফিল্মের ডাইরেক্টরের অ্যাসিস্টেন্ট। তিনি ওদের ড্রামায় ডাইরেকশান দেবেন। সেই সূত্রেই আলাপ। মনমোহন অনেকেরই মন মোহিত করল মাসখানেকের ভিতর। রমলা, সরমা, বিজলী এবং শীলা। মায় মিসেস স্মিথের ঐ পুঁচকে মেয়েটা—ঐ কেটি পর্যন্ত শীলার প্রতিদ্বন্দ্বিনী হবার স্পর্ধা দেখিয়েছিল। সকলেই চায় মোহনদা তাদের একটু স্পেশাল কোচ দিয়ে নিন—আলাদা করে! স্পেশাল কোচিং! নেকি! শীলা যেন বোঝে না কিছু। কিন্তু ওর কাছে পার পাওয়া বড় সহজ নয়। রমলা-সরমা বিজলী আর পুঁচকে কেটির বেড়া ডিঙিয়ে শীলাই পৌঁছালো শেষ লক্ষ্যস্থলে। মনমোহনকে মোহিত করল।

প্রত্যক্ষ অভিনয়ের পালা চুকলো—কিন্তু পরোক্ষ অভিনয়ের পালা সাঙ্গ হল না। মনমোহন ফিরে গেল বোম্বাইতে; কিন্তু দু-মাসের মধ্যেই তাকে ফিরে আসতে হল লালগড়ে। শীলার টানে। এবার এসে উঠল হোটেলে। প্রমীলা দেবীর গেস্ট হল না আর। ওখানে নানান অসুবিধা। সবই নজরে নজরে। 'আপ্যায়ন'-এর অবারিত দ্বার। কে কখন আসে-যায় কেউ খেয়াল রাখে না। শোনা গেল মনমোহন এবার নিজেই একটা ছবি ডাইরেক্ট করছে। তারই স্ক্রিপ্ট লিখে ফেলতে

boiRboi.net

হবে দু-মাসের ভিতর। বোম্বাইতে তার হাজার ঝামেলা। ক্রমাগত টেলিফোন আর ভিজিটার্স! প্রসিউসারেরা ঝুলোঝুলি করে, লেখকেরা দিবারাত্র দরবার করে ফিল্ম-রাইট বেচবার তাগাদায়—আর সুন্দরী তারকাদের তো কথাই নেই! দিবারাত্র শুধু মোহনদা, আর মোহনদা! বাধ্য হয়ে বেচারী পালিয়ে এসেছে লালগড়ে। জায়গাটা তার ভাল লেগেছিল আগের বারই। স্থির করেছিল, নির্জনে বসে এখানেই চিত্রনাট্যটা শেষ করে যাবে।

বাইরের লোকে ঐটুকুই জানে। আসল কথা আরও গভীর। দশেরার সময় শীলার অভিনয় দক্ষতায় একেবারে মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিল মনমোহন। অকুণ্ঠভাবে স্বীকার করেছিল সে—তুমি ফিল্ম-লাইনে গেলে কামাল করে দিতে শীলা! গেলে না কেন?

শীলা সত্য কথাই স্বীকার করেছিল, ভীষণ ইচ্ছে ছিল আমার, জানলে; সুযোগ পাইনি!

—সুযোগ পেলে সদ্ব্যবহার করতে রাজী আছ?

—এখন? এই বয়সে?···দূর! তা কি হয়? আমি এখন মুন্নার মা!

—অমন অনেক মুন্নার দিদিমা এখনও লাখ টাকার কণ্ট্রাক্ট সই করে থাকে, তা জান? দেখ যদি রাজী থাক তো দাদাভাইজীকে গিয়ে বলি—

দাদাভাইজী অর্থে মনমোহনের 'বস', যে স্বনামধন্য পরিচালকের সে অ্যাসিস্টেন্ট।

শীলা কী জবাব দেবে ভেবে পায়নি।

তখন পায়নি। পরে দিয়েছে। দু-মাসের মধ্যেই যখন মনমোহন ফিরে এল লালগড়ে। নূতন করে যখন সে পেশ করল প্রস্তাবটা। না, এখন আর 'বস'কে ধরাধরি করতে হবে না। মনমোহন নিজেই ছবি ডাইরেক্ট করছে এবার। নিজেই চিত্রনাট্য করছে। বস্তুত সে জনান্তিকে স্বীকার করে বসল শীলার কাছে—তার লালগড়ে ফিরে আসার কারণ নির্জনতা নয়; নির্জন স্থান বোম্বাইয়ের কাছে-পিঠে অনেক আছে। ও এবার এসেছে শীলার কাছে শেষ জবাবটা জানতে। শীলা কি তার ছবিতে হিরোয়িন হতে রাজী?

হিরোয়িন! এক লাফে? এই বয়সে?

কেন নয়? ওর ছবিতে নায়িকা কিছু কচি খুকি নয়। সে বিবাহিতা এবং একটি সন্তানের জননী—শীলাও বাস্তবে যা আর কি। এ কোন 'কাফ-ল্যাভে'র গল্প নয়—একটি পরিণত নারীর জীবনের দ্বন্দ্ব নিয়ে গাঁথা গল্প।

শীলা এবার প্রত্যাখ্যান করবার মত মনের জোর খুঁজে পায়নি। কিন্তু

boiboi.net

যশোবন্তকে বলা চলবে না। কিছুতেই নয়। জানতে পারলে সে শীলাকে দু-টুকরো করে কেটে ফেলবে। হয় 'হুক' নয় 'পুল'! শীলা স্থির করেছে, লুকিয়ে মনমোহনের সঙ্গে পালাবে! কোথায় যাচ্ছে প্রথমটা জানাবে না। তার আগে মুন্নাকে পাঠিয়ে দেবে তার পিসির কাছে। ব্যস! একবার ঘটনাটা ঘটে গেলে আর কী করতে পারে যশোবন্ত? সে সাবালিকা। সে যদি চিত্র-তারকা হতে চায়, কে তাকে রুখবে? সমাজ, আদালত না স্বামী? তার পরের কথা? সে দেখা যাবে পরে। যশোবন্ত যদি চায় ডিভোর্স করতে পারে। না খোরপোষ দাবী করবে না শীলা—তখন তো তার নিজের রোজগারই হবে যশোবন্তের ডবল। সে শুধু দাবী করবে মুন্নাকে! তাকে নিজের কাছে নিয়ে গিয়ে রাখবে।

যশোবন্ত কাপুর! লোকটা মানুষ, না জানোয়ার? না, শীলা তাকে ভালবাসে না। একদম না। কোনদিনই ভালবাসেনি। অমন মানুষকে কখনও ভালবাসা সম্ভব? দিবারাত্র শুধু খেলা, খেলা আর খেলা। সব রকম খেলা। ক্রিকেট-হকি-ফুটবল, দাবা-ব্রিজ-ব্যাডমিন্টন, ভলিবল-পিংপং। কী নয়? নিজে অবশ্য এখন খেলে শুধু টেনিস, পিংপং, বিলিয়ার্ডস আর ব্রিজ। সবচেয়ে ঝোঁক—ক্রিকেট! কিন্তু যাবতীয় খেলার সংখ্যাতত্ত্ব মুখস্থ। অহেতুক! ছেলেটাও হয়েছে বাপের মত। পড়াশুনা করতে চায় না। বাপ্‌কা বেটা! খেলা, খেলা আর খেলা। শূন্যে দিবারাত 'হুক' করছে আর 'পুল' করছে। আরও কী সব? লেট-কাট, গ্লান্স! মনেও থাকে না ছাই!

আর একটা মর্মান্তিক খেলার কথা বলা হয়নি। সে খেলা দ্বৈরথের। একমাত্র শীলাই জানে সে খবর। যশোবন্তরা পাঁচ ভাই, চার বোন—বিরাট সংসার। ওর বাবা-কাকা পিসিরাও সংখ্যায় এগারোজন। রাবণের গুষ্টি। ওর ভাই-বোনেরও তিন-চারটি করে সন্তান। শীলার কেন একটি মাত্র সন্তানেই উর্বরতা ফুরিয়ে গেল এই নিয়ে ওর চিন্তা। শেষমেশ ডাক্তারের কাছে ধরে নিয়ে গিয়েছিল পর্যন্ত। নিজেকে পরীক্ষা করিয়েছিল। শীলাকেও। শীলা বুদ্ধিমতী! নির্জনে পেয়ে ডাক্তারবাবুকে অকপটে সব কথা খুলে বলেছিল। সে এখনই আর জননী হতে চায় না—অন্তত আরও বছর দুয়েক। কিন্তু তার স্বামী কোন যুক্তি শুনবে না। তাই সে গোপনে 'ওর‍্যাল-ট্যাবলেট' খায়। ডাক্তারবাবু বুদ্ধিমান। মেডিকেল এথিক্সও নাকি বলে, রুগী চাইলে তার জীবনসঙ্গীকেও রুগীর গোপন-কথা জানাতে নেই। তাই যশোবন্তকে তিনি বুঝিয়েছিলেন, কারও কোন দোষ নেই—চিকিৎসা করানো বেকার। সন্তান ওদের হবে, তবে কিছু দেরী হবে।

হঠাৎ চিন্তাস্রোতে বাধা পড়ল কলিং বেলটা ককিয়ে ওঠায়।

শাড়ির আঁচল সামলে শীলা এগিয়ে যায় সদর দরজার দিকে। ম্যাজিক-আইতে চোখ লাগিয়ে দেখে—সে যা আশা করছিল তাই। নিখুঁত স্যুট পরে দরজার ও-প্রান্তে দাঁড়িয়ে আছে তার কল্পলোকের রাজপুত্র : মনমোহন দস্তুর।

শীলা ছোর-নবটাকে নিবিড় করে জড়িয়ে ধরল তার ম্যানিকিওর করা আঙুলে।

রুদ্ধদ্বার খুলে গেল আচমকা।

আজও প্রচণ্ড মাথা ধরা নিয়ে বাড়ি ফিরেছে প্রণব! এমনটা কেন হচ্ছে? শ্যামলী এর কোন কারণ খুঁজে পায়নি। ডঃ ব্যানার্জী কারও নিষেধ শোনেননি। পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে তাঁর জামাইকে পরীক্ষা করিয়েছেন প্রথম শ্রেণীর চিকিৎসক দিয়ে। না, তার চোখের পাওয়ার ঠিক আছে, রক্ত-চাপ স্বাভাবিক, ব্লাড-শুগার নেই, কার্ডিয়োগ্রোফের হিজিবিজি কোন বিপদের সঙ্কেত দেয় না। তাহলে প্রণবের এ কী রোগ? রোজই সন্ধ্যাবেলা এসে বলে : ভীষণ মাথা ধরেছে।—শুয়ে পড়ে সটান। রাত্রে কোনদিন খায়, কোনদিন খেতে চায় না। এমন যে নেশা, বই—তাও আজকাল পড়ে না। পড়তে চায় না। চুপচাপ চিৎ হয়ে প্লাসটিক-ইমালশান-রঞ্জিত সিলিং-এর দিকে তাকিয়ে পড়ে থাকে।

—অ্যাস্পিডন দুটো খেয়েছ?

—হুঁ! একটু চোখ বুজে শুয়ে থাকলেই ঠিক হয়ে যাবে।

শ্যামলী ওর শিয়রের কাছে এসে বসে। চুলের মধ্যে বিলি করে দেয়। কপালে হাতটা রেখে বলে, কপালে ওডিকোলন দেব? এ কী রোগ হল তোমার বল তো?

—না থাক। এমনিতেই সেরে যাবে।

—চা খাবে এক কাপ? লেবু দিয়ে? বিকালে চা খেয়েছিলে তো?

boiRboi.net

—বলছি তো ঠিক হয়ে যাবে। কেন বারবার বিরক্ত করছ ?

বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মত উঠে দাঁড়ায় শ্যামলী। বলে, বিরক্ত হচ্ছ তা বুঝতে পারিনি। ঠিক আছে। চলে যাচ্ছি—চলে যাবার উপক্রম করে। হঠাৎ উঠে বসে প্রণব। খপ করে ওর চুরি-ঢাকা হাতটা চেপে ধরে বলে, আয়াম সরি! রাগ কর না। বস। কথা আছে।

জানলা-দিয়ে আসা একমুঠো জ্যোৎস্নার দিকে চুপ করে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকে শ্যামলী। তারপর ধীরে ধীরে বসে পড়ে আবার।

—শমু ?

—উঁ ?

—আমার রোগটা কী জানতে চাইছিলে, নয় ? তুমি বুঝতে পার না ?

—কী ?

—লালগড়ের ক্লাইমেট আমার সহ্য হচ্ছে না। চল আমরা অন্য কোথাও চলে যাই।

—অন্য কোথাও কেমন করে যাবে ? এটাই তো তোমার চাকরিস্থল ? তাছাড়া লোকে শরীর সারাতে লালগড়ে আসে। এখানকার ক্লাইমেট সহ্য হচ্ছে না—এটা তোমার বাজে কথা।

প্রণব ইতস্তত করে। কী-ভাবে কথাটা বলা যায় বুঝে উঠতে পারে না। শেষে ঘুরিয়ে বলে, চাকরিটা তো আমার সঙ্গে অচ্ছেদ্যবন্ধনে আবদ্ধ নয় ? যেমন আমার হাত-পা, যেমন তুমি ? নতুন কোন কর্মক্ষেত্রে নতুন ভাবে শুরু করতে পারি আমরা।

—'আমরা' নয়! বল, 'আমি'। আমাকে ছাড়তে যে বাপি রাজী হবেন না এটাতো তুমি জানই ভাল করে। তবে বার বার 'আমরা' বলছ কেন ? তাছাড়া, কে তোমার জন্য অন্য জায়গায় চাকরি নিয়ে বসে আছে ?

—না, চাকরি নয়—স্বাধীন ব্যবসাও তো করা যায় ? আমার এক সহপাঠী মণি বোস—তার কথা তো তোমাকে বলেছি, সে একটা সলিসিটার্স ফার্ম খুলে বসেছে কলকাতায়, ক্যামাক স্ট্রীটে। আমাকে চিঠি লিখেছে। বলছে, তুই চলে আয়, একসঙ্গে পার্টনারশিপ ফার্ম খুলব।

শ্যামলী ম্লান হাসল। বললে, চিঠি লিখেছেন বুঝি ? কী রকম রোজগার হচ্ছে লিখেছেন ?

—এখনও বিশেষ কিছু নয়। মাস্‌ছয়েক তো খুলেছে ফার্মটা। ইনিশিয়াল

BanglaBook.org

ইনভেস্টমেন্টটাও তো বড় কম নয়। তবে লিখেছে, হচ্ছে—মোটা ভাত কাপড়ের ব্যবস্থাটা হয়ে যাচ্ছে।

—তবে তো কথাই নেই। মণিবাবু একান্নবর্তী পরিবারের মানুষ, বিয়ে করেননি। মাথা গোঁজার আশ্রয় আছে। মোটা ভাত-কাপড়ের চেয়ে বেশি আর কী চাই তাঁর? তুমি এক কাজ কর বরং। এখানে রিজাইন দিয়ে ওঁর সঙ্গে গিয়ে জয়েন কর। কলকাতার কোন মেসে গিয়ে থাক। মোটা ভাত-কাপড়ের ব্যবস্থাটা হয়ে যাবে। আর মেসে মাথা ধরে শুয়ে পড়ে থাকলে কেউ বিরক্তও করতে আসবে না। কত সুবিধা।

প্রণব ম্লান হাসল। ওর হাতের ওপর হাত বুলাতে বুলাতে বলল, তোমার রাগটা পড়েনি দেখছি। আমি কি তাই বলেছি?

—রাগ কী করে পড়বে? রোজ সন্ধ্যাবেলায় এমন মাথা ধরলে কারও ভাল লাগে। আজ আবার মিস্টার গুরুবক্সানির বাড়িতে পার্টি আছে। তোমারও নিমন্ত্রণ আছে; কিন্তু যা বুঝছি, আমাকে একাই যেতে হবে।

—না না, একা কেন? মা যাবেন, সাহেব যাবেন—

—ন্যাকামি কর না! হাজবেণ্ড-ওয়াইফ তোমার-আমার নিমন্ত্রণ আছে না? আর. এস. ভি. পি. ছিল। তখন বললেই পারতে—

—আমি কি তখন জানতাম, আমার মাথা ধরবে?

তখনই কে যেন দরজায় টোকা দিল। দরজা খোলাই ছিল। শ্যামলী বললে, কাম ইন।

দরজা একটু ফাঁক করে বেয়ারা বললে, সা'ব সেলাম দিয়েছেন। ওঁরা তৈরী হয়েছেন।

—আচ্ছা, গিয়ে বল আমার মিনিট পনের দেরী হবে।

বেয়ারা দরজাটা টেনে দিয়ে চলে যায়। প্রণব এতক্ষণে লক্ষ্য করে দেখে শ্যামলীর প্রসাধন সারা হয়েছে। ঘরে আলো জ্বলছে না বলে এ যাবৎ নজর হয়নি। বললে, ওঁরা তোমার জন্য অপেক্ষা করছেন শমু, তুমি যাও বরং, সাহেব রাগ করবেন—

শ্যামলী ধমকে ওঠে, তুমি ড্যাডিকে সব সময়ে 'সাহেব-সাহেব' বল কেন বলতো?

—আয়াম সরি। অফিসে একরকম, বাড়িতে একরকম—আমার মনেই থাকে না!

boiRboi.net

শ্যামলী ঠোঁট উলটে বলে, বলেছি পনের মিনিট পরে যাব, তো তাই যাব। থাকুন ওঁরা অপেক্ষা করে।

—বেশ, তাই যেও। এস তাহলে পনের মিনিট গল্প করি।

—কী গল্প?

—সেই ব্যাপারের কী স্থির করলে? সেই ডঃ ত্রিবেদীর ইন্টারভিয়ু—

শ্যামলী হেসে ওঠে, আবার! ওরে ফাদার! আচ্ছা শিক্ষা হয়ে গেছে সেদিন!

অন্ধকারে সে দেখতে পেল না—প্রণব কিন্তু হাসিতে যোগ দেয়নি।

শ্যামলী যে লুকিয়ে ডঃ ত্রিবেদীর বক্তৃতা শুনতে গিয়েছিল এটা সে রাত্রেই জানতে পারেন ডঃ ব্যানার্জি। শ্যামলী স্বপ্নেও ভাবতে পারেনি ডঃ ব্যানার্জির চর সব কিছু নোট করে যাচ্ছিল। এ নিয়ে পিতা-পুত্রীর মধ্যে কিঞ্চিৎ মনান্তর ঘটে গেছে। ডঃ ব্যানার্জির অভিমানের মূল কারণ—তিনি তো কারও ব্যক্তি-স্বাধীনতায় হাত দিতে চান না; তাহলে শ্যামলী লুকিয়ে গেল কেন ওখানে? বিপদে পড়ে শ্যামলীকে স্রেফ মিথ্যার আশ্রয় নিতে হয়েছিল—সে করবীদির নিমন্ত্রণেই গিয়েছিল, তাঁর পীড়াপীড়িতে বাধ্য হয়ে তাকে বক্তৃতা শুনতে যেতে হয়। ব্যানার্জি-সাহেব সেটা মনে নিয়েছিলেন কিনা বোঝা যায়নি, তবে শ্যামলীর খোঁপাটা নেড়ে দিয়ে বলেছিলেন, ডোন্ট বি এ নটি গ্যার্ল এগেন!

প্রণব বললে, আমি আর. এস. ভি. পি.-র নির্দেশ অগ্রাহ্য করে বিছানায় পড়ে আছি বলে তুমি রাগ করেছিলে শমু—তবু আমার একটা কৈফিয়ৎ আছে। আমি অসুস্থ। আর তুমি? তুমি নিজে হাতে সেদিন নাম-ঠিকানা লিখে দিয়ে এসেছ, তোমার ইন্টারভিয়ু কার্ড পর্যন্ত এসে গেছে। এখন তুমি বলছ—'ওরে ফাদার!' এর কোন মানে হয়?

শ্যামলী লজ্জিত হয়ে বলে, কী করব বল? আমার ইন্টারভিয়ু কার্ডটা ড্যাডি দেখেছে। তারিখ আর সময়টা তার ডায়রিতে নিশ্চয় লেখা আছে। আমাকে একেবারে চোখে-চোখে রাখবে।

প্রণব আদর করে বললে, কাওয়ার্ড!

শ্যামলী ওর বুকে মাথা রেখে বললে, আই অ্যাডমিট! ড্যাডিকে আমি বাঘের মত ভয় করি!

—বাঘ?

—ভালও বাসি।

—তা তো বটেই। কিন্তু শমু, গেলে তুমি কী বলতে?

boiRboi.net

—কাকে ? কী বিষয়ে ?

—ঐ ডঃ ত্রিবেদীকে। তোমার লাল-ত্রিকোণের বিষয়ে। তিনি যখন জানতে চাইতেন—কেন তুমি সন্তান চাও না, কেন সন্তান হতে দিচ্ছ না ?

শ্যামলী ওর গালে একটা ঠোনা মেরে বললে, সত্যি কথাই বলতাম। আমার কর্তা বাচ্চা চায়, আমি চাই না—তাই বাচ্চা হয়নি। বলতাম, এ নিয়ে কর্তা-গিন্নিতে আমাদের তুলকালাম ঝগড়া হয়। ঝগড়া, মারামারি, শেষমেশ সন্ধি !

প্রণব বললে, কিন্তু সেটা তো সত্য কথা নয় ?

—সত্য নয় ? ঝগড়া হয় না ? তুমি চাও না ? আমি আপত্তি করি না ?

—তিনটেই সত্য জবাব ; কিন্তু আইনের ভাষায় যাকে আমরা বলি—'হোল ট্রুথ, অ্যাণ্ড নাথিং বাট্ দ্য ট্রুথ', তা নয় ?

শ্যামলী সোজা হয়ে বসে। সতর্ক হয়। বলে, তবে নির্জলা সত্যটা কী ? শুনি ?

—তুমিও মা হতে চাও ! বাধা সেখানে নয়। বাধা অন্য !

—অন্যত্র মানে ?

—য়ু নো ইট শমু। তোমার বাবা ! সাহেব !

শ্যামলী বোধহয় চিৎকার করে উঠত—কিংবা মেরেই বসত প্রণবকে। এতবড় অভিযোগটা সে করে কোন সাহসে ! কিন্তু সে কিছুই করল না। ঠিক সেই মুহূর্তেই আবার কে যেন দরজায় 'নক' করল। শ্যামলী সামলে নিয়ে বললে, যাচ্ছি রে বাবা, যাচ্ছি !

উঠে পড়ে সে। কে বলবে ওর চোখ দুটো জ্বলে উঠেছিল মুহূর্তপূর্বে অন্ধকারের মধ্যে। মিষ্টি গলায় বললে, তাহলে যাই ? কেমন ? লক্ষ্মী হয়ে একটু ঘুমোবার চেষ্টা কর। মাথা ধরা সেরে যাবে !

আঁচলটা সামলে নিয়ে শ্যামলী বেরিয়ে যায় ঘর ছেড়ে।

প্রণব উঠে বসে। আলোটা জ্বালে। বালিশের তলা থেকে টেনে নেয় একখানা বই। তার মাথা ধরেনি আদৌ।

amarboi.net

মায়ের জন্য দুঃখ হয় কেটির। বেচারি মা! কিন্তু সে কী করতে পারে? হঠাৎ তো হাওয়ায় মিলিয়ে যেতে পারে না। তা যদি পারত, ভাবে কেটি, তাহলে মায়ের জীবনের এই অপরাহ্ণ বেলায় মা বেচারি একটা সান্ত্বনা খুঁজে পেত। কেটি বুঝতে পারে সব। কেন পারবে না। ষোল বছর বয়স তো তারও হল। পাশের ফ্ল্যাটের মিস্টার রঙ্গচারীর অবস্থাটাও বোঝে। দু-জনেরই জীবন-সূর্য মধ্য-গগন অতিক্রম করেছে। দীপ্ত সূর্যের অনলবর্ষী ক্ষমতা আর নেই। না থাকে, নাই থাকল? তাই বলে বিদায় নেবার আগে পশ্চিম আকাশটাকে একবার শেষ বারের মত রাঙিয়ে দিয়ে যেতে আপত্তি কোথায়? রঙ্গচারী আর নোয়ামি। অতিক্রান্তযৌবন পুরুষ ও নারী। ওরা পাল তুলে ভাসবার দিন পার হয়েছে—এখন দুজনেই খুঁজছে পোতাশ্রয়ের নিরাপত্তা। কিন্তু সেই নিরাপদ বন্দরে প্রবেশের পথ ওরা দুজন খুঁজে পাচ্ছে না। বন্দরের প্রবেশ-পথে মূর্তিমান ডুবো-পাহাড়: কেটি!

নাঃ। কেটি অবিবেচক নয়। সে নিজে হাতে সেই বাধা সরিয়ে দেবে। না, আত্মহত্যা নয়। সে ওদের দুজনকে বুঝিয়ে দেবে বন্দরের প্রবেশ পথে একটা ডুবো-পাহাড় ছিল না. ছিল একটা নিথর জলযান—এ ভার্জিন শীপ। বন্দর ছেড়ে কোনদিন জলে ভাসেনি বলে তোমরা সেটা বুঝতে পারনি। এবার বুঝে নাও। তার পালেও এসে লেগেছে সাগরপারের হাওয়া। টান টান হয়ে ফুলে উঠেছে তার পাল, কাছিতে পড়েছে টান, দাঁড়গুলো চঞ্চল হয়ে উঠেছে। কাল-বৈশাখীর ঝড় এসে গেল বলে। এই ঝড়ের মুখেই বন্দর ছেড়ে ছিটকে বেরিয়ে পড়বে সে—জল কেটে গিয়ে পড়বে মাঝ দরিয়ায়। কলম্বনা রাজহংসীর মত এগিয়ে যাবে চেনা-জানা ঘাটের নিশানা এড়িয়ে। পিছনে ফেলে যাবে পোতাশ্রয়ের চিহ্নিত নিরাপত্তা—সেখানে তোমরা নোঙর ফেল! আই উইশ য়ু অল হ্যাপিনেস, মাম্মি-ডিয়ার।

দুঃখ হবে না? বেচারি মা! সেদিন বব্-এর ঐ কথাটা মাকে বলা বোধহয় ঠিক হয়নি। কেটি লক্ষ্য করেছে তার পরদিন থেকে মাম্মি আর মিস্টার রঙ্গচারীর স্কুটারে চেপে যায় না। বাসের রুট সুবিধাজনক নয়। ফলে নোয়ামিকে বার হতে হচ্ছে আরও আধঘন্টা আগে। হাঁটতে হাঁটতেই পাড়ি দিতে হচ্ছে এই দেড় মাইল পথ।

যাক। আর কদিনই বা? দিন দশ-পনের বড় জোর। ও তো বলেছে, লেখাটা ওর শেষ হয়ে গেছে। এবার পাততাড়ি গুটোবে।

boiRboi.net

কেটি যেদিন নিরুদ্দেশযাত্রায় বার হয়ে পড়বে সেদিন কী কী ঘটবে? মাম্মি প্রথমটা অত্যন্ত শক্‌ড্‌ হবে। হয়তো কেটির নিষেধ সত্ত্বেও পুলিসে খবর দেবে। খোঁজাখুঁজি করবে। মুশকিল তো সেখানেই—ও সাবালিকা নয়। কিন্তু ধরা সে কিছুতেই পড়বে না। তাকে ঠিক মত লুকিয়ে রাখার বন্দোবস্ত করাই আছে! করবী দি শুনে কী বলবে? বলবে, ঈস্! কেটী? আমার যে বিশ্বাসই হচ্ছে না। ঐ তো এক ফোঁটা মেয়ে! আর শীলা কাপুর? হাসি পেল কেটির! শীলা কাপুর ঘরে খিল দেবে সেদিন! বুকফাটা কান্না কাঁদবে লুকিয়ে লুকিয়ে তার যে বড় আশায় ছাই দিয়েছে কেটি! রমলাদি, সরলাদি, মিস বিজলী সেন—সবাই মৌখিক সহানুভূতি দেখাবে। মনে মনে মুণ্ডপাত করবে কেটির, আর তাদের ফুরুৎ-করা রাজপুত্রের: মনমোহন চক্কত্তরের!

বোম্বাইয়ে পৌঁছেই সে মাকে কিছু লিখবে না। আগে কন্ট্রাক্টে সই হবে, মহরৎ হবে, শুটিং চালু হবে—তারপর সে মস্ত একটা চিঠি লিখবে তার মাম্মি-ডিয়ার কে। লিখবে আমার জন্য মন খারাপ কর না। লিখবে, আমি ভালই আছি—অনেক, অনেক টাকা রোজগার করছি। আরও দু-একটা কন্ট্রাক্টের ডাক আসছে। এখন আমি খুব বিজি! আগামী তিনমাস আমার কন্টিনিউয়াস শুটিং। তার চেয়ে এক কাজ কর মাম্মি। তুমি আর মিস্টার রঙ্গচারী (এখনও কি তাঁকে ঐ নামে ডাকব?) আমার এখানে চলে এস। আমার ফ্ল্যাটে তিনখানা ঘর। কোন অসুবিধা হবে না। দিনসাতেকের ছুটি নিয়ে তোমরা দুজনে চলে এস। বম্বে ভারী চমৎকার জায়গা।

হঠাৎ ঝন্‌ঝন্‌ করে বেজে উঠল টেলিফোনটা।

কেটি ছুটে এসে তুলল সেটা: হ্যালো?···হ্যাঁ কথা বলছি!···কিন্তু কী দুঃসাহস তোমার? মা যদি ধরত?···তা কেন? মা তো আজ ক্যাসুয়াল লীভ নিয়ে বাড়িতেই থাকতে পারত?

তারপর অনেকক্ষণ একনাগাড়ে শুনে বললে, পাক্কা ক্রিমিনাল! এতও জান তুমি!

BoiRboi.net

—সুপ্রভাত, মিসেস টু-জিরো টু-নাইন! আপনি ঠিকমত গুছিয়ে বসেছেন? প্রশ্নবাণ নিক্ষেপ করতে শুরু করি?

—করুন।

অলকের মনে হল মেয়েটি 'করুন' বলেনি, বলেছে 'করুণ'! পর্দার ও-প্রান্তে যে অবগুণ্ঠনবতী বসে আছে তাকে ও দেখতে পাচ্ছে না। সে গৌরি না শ্যামাঙ্গী, সে তরুণী, যুবতী না প্রৌঢ়া ঠিক জানা নেই, সে পদ্মিনী-চিত্রিণী-হস্তিনী যা কিছু হতে পারে। তার কিছুটা স্বরূপ অবশ্য অচিরেই উদ্ঘাটিত হবে; কিন্তু সব কিছু জানা যাবে না। যা একান্ত গোপন, হয়তো তার স্বামীও আজ পর্যন্ত জানে না—তা জানতে পারবে অলক; কিন্তু যা তার বাড়ির ঝিটা পর্যন্ত জানে—ওর নাম, ওর পরিচয়, ও সুরূপা না কুরূপা, তা কোনদিনই জানতে পারবে না। যেমন ঐ মেয়েটিও কোনদিন জানবে না কে সেই অজ্ঞাত ভদ্রলোক যে ওর গোপনতম তথ্য সংগ্রহ করে জনতার ভীড়ে মিশিয়ে গেল। এই অপরিচয়ের পরিবেশটা হাল্কা করতে সচরাচর অলক শুরু করে হাল্কা মেজাজে। বলে, প্রশ্নবাণ আমার তূণ থেকে ছাড়ছি কিন্তু, ভয় নেই—একেবারে বিদীর্ণ হয়ে যাবেন না। পর্দার ওপার থেকে সে শুনতে পায় কখনও জলতরঙ্গের শব্দ,—মিষ্টি হাসির আওয়াজ, কেউ বা বলে, ভয় নেই তো ভরসাও নেই! কোন কৌতুকময়ী আবার বলে, 'দুর্ভাগ্য আমার। ইচ্ছে করছে প্রতিপ্রশ্ন ছুঁড়ে আপনাকেই বিদীর্ণ করি।'

এ মেয়েটির কণ্ঠে সে কৌতুকের তারল্য নেই। করুণস্বরে শুধু বললে, করুন!

—আপনার বয়স?

—আঠাশ বছর তিন মাস।

—কত বছর বয়সে বিবাহ হয়েছে?

—একুশ বছরে।

অর্থাৎ সাত বছরের বিবাহিত জীবন।

—কয়টি সন্তানের জননী?

—সন্তানাদি নেই।

—হয়ই নি?

—না।

—গর্ভে এসেছিল?

—না।

boiRboi.net

—আপনার বাল্য ও কৈশোরের কথা এবার জিজ্ঞাসা করি—

মেয়েটি উচ্চবিত্ত সম্প্রদায়ের। বাপের মাসিক রোজগার ছিল কয়েক হাজার। কলকাতায় তাঁর নিজস্ব বাড়ি আছে। বাপ-মায়ের একমাত্র সন্তান। বি. এ. পাশ। এম. এ. পড়তে পড়তে বিয়ে হয়ে যায়। না, অভিভাবকদের নির্বাচিত পাত্র নয়, যাকে বলে প্রেম করে বিয়ে। বাপ-মায়ের অনুমোদন মেলেনি। শেষ পর্যন্ত রেজিস্ট্রি-ম্যারেজ হয়েছিল।

হঠাৎ অন্যমনস্ক হয়ে পড়ে অলক। তার মনে হয় আশ্চর্য! এ মেয়েটিকে তার চেনা-চেনা লাগছে কেন? ঠিক এই বিবরণ সে ইতিপূর্বেই কোথায় যেন শুনেছে। কিন্তু তা কী করে সম্ভব? লালগড়ের কোন মহিলার সঙ্গেই তো তার আলাপ হয়নি। সে তো আছে সম্পূর্ণ অজ্ঞাতবাসে?

—সন্তান গর্ভে আসেনি বলছেন। প্রথম থেকেই জন্মনিয়ন্ত্রণ করছেন?

—না!

—কবে থেকে সেটা শুরু করেন?

—কোন দিনই করিনি।

অলক অবাক হয়; কিন্তু অবাক হবার কি আছে? হয়তো মহিলা বন্ধ্যা; কিংবা তাঁর স্বামী—

—এখনও করেন না?

—এখন করবার প্রশ্ন ওঠে না। আমার স্বামী মারা গেছেন! এক বছর আগে।

বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মত সচকিত হয়ে ওঠে অলক। ঠিক সেই মুহূর্তেই সে চিনতে পারে পর্দার ওপারের ঐ রহস্যময়ীকে। না চাক্ষুষ দেখেনি,—কিন্তু সে অপরিচিতাও নয়। নীরদ মুস্তাফির কাছে শুনেছে তার বিবরণ। ঐ মেয়েটি করবী বসু! শহীদ জিতেন্দ্রনাথের বিধবা। সেই যাকে দেখে নীরদবাবুর মনে পড়ে গিয়েছিল দেড়শ বছর আগেকার লেখা কোন সাহেবের সতীদাহের বিবরণ। সামলে নিয়ে বললে, আমি দুঃখিত মিসেস ২০২৯। কী ভাবে তিনি মারা যান?

—অ্যাকসিডেন্টে!

—আয়াম সো সরি!—কিন্তু একেবারে নিশ্চিন্ত হতে চায় অলক। বলে, কী জাতীয় দুর্ঘটনায়?

এবার জবাব দিতে দেরী করে মেয়েটি। কয়েক সেকেণ্ড পরে জবাব না দিয়ে সে একটি প্রতিপ্রশ্ন পেশ করে, এক্সকিউজ মি ডক্টর, আপনি কি তালিকা ধরে প্রশ্ন করছেন, না এ আপনার ব্যক্তিগত কৌতূহল?

boiRboi.net

অলক সংযত হয়। তালিকা ধরে সে সত্যই প্রশ্ন করেনি। সামলে নিয়ে বলে, কোন প্রশ্নের জবাব দিতে না চাইলে আপনি অনায়াসে বলতে পারেন—'জবাব নেই'। তাই লিখে নেব আমি। আবার জিজ্ঞাসা করি—কী ধরনের অ্যাক্সিডেন্ট ?

এবারও জবাব দিতে দেরী হল। একটু ভেবে নিয়ে মেয়েটি বললে, মটর দুর্ঘটনা !

স্পষ্টতই মেয়েটি অনৃতভাষণ করল। কিন্তু 'বিমান দুর্ঘটনা' কথাটা সে স্বীকার করতে পারে না। তাহলে সে তৎক্ষণাৎ চিহ্নিত হয়ে পড়ে। 'জবাব নেই' বললেও তাই। অলকবাবু বুঝতে পারে—মেয়েটি বুদ্ধিমতী! এ মিথ্যাভাষণে ওদের সমীক্ষার কোন ক্ষতি হবে না এটা মেয়েটি আন্দাজ করেছে! মা ব্রুয়াৎ সত্যমপ্রিয়ম্! অলকের মাথায় টুপি ছিল না, থাকলে সে ঐ মহিলাটির উদ্দেশ্যে ফাঁকা ঘরে মাথার টুপি খুলত।

এবার সে অন্য প্রসঙ্গের অবতারণা করে। রীতিমত তালিকা ধরে অগ্রসর হয়। মনকে বোঝায়—তার কৌতূহল অহৈতুকী। বস্তুত পর্দার ওপারে যাঁরা এসে বসবেন তাঁদের পরিচয় জানার চেষ্টা করবে না এমন একটা অলিখিত প্রতিশ্রুতি সে দিয়ে রেখেছে ডঃ ত্রিবেদীকে। শুধু ত্রিবেদীকে কেন, নিজের বিবেকের কাছে। সেই প্রতিশ্রুতি পেয়েই মহিলারা আসছেন। ওদের বৈজ্ঞানিক সমীক্ষায় সাহায্য করে যাচ্ছেন !

তালিকা ধরেই অগ্রসর হচ্ছিল সে—জানা গেল, ঐ ২০২৯-চিহ্নিত মহিলা হিন্দু, তিনি দৈনিক পূজা-আর্চা করেন না, সাপ্তাহিক লক্ষ্মীপূজাও নয়। কালীবাড়ি যাওয়া ইত্যাদি বাতিক নেই। নিজে হাতে রান্না করেন। বই পড়তে ভালবাসতেন। গান শুনতেও। আগে মহিলা সমিতির কাজে সক্রিয় অংশ নিতেন, ইদানীং উৎসাহ বোধ করেন না। বেশ চলছিল, আবার হোঁচট খেল একটা গুরুতর প্রশ্নে—

—আমার মনে হয়, আপনি আমার প্রশ্নটা বুঝতে পারেননি। 'চরম পুলক' বলতে আমি মীন করছি 'অরগাজম্'। শব্দটার অর্থ জানেন ?

ও প্রান্তের মেয়েটি যেন ধমক দেয়, আই নো ডক্টর !

—আপনি বলতে চান, প্রতিবারেই আপনার 'অরগাজম্' হয়েছে ?

—ইয়েস্ !

অলকের মনে হল—পর্দার ওপারে বসে আছেন পৃথিবীর অষ্টমাশ্চর্য ! ডঃ ত্রিবেদী প্রায়ই জাঁক করে বলেন, কোন মহিলাই তাঁকে এমন কোন জবাব দিতে পারেননি, যা তিনি ইতিপূর্বে শোনেননি। অলকের মনে হল—অন্তরালবর্তিনী তার একটি

boiRboi.net

অদ্ভুত ব্যতিক্রম। ডাঃ ত্রিবেদী তো ছার—সমগ্র যৌনবিজ্ঞানে এমন বিচিত্র কথা কোন বিবাহিত মহিলাই কোনদিন শোনাতে পারেননি।

অনেকক্ষণ সে চুপ করে বসে রইল। শেষে নীরবতা ভঙ্গ করে ও-প্রান্ত-বাসিনীই প্রশ্ন করেন, আপনার প্রশ্নের তালিকা কি শেষ হয়ে গেছে ডক্টর?

না, শেষ হয়নি। তাছাড়া সে ডক্টরও নয়, যদিও মেয়েটি বারে বারে তাকে ঐ নামে সম্বোধন করছে। প্রশ্ন আরও অনেক ছিল; কিন্তু অলকের মনে হল মেয়েটি অহেতুক মিথ্যা কথা বলছে। কেন বলছে? না, তা সে জানে না। কিন্তু তাহা মিথ্যা। আর প্রশ্ন করে লাভ নেই, মানে ওদের সমীক্ষার প্রয়োজনে। মেয়েটির এই রিপোর্টখানা আদৌ গ্রাহ্য কিনা বিবেচ্য—এর মধ্যে স্পষ্টতই অনেক মিথ্যার খাদ মিশে আছে। একটি মোক্ষম বাণ নিক্ষেপ করে বসে এবার, প্রাক-বিবাহ অথবা বিবাহোত্তর জীবনে স্বামী ভিন্ন অন্য কোন পুরুষের দৈহিক নিবিড় সান্নিধ্যে আসার অভিজ্ঞতা আছে?

মেয়েটি যেন প্রস্তুত হয়েই ছিল। চট্-জলদি জবাব, আছে।

—কবে? বিবাহের আগে না পরে?

—আগেও নয়, পরেও নয়—স্বামী মারা যাবার পরে।

অলক নড়েচড়ে বসে। অর্থাৎ এ ঘটনা অত্যন্ত সাম্প্রতিক। মেয়েটি বিধবা হয়েছে বছরখানেক আগে। পুনরায় প্রশ্ন করে, ঘটনাটাকে কী বলবেন? আকস্মিক ঘটনাচক্রে ঘটে যাওয়া?

—না তো!

—এক দিনের বা এক রাত্রের ঘটনা?

—না। দীর্ঘ তিন মাসের ঘটনা। অনেকবারই আমরা দুজন···

—অধ্যায়টা কি শেষ হয়নি? এখনও চলছে?

—না। সে সব চুকেবুকে গেছে।

—আপনি কি এজন্য অনুতপ্ত?

—কেন? অনুতপ্ত হবার কী আছে! আমরা দুজনেই তো ওটা চেয়েছিলাম···

—দুজনেই? সে-ক্ষেত্রে তাঁকে বিয়ে করলেন না কেন?

অন্তরালবর্তিনী নীরব। অলক নিজেই একাধিক জবাব তালিকাকারে পেশ করে। মেয়েটিকে বেছে নেবার সুযোগ দেয়: তিনি অনিচ্ছুক ছিলেন, না আপনি? সামাজিক প্রতিবন্ধকতা? লোক-লজ্জা? বয়সের তফাৎ? নিকট আত্মীয়? তিনি বিবাহিত বলে?

boiRboi.net

এতক্ষণে মেয়েটি বললে, জবাব নেই।

অলকও বলে ওঠে, প্রশ্নও আর নেই। অনেক ধন্যবাদ।

ও-প্রান্তে শাড়ি খসখসের শব্দ হল।

অলক একটা সিগারেট ধরালো। সে নিঃসন্দেহ—মেয়েটি একাধিক মিথ্যা কথা বলেছে। মটর দুর্ঘটনা, অর্গাজম-এর শতাংশ; কিন্তু এই শেষ জবাবটা? স্বতঃস্ফূর্ত স্বীকারোক্তি? কে জানে সেটা সত্য না মিথ্যা। আঠাশ বছরের সদ্যবিধবার জীবনে কে এসেছিল অমন করে? ও তো অনুতপ্তা নয়, তাহলে বিয়ে হল না কেন? না, মিথ্যা কথা বলেনি ঐ অন্তরালবর্তিনী। অহেতুক কেন সে মিথ্যা কলঙ্কের বোঝা মাথায় তুলে নেবে? নীরদ মুস্তাফির কথা নয়, এখন ইংরাজির ছাত্রটির মনে পড়ছে বিখ্যাত ফরাসী ঔপন্যাসিক ও সাহিত্য-সমালোচক Remy de Gourmont-এর একটি উদ্ধৃতি: 'Of all sexual aberrations, perhaps the most peculiar is chastity'—বাঙলায় অনুবাদ করলে যা দাঁড়ায়: 'যৌন-অস্বাভাবিকত্বের প্রসঙ্গে বোধ করি সব চেয়ে বড় উদাহরণ হচ্ছে সতীত্বের ধারণাটা!'—না, নীরদ মুস্তাফি ভুল বলেছেন; জিতেন্দ্রনাথের বিধবা সীতা-সতী-সাবিত্রীর মত অপাপবিদ্ধা অনিন্দিতা নয়! ওসব কাব্যেই মানায়, বাস্তবে একেবারে পাকাসোনায় অলঙ্কার হয় না। করবী বসু বোধকরি চাঁদের মতই কলঙ্কময়ী, চাঁদের মতই স্নিগ্ধা—অহল্যা-দ্রৌপদী-কুন্তি-মন্দোদরীর মতই প্রাতঃস্মরণীয়া!

ভারী ইচ্ছে করছিল, উঁকি মেরে একবার দেখে। ঐ সদ্যবিধবা করবী বাসুকে!

boiRboi.net

আজ বোধহয় ব্যতিক্রমেরই দিন পড়েছে অলকের। এ পর্যন্ত সে নিজে চারশ'র উপর ইন্টারভিয়ু নিয়েছে। মামুলী ছকে বাঁধা কাহিনী। প্রশ্ন করেছে, জবাব শুনেছে এবং দুর্বোধ্য হরফে তা লিপিবদ্ধ করে গেছে। এক সময়ে শেষ হয়েছে তালিকার প্রশ্নগুলি।

ধন্যবাদ জানিয়ে শেষ করে সিগারেট ধরিয়েছে। আজ যেন তার এসেছে পালাবদলের পালা। পরপর দুজন। পরবর্তী অন্তরালবর্তিনীও তাকে একটা প্রচণ্ড নাড়া দিয়ে গেলেন।

—নমস্কার মিসেস ২০৩০। আপনি প্রস্তুত? আমি প্রশ্ন করে যাব?

—হ্যাঁ। জিজ্ঞাসা করুন।

—আপনার বয়স?

—পঁয়ত্রিশ।

—কত বছর বয়সে বিয়ে হয়েছে আপনার?

—আঠারো বছর বয়সে।

—কয়টি সন্তানের জননী?

ও-প্রান্তে নীরবতা। একটু অপেক্ষা করে একই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করল অলক। মহিলা তার জবাবে একসঙ্গে অনেকগুলো কথা বলে গেলেন, যাতে তিন-চারটি পরবর্তী প্রশ্নের জবাব ছিল, চার-চারটি সন্তান হয়েছিল বাবা, একটিও নেই!

অলক কীভাবে সহানুভূতি জানাবে ভেবে পায় না! মহিলা একটু সামলে নিয়ে এক নিশ্বাসে অনেক কথা বললেন—প্রথম ছেলে বিল্টু, তারপর মিল্টু, শেষে যমজ মেয়ে রুমনি আর ঝুমনি। তিন-চার বছরের আগে পিছে। শেষ সন্তান হয়েছে মহিলাটির বয়স যখন আঠাশ। স্বামীর রোজগার ভালই। উচ্চবিত্তের। জমজমাট সংসার। রুমনি-ঝুমনি যখন হয় তখন বিল্টুর বয়স সাত বছর, মিল্টুর চার। স্বামী ওঁর জন্যে একটি আয়া রেখেছিলেন যমজ মেয়ে হবার পর। তখন সময় কিভাবে কাটত মনে করতে পারেন না মিসেস ২০৩০। সকাল থেকে মধ্যরাত পর্যন্ত কাজের চাকায় বাঁধা ছিল জীবন। মিল্টুর জন্য জামা-প্যান্ট বানাতে হবে, বিল্টুটা আবার স্কুল থেকে ফেরে হাঁ-হাঁ করা খিদে নিয়ে—মনমত জলখাবার না পেলেই ছেলে অভিমান করে বসবে। আর রুমনি-ঝুমনির জন্য তো সারাদিন ছাখ-ছাখ ধর-ধর। এটা ভাঙছে, ওটা আছড়াচ্ছে, কিছু না হল তো দুটোয় চুলোচুলি করতে শুরু করেছে।

তারপর একদিন। তারিখটা মনে আছে ওঁর। সে কি ভোলা যায়? তেরই অক্টোবর, শনিবার। রুমনি-ঝুমনি তখন হাঁটতে শিখেছে—বিল্টু তখন ক্লাস ফোর-এ, মিল্টু আপার প্রেপ। সপরিবারে ওঁরা বেড়াতে গিয়েছিলেন মটরে করে পূজার ছুটিতে।

—উনিই ড্রাইভ করছিলেন। বম্বে রোড দিয়ে। ওঁর পাশে রামদীন আমাদের

boiRboi.net

চাকর—তার কোলে ঝুমনি। পিছনের সিটে ছিলাম আমরা কজন। জানলার ধারে দু-পাশে বিল্টু আর মিল্টু। মাঝখানে আমি, রুমনি আমার কোলে···

ভদ্রমহিলা নীরব হলেন। অলক প্রশ্ন করতে ভুলে যায়। কাহিনীর করুণ উপসংহারটা সে আগেই শুনেছে। রামদীন সম্বন্ধে তার কৌতূহল নেই, সে শুধু জানতে চায় গাড়ির গলকের কী হয়েছিল!

ধীরে ধীরে থেমে থেমে সব কথাই স্বীকার করলেন মহিলা। কতবার তিনি আঁচলে চোখ মুছেছেন অলক জানতে পারেনি, কিন্তু কতবার যে তাঁর কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হয়ে গিয়েছিল তা বুঝতে পেরেছে। প্রশ্নোত্তরের তালিকাখানা সে সরিয়ে রেখেছে অনেকক্ষণ। একটি মাত্র প্রশ্নের জবাবই তিনি দিয়ে চলেছেন দীর্ঘ সময় ধরে। জবানবন্দি তো নয়, কথা বলে মনটা হালকা করা। এ-কথা নিশ্চয় তিনি অনেককে অনেকবার শুনিয়েছেন কিন্তু এমন বিচিত্র পরিবেশে এ-জাতীয় জবানবন্দি তিনি নিশ্চয় দেননি কখনও।

দীর্ঘ বিবৃতি শেষ হতে অলক ঘড়ির দিকে একবার তাকিয়ে দেখল। সময়ের বারো-আনা অংশ পার হয়ে গেছে; কিন্তু প্রশ্ন-সংখ্যা এক-তৃতীয়াংশও পেশ করা হয়নি। অসংখ্যবার এমন ক্ষেত্রে সে অন্তরালবর্তিনীর অপ্রাসঙ্গিক বকবকানি থামিয়ে দিয়েছে; কিন্তু আজ সে পারেনি। নীরবে শুনে গেছে ওঁর কথা। ওঁর সেই মা ষষ্ঠীর কৃপায় গম-গম করা ভর-ভরান্ত সংসারের খুঁটিনাটি। বিল্টুর দুষ্টামি, মিল্টুর ফিচলেমি আর রুমনি-ঝুমনির খামচাখামচির গল্প। মনের ভার নামিয়ে মহিলা যখন চুপ করলেন তখন অলক বললে, মা, কথা বলতে আপনার কষ্ট হচ্ছে বুঝতে পারছি। সান্ত্বনার ভাষা আমার নেই। আপনাকে আর প্রশ্নভারে বিব্রত করব না—

ও-প্রান্তবাসী সামলে নিয়ে বললেন, মা বলে ডেকেছ বাবা, তোমাকে তুমিই বলছি। কিছু মনে কর না, তুমি না চাইলেও আমি যে বিব্রত হতেই এসেছি! ইচ্ছে করে। বিব্রত হলেও বিবৃতি আমাকে দিতে হবে!

—তাহলে বলুন?

—না। তুমি প্রশ্ন করে যাও।

—কতদিন আগে ঐ দুর্ঘটনা ঘটেছে?

—আজ চার বছর হল! চার বছর দু-মাস।

একটু ইতস্তত করে অলক প্রশ্ন করে, আপনি এবং আপনার স্বামী দুজনেই বেঁচে গিয়েছিলেন বললেন, হাসপাতালে দীর্ঘদিন থাকতে হয়েছিল কিন্তু অঙ্গহানি কারও হয়নি?

boiRboi.net

—হয়েছিল। ওঁর একখানা পা নেই। হাঁটু থেকে কাটা। বাঁ পা-টা। আমার শরীর অক্ষত। চিবুকে একটা মস্ত ক্ষতচিহ্ন আছে অবশ্য, পিঠেও আছে।

ঝপ্ করে অলক প্রশ্ন করে বসে, আর সন্তান আসেনি আপনার গর্ভে? এই চার বছরে?

প্রশ্ন ঝপ্ করে করলেও জবাব দিতে দেরী হল ভদ্রমহিলার। বেশ কিছুক্ষণ পরে বললেন, না!

পরবর্তী প্রশ্নটি অনিবার্যভাবে আসার কথা—কেন? কিন্তু কিছুতেই সে ঐ প্রশ্নটা করতে পারছিল না। মহিলাটিকে সে চেনে না, চোখে দেখতে পাচ্ছে না, কিন্তু ঐ নিদারুণ আঘাত পাওয়া জননীকে সে কেমন করে সেই আপাত-কদর্য প্রশ্নটা করবে? কেমন করে সংগ্রহ করবে ঐ সন্তানহারা জননীর যৌন জীবনের সেই গোপন কথা! সে যে ওঁকে 'মা' বলে ডেকে বসে আছে!

প্রশ্ন তাকে করতে হল না! চমকে সোজা হয়ে বসল অলক। মনে হল ওঘরে, ভদ্রমহিলা দুহাতে মুখ ঢেকে হাউ হাউ করে কেঁদে উঠলেন। অলক উঠে দাঁড়ায়। শান্তস্বরে বলে, না মা! আর কোন প্রশ্ন আমার নেই। আপনার সামনে টেবিলে দেখুন এক গ্লাস জল আছে। মুখে চোখে জল দিন। একটু শান্ত হলে আপনি বাড়ি চলে যান।

অশ্রু-আর্দ্র কণ্ঠে মহিলা বললেন, না, বাবা না। আমাকে যে বলতে হবে। হলবার প্রতিজ্ঞা করেই যে এসেছি আমি। শোন! আমি জানতাম, সব কথা আমি তোমাকে নিজমুখে বলতে পারব না! তাই···তাই আমি একটা লিখিত জবানবন্দি সঙ্গে করে নিয়ে এসেছি। সেটা টেবিলে রেখে গেলাম। তুমি পড়। পড়ে দেখ! দেখ, আমার মত সর্বনাশ যেন আর কারও না হয়!

অনেকক্ষণ সাড়াশব্দ না পেয়ে অলক উঠে পড়ে। এঘরে আসে। ঘরটা ফাঁকা। টেবিলের উপর একটা মুখবন্ধ খাম। আশ্চর্য! খামটা সে তখনই খোলে না। সময় নেই। আর মিনিটপাঁচেক পরেই আসবেন পরবর্তিনী।

মিসেস ২০৩১।

BanglaBook.org

আহারাদির পর বেড-সুইচ জ্বালিয়ে অলক বসল সেই খামখানা নিয়ে। খামটা খুলে ফেলতেই বার হয়ে পড়ল দীর্ঘ জবানবন্দি। লাইন-টানা খাতার কাগজ, গোটা গোটা হরফ, কোনায় আলপিন দিয়ে গাঁথা। সর্বসমেত এগারো পাতা। নিচে কারও সই নেই, 'ইতি'ও নেই—কিন্তু শুরুতে আছে সম্বোধন। এক নিঃশ্বাসে পড়ে গেল অলক—

ডাক্তারবাবু, আমি জানতাম আমার সব কথা আপনাকে বলতে পারব না। বলা যায় না; কিন্তু না বলেও যে উপায় নেই। যে-সব কথা আজ এ চিঠিতে লিখছি তার সবটা আমার স্বামীও জানেন না—তবু আমাকে আজ সব কথা স্বীকার করে যেতে হবে। কেন স্বীকার করতে হবে তাও আপনাকে বুঝিয়ে বলেছি চিঠির শেষে।

একটা কথা ডাক্তারবাবু। আপনি প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন আমার এ-সব কথা গোপন থাকবে। আমার কথা লালগড়ের প্রায় সকলেই জানে—মানে, আমার সেই অ্যাকসিডেন্টের কথা। আমার খোঁড়া স্বামীকে না চেনে কে? তাই আমি যুক্তকরে আপনাকে অনুরোধ করব আমাকে চিনবার চেষ্টা করবেন না। আমাকে খুঁজে বার করবার আয়োজন করবেন না। এ চিঠি পড়বার আগে ঈশ্বরের নামে শপথ করুন—না, ঈশ্বর নয়, আপনি নিরীশ্বরবাদীও হতে পারেন, আপনি আপনার গর্ভধারিণী মায়ের নামে শপথ করুন আমার কথা গোপন রাখবেন!

কতদূর বলতে পেরেছি আপনাকে? অ্যাকসিডেন্টের কথা বলার আগে নিশ্চয় আমি ভেঙে পড়িনি। তার পরের কথা বলতে পেরেছি? আমাদের দুজনের বেঁচে ফিরে আসার কথা? গল্পের খাতিরে ধরে নিন আমার নাম—মালতী, আর আমার স্বামীর নাম শিবনাথ রায়। হ্যাঁ আমরা দুজনেই বেঁচে ফিরে এসেছিলাম। আমি প্রায় অক্ষত, কিন্তু ওঁর ডান পা-খানা হাঁটু থেকে যে অ্যাম্পুট করতে হল সে কথা বলতে পেরেছি?

কিন্তু তার পরের কথা? কীভাবে দুজনে দুজনকে সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করেছি? কীভাকে দুজনেই ভেবেছি—আমি ঠিক আছি, ও পাগল হয়ে যাচ্ছে?

আমাদের আসল সমস্যাটার কথা বলতে পেরেছি কি? যে সমস্যা এক সময়ে চার-চারটি সন্তানের বিয়োগ-ব্যথার চেয়েও বড় হয়ে দেখা দিয়েছিল আমাদের জীবনে? অবাক হচ্ছেন ডাক্তারবাবু? কিন্তু এই হচ্ছে মানুষের জীবন! ঘৃণা হচ্ছে নিশ্চয় আমার এ-কথায়! কী স্বার্থপর এই মেয়েমানুষ জাতটা! এক নিঃশ্বাসে ঐ মেয়েটা কেমন করে বলতে পারল সে-আঘাত ঐ চার-চারটে সন্তানকে হারানোর চেয়েও বড়!

আপনি ক্ষণিকার সেই কবিতাটা পড়েছেন ডাক্তারবাবু?—'যাহার লাগি

boiRboi.net

চক্ষু-বুঁজে বইয়ে দিলাম অশ্রুসাগর / তাহারে বাদ দিয়েও দেখি বিশ্বভুবন মস্ত ডাগর!' কই, এ কবিতা লেখার জন্য রবীন্দ্রনাথকে তো ধিক্কার দিচ্ছেন না? তবে আমিই বা কী এমন অপরাধ করলাম? বাঁচতে তো হবে—বাঁচাতে হবে ঐ হাড়-পাঁজরা বার করা খঞ্জ মানুষটাকে! কী দিয়ে বাঁচাবো? কোথায় পাব সেই সঞ্জীবনী মন্ত্র? এ আঘাত যে কত বড় আঘাত তা বুঝতে পারেন?

যমজ মেয়ে হবার পরেই আমরা বলেছিলাম—ঐ যা আপনারা ক্রমাগত বলে যাচ্ছেন—'ব্যস'! চিরস্থায়ী সমাধান খুঁজেছিলাম আমরা—চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত। এ অনিত্য সংসারে যা সোনার পাথর বাটি! আমরা বুঝিনি,—কিন্তু আমরা তো বিজ্ঞানী নই—বিজ্ঞান-শিক্ষিত ডাক্তারবাবু কেন এ সম্ভাবনার কথা বলেননি আমাদের?

উনি ভ্যাসেক্টমি অপারেশন করিয়েছিলেন আমার যমজ মেয়ে হবার পরে। মহাকাল বোধকরি তখন মুখ টিপে হেসেছিলেন!

ডাক্তারবাবু! এক এক সময় ইচ্ছে হয়েছে গায়ে কেরোসিন ঢেলে দেশলাই জ্বেলে দিই। দিতাম—তাই দিতাম, যদি না ঐ অস্থিচর্মসার খোঁড়া মানুষটা অপরাধীর মত মাথা নিচু করে এসে দাঁড়াতো আমার সামনে, হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেয়ে। আমি আত্মহত্যা করলে ওর কী হবে? ঐ জীবন সংগ্রামে পরাজিত অকালবৃদ্ধটির?

ক্রমে আমার সন্দেহ হল ওর মস্তিষ্ক বিকৃতির লক্ষণ দেখা যাচ্ছে। রাত্রে ঘুমায় না—ক্রমাগত মাথার চুলগুলো ধরে টানে; সারাদিন আপন মনে বিড়বিড় করে আর সারা রাত বারান্দায় পায়চারি করে। ওর ক্রাচের শব্দ আর কাঠের পায়ের শব্দ আমি সারা রাত শুনতে পাই।

অথচ মজা কী জানেন? পরে ওঁর সঙ্গে কথা বলে জেনেছি—উনি ভাবতেন, উনিই স্বাভাবিক আছেন, আমিই পাগল হয়ে যাচ্ছি। আমি নাকি ভাতের থালা সামনে নিয়ে বসে থাকতাম, সারারাত বিছানায় এ-পাশ ও-পাশ করতাম। কাঁদতাম না কিন্তু দুজনের একজনও। একে অপরের সামনে।

বাবা বললেন, মন্তর নে। মা বললেন—কিচ্ছু ভেব না, ভগবান এক হাতে নেন, আর এক হাতে ফিরিয়ে দেন—আবার কোল-আলো-করা সোনার চাঁদেরা আসবে! ওঁরা জানতেন না, কেউ জানত না—ভগবান যে হাত দিয়ে দান করতে ইচ্ছুক তাঁর সেই বরদামুদ্রার হাতখানা আমরা দুমড়ে-মুচড়ে ভেঙে দিয়েছি!

এক রাত্রের কথা মনে পড়ছে। বাইরে প্রচণ্ড বর্ষণ হচ্ছিল। মাঝ রাত্রে বজ্রপাতের শব্দে ঘুম ভেঙে গেল আমার। উঠে বসে দেখি পাশের বিছানা

boiRboi.net

খালি। দৌড়ে বেরিয়ে এলাম বারান্দায়। দেখি, বারান্দায় ইজিচেয়ারে বসে আছেন উনি।

সর্বাঙ্গ ভিজে শপ্‌শপ্‌ করছে। সান নেই। জেগে বসে আছেন। শূন্য দৃষ্টি ঐ ঘন কালো মেঘের রাজ্যের ওপারে।

হাত ধরে নিয়ে এলাম ঘরে। বসিয়ে দিলাম খাটের উপর। তোয়ালে দিয়ে মাথা-মুখ মুছিয়ে দিলাম। তখনও কোন সান নেই। তখন এক ঝাঁকানি দিয়ে বললাম—তুমি এমন করলে আমি যে পাগল হয়ে যাব। তুমি মনকে শক্ত কর। আমার মুখের দিকে চেয়ে দেখে তুমি শক্ত হও! ভগবান তাদের নিয়েছেন···

লোকটা কী বললে জানেন? দাঁতে দাঁত চেপে বললে, কিন্তু মালতী, ভগবান তো তাদের নেননি!

—ভগবান নেননি? তবে আমার কোল খালি করে ওরা এমন করে চলে গেল কেন?

কথা বলতে পারল না। দাঁত দিয়ে ঠোঁট কামড়ে ধরে হাত দুটো তুলে যেন স্টিয়ারিং ঘোরালো!

বললাম, কী বলতে চাইছ তুমি?

দুহাতে মুখ ঢেকে বলে ওঠে, আমার হাতেই যে স্টিয়ারিং ছিল মালতী—আমিই যে ওদের মেরে ফেললাম! নিজের হাতে নিজের সন্তান!

কুষ্ঠরোগাক্রান্ত যেভাবে হাত দুটো ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখে তেমনিভাবে—

আমি ওর মুখ চেপে ধরলাম, ওগো, তুমি চুপ কর!

কিন্তু কিছুতেই কিছু হল না। ওর বদ্ধমূল ধারণা হয়েছে ও নিজের হাতে নিজের সন্তানদের খুন করেছে। পাগলের খেয়াল! কেমন করে বোঝাই ওকে? ডাক্তার-বদ্যি-সাইকিয়াট্রিস্ট! কত ছোটাছুটি করলাম। কেউই কিছু পথ দেখাতে পারল না।

আমার সে দুঃখের ইতিহাস দীর্ঘতর করে আর কী হবে? শেষ করি বরং এই ক্লান্তিকর বিয়োগান্তক কাহিনী। সব আশা যখন ত্যাগ করেছি তখন আমার পাশের বাড়ির এক মহিলা এসে বললেন, মালতীদি, এক কাজ করবেন? ওঁকে বরং মদনানন্দ মহারাজজীর কাছে নিয়ে যান। কতদিনের কত রোগীকে যে তিনি ভাল করেছেন, তার আর লেখা-জোকা নেই।

ঠাকুর-দেবতায় আমার কোনদিনই বিশ্বাস ছিল না, ওরও নয়। বাবা মন্তর নিতে বলেছিলেন, আমরা দুজনের কেউই রাজি হইনি। কিন্তু এবার রাজি হলাম। প্রতিবেশীর সঙ্গে একদিন গিয়ে দেখে এলাম বাবাজীকে। বহু শিষ্য-শিষ্যা

boiboi.net

পরিবৃত হয়ে বসে ছিলেন তিনি। বয়স বোধকরি পঁয়ত্রিশ-ছত্রিশ হবে। টকটক করছে গায়ের রঙ, মাথায় ঝাঁকড়া চুল—বাবরি নয় কিন্তু। অত্যন্ত সুপুরুষ দেখতে। শিষ্যদের অনেকের মুখেই বাবার অলৌকিক কাহিনী শুনলাম। ভক্তি হল। প্রথম দিন এই পর্যন্ত।

কিন্তু কী অমোঘ আকর্ষণ বাবার। দুদিন পরেই আবার গেলাম তাঁর আশ্রমে। সেদিন লোক ছিল কম! হাতের ইঙ্গিতে আমাকে কাছে ডাকলেন। মাথায় হাত বুলিয়ে বললেন, ভয় নেই। তোর স্বামী ভাল হয়ে যাবে!

আশ্চর্য! কেমন করে উনি জানলেন? আমি তো মুখ ফুটে কিছুই বলিনি ওঁকে। ফিরে এসে সব কথা খুলে বললাম স্বামীকে। শুনে বললেন, দেখতে কেমন?

—দেখতে? অপূর্ব সুন্দর! যাবে দেখতে?

কী যেন ভাবলেন খানিকক্ষণ। তারপর বললেন অপূর্ব সুন্দর! যাব দেখতে! যেন বাবাজীর সৌন্দর্যটাই একমাত্র কথা! পাগল আর কাকে বলে!

দুজনেই যাতায়াত শুরু করলাম আশ্রমে। দীক্ষা নিতে চাইলাম। বললেন, সময় হলে নিজেই দীক্ষা নেবার জন্য ডাকব।

গুরুদেব পুরো আশ্বাস দিলেন। উনি ভালো হয়ে উঠবেন। দুজনকেই আলাদা আলাদা করে সাধন ভজন-শেখান। ওঁরও খুব বিশ্বাস হয়েছে দেখলাম। আমাকে নিজে থেকেই বললেন, বাবা বলেছেন, তোমার বুক জুড়ে আবার সন্তান আসবে।

পাগল মানুষকে কী বলব? বলি, আসবেই তো। আমাকেও তাই বলেছেন।

—বলেছেন? তোমাকেও বলেছেন!—দু-চোখে প্রত্যাশা কাঁপতে থাকে ওঁর।

এ ভাবেই কাটল মাসতিনেক। ওঁকে কী মন্ত্র-তন্ত্র শেখাতেন জানি না, আমাকে ওঁর সাধনকক্ষে বসে জপ করতে বলতেন। আমি একা নই, এমনি আরও তিন-চারটি মেয়ে একসঙ্গে বসে জপ করতাম। একবস্ত্রে। স্নানান্তে। গুরুদেব মাঝে মাঝে এসে আমাদের গায়ে-মাথায় হাত বুলাতেন। সান্ত্বনা দিতেন।

শেষে একদিন গুরুদেব বললেন, আমি দেওঘর চলে যাচ্ছি। আমার আশ্রমে। তোমরা দুজন যদি চাও আমার সঙ্গে যেতে পার। ওঁকে বললাম। উনি বললেন, আলবৎ যাব। যাব না? বাবা যে বলেছেন, আমাকে একেবারে ভাল করে দেবেন। আবার তোমার কোল জুড়ে বিল্টু-মিন্টু-রুমি-ঝুমনিরা সবাই ফিরে আসবে।

দাঁতে দাঁত চেপে বললাম, বেশ, তাহলে সেই ব্যবস্থাই করি।

দেওঘরের আশ্রমে গিয়ে ওঁর শরীরটা ফিরল। জপ-তপ করেন না, তবে ঐ বিড়বিড়ানিটা বন্ধ হয়েছে। রাত জেগে পায়চারিটাও। আমিও ততদিনে

BanglaBook.org

বেশ শান্ত হয়েছি। পূজা-আর্চা কোন কালে করিনি, এখন কিন্তু একনাগাড়ে চার-পাঁচ ঘণ্টা জপ করতে পারি! গুরুদেব মাঝে মাঝে সাধন-কক্ষে আসেন। গায়ে-মাথায় হাত বুলান, সান্ত্বনা দেন। আমার পাপী মন—কেমন যেন সিঁটকে যাই। হোন গুরুদেব, পুরুষমানুষ তো! নির্জনকক্ষে একবস্ত্রে বসে ধ্যান করতে করতে হঠাৎ যখন দেখি উনি একেবারে কাছ ঘেঁসে এসে বসেছেন—পিঠে মাথায় হাত বুলাচ্ছেন তখন আড়ষ্ট হয়ে যাই। মনকে বোঝাই এমন চিন্তা করা পাপ। উনি আমার গুরুদেব! দীক্ষাগুরু নাই হন—আমার স্বামীকে উনিই ক্রমশ সারিয়ে তুলছেন। সাধক মানুষ উনি। জিতেন্দ্রিয়। ওঁর ছোঁয়ায় পাপ হয় না। অন্ধকারে অসতর্ক মুহূর্তে হয়তো দেখতে পাননি—

তারপর একদিন। ডাক্তারবাবু, কী বলব! সেদিন আমার জ্ঞানচক্ষু খুলে গেল। অসময়ে আমি গুরুদেবের ঘরে ঢুকে পড়েছিলাম। আমার ধারণা ছিল গুরুদেব ঘরে নেই। কিন্তু তিনি ছিলেন। একা নয়। আমার মত ওঁর আর এক শিষ্যাও ছিলেন—আমার চেয়ে বয়সে কিছু ছোট। বিধবা মেয়েটি। এই আশ্রমেরই বাসিন্দা!

ঘর ছেড়ে ছুটে বেরিয়ে এসেছিলাম আমি। ওরা ধড়মড়িয়ে উঠে বসেছিল বোধহয়। আমি দেখিনি, দেখতে পাইনি। প্রাণপণে ছুটতে ছুটতে এসে পৌঁছলাম আমার নির্দিষ্ট ঘরে। উনি ঘরেই ছিলেন। একবার ভাবলাম, সব কথা খুলে বলি। কিন্তু মনে হল সেটা ঠিক হবে না। পাগল মানুষটা এতদিন পরে একটা অবলম্বন খুঁজে পেয়েছে—সেই যষ্টিটা তার কেড়ে নেওয়া ঠিক নয়। গুরুদেব যে একটা লম্পট, এই নির্মম সত্যটা ওঁকে জানতে দেওয়া হবে না। বললাম, ওগো শুনছ? আমরা কাল সকালের ট্রেনেই ফিরে যাব।

—কেন? ফিরে যাব কেন? গুরুদেব যে বলেছেন তোমার সাধন-ভজন শেষ হলে তোমার কোলে আবার ছেলে আসবে।

বললাম, আমার সাধন-ভজন শেষ হয়েছে। আমার ছেলে হবে। ভয় নেই তোমার!

—সত্যি! দাঁড়াও তবে গুরুদেবকে শুধিয়ে আসি।

কে রুখবে পাগলটাকে? তখনই ছুটতে ছুটতে চলল সে।

পরদিন কিন্তু আমার ফিরে আসা হল না। ও কিছুতেই রাজী হল না। কী যে হল একেবারে বেঁকে বসল। আবার যেন পাগলামিটা বাড়ছে। বাড়ি ফিরে যাবার কথা বললেই মাথা নাড়ে। বলে, না, যাব না! গুরুদেব বারণ করেছেন।

banglainternet.com

আরও দিন-তিনেক পরে। সন্ধ্যাবেলা। উনি সান্ধ্য ভ্রমণে বেরিয়েছেন। একা বসে ছিলাম আমি। হঠাৎ পড়ন্ত রোদে কার যেন ছায়া পড়ল সামনে। ঘাড় ঘুরিয়ে দেখি গুরুদেব এসেছেন। উঠে দাঁড়াচ্ছিলাম—উনি হাত ধরে বসিয়ে দিলেন। বললেন, বসো মালতী। তোমার সঙ্গে কথা আছে।

বললাম, বলুন। আমারও কিছু জিজ্ঞাসা আছে।

উনি মুখোমুখি বসলেন আমার। বললেন, বল কী বলবে?

—না। আগে আপনি বলুন, কী কথা বলতে এসেছেন।

—বেশ, তাই বলছি। যা বলবার সম্পূর্ণ খোলাখুলি বলব। তোমাকে এখনই জবাব দিতে হবে না। কাল সারাদিন তুমি ভাববে। তারপর কাল সন্ধ্যার পর আমার সাধনকক্ষে গিয়ে জবাব দিয়ে আসবে।

আন্দাজ করতে পারেন ডাক্তারবাবু, উনি কী প্রস্তাব দিয়েছিলেন আমাকে? বোধহয় পারছেন। আপনি বুদ্ধিমান। ঠিকই ধরেছেন। আমার কোলে সন্তান না এলে আমার স্বামীর পাগলামি সারবে না। সুতরাং আমাকে সন্তানবতী হতে হবে। আমার ভয় পাওয়ার কিছু নেই। কাকপক্ষীতে জানে না আমার স্বামী অপারেশন করিয়েছিলেন। এক জানেন উনি নিজে—কিন্তু উনি তো পাগল মানুষ; বিশ্বাস করেছেন যে, গুরুদেবের আশীর্বাদে উনি আবার সন্তানের জনক হতে পারবেন। সেই বিশ্বাস পূর্ণ হলেই উনি আবার স্বাভাবিক হয়ে উঠবেন।

—আমার মনে হল ব্লাউসের ভিতরে পিঠের দিকে একটা সাপ কি বিছে ঢুকে পড়েছে। সমস্ত শরীর মুচড়ে উঠল আমার! এ কী পাষণ্ডের কাছে সান্ত্বনা খুঁজতে এসেছি আমি। উঠে দাঁড়িয়ে পড়লাম। বললাম, মদনবাবু—মাপ করবেন, এর পরে ঐ নামে আপনাকে সম্বোধন না করে পারছি না—আপনি নরকের কীট! নরকে আপনার স্থান হবে না। আমি এখনই, আজ রাত্রেই আপনার আশ্রম ছেড়ে চলে যাব।

উনি হাসলেন, বললেন, উত্তেজিত হয়োনা মালতী। তুমি ইচ্ছা করলেই এ আশ্রম ছেড়ে যেতে পার না—

—পারি না? কে রুখবে আমাকে? আপনি? আপনার শিষ্যরা?

—না, তোমার স্বামী! আমার কথা তার কাছে বেদবাক্য। সেই বাধা দেবে তোমাকে। সামাজিক অধিকার, আইনত অধিকার দুইই তার আছে, যতদিন না আদালতে দাঁড়িয়ে তুমি প্রমাণ করতে পারছ যে, শিবনাথ লোকটি বদ্ধ উন্মাদ।

আমার হাত-পা হিম হয়ে এল। কণ্ঠস্বরে সে-ভাব ধরা পড়ল বোধহয়। বললাম, কত টাকা পেলে আপনি ছেড়ে দেবেন আমাকে? আমার দু-গাছা বালা খুলে দিচ্ছি—

—গুরুপ্রণামী দিতে চাও আমি প্রত্যাখ্যান করবার কে? যা দেবে তা তো আশ্রমকেই দেবে। সে কথা নয়। আমি তো তোমার কাছে টাকা চাইতে আসিনি মালতী!

আমি কেঁদে ফেলেছিলাম।

উনি আমার মাথায় হাত রেখে বললেন, মালতী, কেঁদ না। বিশ্বাস কর, লালসার বশবর্তী হয়ে এ প্রস্তাব করিনি আমি। হঠাৎ কথাটা শুনে তুমি শিউরে উঠেছ; কিন্তু শাস্ত্রে এর বিধান আছে। আমি মদনবাবু নই, রাগ করে তুমি যাই বল —আমি মদনানন্দ মহারাজ হিসাবেই উপদেশ দিচ্ছি তোমাকে—ভেবে দেখ। এ তোমার ভালর জন্যই। মহাভারত পড়নি? অম্বা-অম্বালিকা-অম্বিকার কাহিনী পড়নি তুমি? তোমাকে অন্তত ভয়ে পাণ্ডুবর্ণ হয়ে যেতে হবে না, চোখ বুজে থাকতে হবে না মালতী! সন্তানকে হারিয়েছ—এবার কি স্বামীকেও হারাতে চাও? —না, জবাব দিও না। আজ নয়, কাল জবাব দিও! শয়নারতির পর শিবনাথ ঘুমিয়ে পড়লে আমার ঘরে এসে জবাবটা শুনিয়ে যেও। কাল সারাদিন আমার সঙ্গে দেখা করার চেষ্টা কর না।

উনি আরও কিছু বলতেন হয় তো। কিন্তু বলতে পারলেন না। সেই সময়ে ক্রাচে ভর দিয়ে আমার স্বামী ফিরে এলেন। সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করলেন ঐ মদনবাবুকে। তাও চোখ চেয়ে দেখতে হল আমাকে।

ডাক্তারবাবু! আমার কাহিনী শেষ হয়ে এসেছে। আর বিরক্ত করব না আপনাকে। শেষ দিনের মানসিক যন্ত্রণার কথাটা থাক। আপনি আমাকে ঘৃণা করবেন কি না জানি না। সব কিছু ভেবে চিন্তে আমি রাজী হয়ে গেলাম। রাত্রে ওকে জিজ্ঞাসাও করেছিলাম—খোলাখুলি নয়, ঘুরিয়ে। অনুমতি নিয়েছিলাম আর কি। বললাম, ওগো কাল রাত্রে গুরুদেব আমাকে ওঁর সাধন-কক্ষে যেতে বলেছেন। উনি দীক্ষা দেবেন আমাকে। বলছেন তাহলে আমার কোলে সন্তান আসবে। যাব?

পাগল মানুষটার বোধহয় বোধগম্য হল না সব কথা। কাঠের ক্রাচটা নখ দিয়ে খুঁটতে খুঁটতে বললে, উঁ?

আবার বলতে হল সেই প্রাণান্তকর কথাটা। নির্লজ্জের মত। এবার কথাটা কানে গেল। ঘাড় নেড়ে বললে, যাবে বইকি। না হলে তুমি আবার কোনদিন স্বাভাবিক হতে পারবে না মালতী! তোমার চার-চারটে সন্তানকে যে আমি নিজে হাতে···

আবার সেই স্টিয়ারিং ঘোরাতে শুরু করে।

boiRboi.net

তাড়াতাড়ি থামিয়ে দিয়ে বলি, চুপ কর !

তারপর হু হু করে কেঁদে ফেলি। ওর বুকে মুখ লুকিয়ে বলি, ওগো তুমি এ কী আদেশ করলে আমাকে ! তুমি যে কিছুই বুঝতে পারছ না !

ও বিড়বিড় করতে থাকে !

পরের দিনের কথাটা শুনুন। এটাই আমার কাহিনীর উপসংহার। মদনানন্দের নিষেধ আমি মানিনি। সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনীভূত হতেই আমি চলে গিয়েছিলাম ওঁর সাধন-কক্ষের দিকে। কেন গিয়েছিলাম জানি না। আজ আর মনে পড়ে না। যে ভগবানকে আমি কোনদিন মন দিয়ে ডাকতে পারিনি তিনিই আমাকে নির্দেশ দিয়েছিলেন বোধহয়। অন্ধকার বেশ ঘনিয়ে এসেছে। আশ্রম নির্জন। মদনানন্দ এ সময় একা থাকেন ঘরে। আমি জানতাম। অন্ধকারে ওঁর ঘরের দিকে এগিয়ে যেতেই নজরে পড়ল ঘরে একটা প্রদীপ জ্বলছে। মদনানন্দ ঘরে একা নয়, আরও একজন আছে। নিম্নস্বরে কথা হচ্ছে দুজনে। ফিরে আসছিলাম। হঠাৎ নিজের নামটা কানে যেতেই থমকে দাঁড়িয়ে পড়ি। আবার নিঃসাড়ে সরে আসি রুদ্ধদ্বারের কাছে। তখনই ঘরের দ্বিতীয় মানুষটি কথা বলে উঠল। চমকে উঠলাম আমি। আমার স্বামীর কণ্ঠস্বর। কিন্তু এ কী বলছেন উনি ! এ তো পাগলের কণ্ঠস্বর নয় ! উনি বলছেন, টাকা আমি নগদেই মিটিয়ে দেব—কিন্তু শর্তটা যেন মনে থাকে তোমার ! মালতীর গর্ভে সন্তান এসেছে জানলেই আমরা আশ্রম ছেড়ে চলে যাব। তারপর কোন ছুতোয় যদি তুমি আমার সংসারে আস, বা মালতীকে চিঠিপত্র লেখ তবে জ্যান্ত তোমার পিঠের চামড়া তুলে নেব আমি মনে থাকে যেন !

ঘরের দ্বিতীয় প্রাণীটা মিনমিন করে কী বলল আমার কানে গেল না। আমি একধাক্কায় দরজা খুলে ভিতরে ঢুকলাম। ওরা দুজনেই স্তম্ভিত। উঠে দাঁড়াল দুজনেই। আমি আমার স্বামীকেই শুধু বললাম, ওগো ! তবে তো তুমি পাগল নও। তুমি জেনে-শুনে আমাকে ঐ পিশাচটার হাতে—

আমি পড়ে যাচ্ছিলাম। ও আমাকে বুকে টেনে নিল। বললে, কিন্তু তোমার কোলে সন্তান না এলে তুমি কিছুতেই স্বাভাবিক হতে পারবে না মালতী। তোমার পাগলামি যে তাহলে সারবে না—

আমি চিৎকার করে উঠি, বিশ্বাস কর, আমি স্বাভাবিক। আমি পাগল নই, আমি যে শুধু তোমার মুখ চেয়েই···

ও আমার মাথায় শুধু হাত বুলায় আর অস্ফুটে বিড়বিড় করে, মালতী, আমার মালতী !

boiRboi.net

আমি লুটিয়ে পড়ি ওর পায়ে। বলি, ঘরে ফিরে চল তুমি! কী হবে আমার সন্তানে? তুমিই তো আছ! তোমার পায়ে পড়ি···

আমি লুটিয়ে পড়ি ওর পায়ের উপর।

আমার খেয়াল ছিল না। ওর তো পাই নেই। কাঠের পায়ে মাথা ঠুকে গেল আমার। ও আমাকে ধরে তুলল। বললে, তবে তাই হোক। তোমার জন্য আমি আছি, আমার জন্য তুমি। বাকী জীবনটা কাটিয়ে দেব আমরা ঠিকই। চল, ঘরেই ফেরা যাক।

ডাক্তারবাবু এই আমার সম্পূর্ণ কাহিনী। কিন্তু কেন যে বলতে গেলাম এত কথা? বললাম এজন্য যে, আমার কথাটাও আপনি লিখবেন। আপনি হয়তো বলবেন—তুমি তো বাপু একজন ব্যতিক্রম। চারটি সন্তানের নিঃসন্তান জননী তুমি। অমন দুর্ভাগা তো লাখে একটা হয়।

তাই মেনে নিচ্ছি ডাক্তারবাবু। বেশ, তাই। লাখে একটাই। তা আপনারা ১৯৭৯ সালের মধ্যে তো বাইশ লক্ষ মানুষকে আমার স্বামী শিবনাথের মত করে ছাড়বেন—লাখে একটা হিসাবে বাইশ জনকে তো এই মালতী রায়ে পরিণত করবেন! সেটা যে আমি সহ্য করতে পারছি না ডাক্তারবাবু। তাই অনুরোধ করছি, আমার মত ব্যতিক্রমের কথা আপনারা ভাবুন। ঐ বাইশ লক্ষ শিবনাথ রায়কে অপারেশনের আগে এই মালতী রায়ের কাহিনীটা একবার শোনাবেন। যা ফিরিয়ে দেবার অধিকার আপনাদের নেই তা কেড়ে নেবার অধিকারটাই কি ছাই আছে আপনাদের? আমরা সই দিলেই? আমি আইনের কথা বলছি না। আমার আবেদন আপনাদের বিবেকের কাছে! ভেবে দেখুন! আবার একবার ভেবে দেখুন!

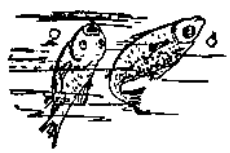

ভদ্রলোকের দৃষ্টিতে কী ছিল? মুগ্ধতা? না তো। লালসা? হিংসা? না তাও নয়। তাহলে? ঘৃণা? তা হতে পারে। কিন্তু অহেতুক অমন একটা বিতৃষ্ণার দৃষ্টি কেন ফুটে উঠল ভদ্রলোকের দৃষ্টিতে? সে তো কিছু অভব্য অশালীন বেশে উপস্থিত

boiRboi.net

হয়নি। হলুদ রঙের শিফনের একটা শাড়ি পরেছে, ঐ রঙেরই ব্লাউস, ঐ রঙেরই চটি। হাতে হলুদ রঙের হাত-বটুয়া, খোঁপায় হলুদ বর্ণের চন্দ্রমল্লিকা। আজ সে আপাদ-মস্তক শিউলিফুলের-বোঁটা! বেশ তো, তাতে কী হল? ভদ্রলোক বোধহয় হলুদ রঙটা বরদাস্ত করতে পারেন না—হলুদে ওঁর অ্যালার্জি! হয়তো জনডিসে ভুগেছিলেন একেকালে, এখনও তাই অবচেতন মনে মাঝে মাঝে সজারুর কাঁটার মত ফুটে ওঠে একটা হরিদ্রাতঙ্ক।

সিঁড়ি দিয়ে দ্বিতলে উঠে এসে ল্যাণ্ডিঙ-এর মুখে দেখা হয়েছিল ভদ্রলোকের সঙ্গে। উনি নামছিলেন। হঠাৎ থমকে থেমে পড়ে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে ওকে এক নজর দেখলেন—যেন ঘৃণায় কুঞ্চিত হয়ে গেল মুখখানা। ও জিজ্ঞাসা করেছিল, ডঃ ত্রিবেদী কোন ঘরে আছেন?

ভদ্রলোক ওর মাথার উপর দিয়ে—না, চোখে-চোখে নয়—তাকিয়ে বললেন, আপনি বোধ হয় ইন্টারভিউ দিতে এসেছেন। যদি তাই হয়, তাহলে ঐ বাঁ-দিকের ঘরে গিয়ে আপনার কার্ডটা দেখান। ওখানে ডঃ ত্রিবেদীর পি. এ. মিস মেহ্‌তা আছেন; তিনিই বলে দেবেন কোন ঘরে আপনার ইন্টারভিউর ব্যবস্থা হয়েছে।

—আপনি বুঝি ডঃ ত্রিবেদীর একজন সহকারী?

—আপনার অনুমান সত্য হলে আপনার বোঝা উচিত, আমার সঙ্গে আলাপ করা নিয়মবিরুদ্ধ কাজ!

ভদ্রলোক দ্বিতীয় বাক্য বিনিময়ের সুযোগ না দিয়ে হন্‌হনিয়ে নেমে যান মেয়েটা শ্রাগ্ করল। ঢুকে গেল বাঁ-দিকের ঘরে।

শর্মাও নেমে এল সিঁড়ি দিয়ে। একতলায় চিহ্নিত ঘরে সে ঢুকে পড়ে! ঘরেরা মাঝখানে একটা অনুচ্চ পার্টিশান দেওয়াল। তার ওপাশে গিয়ে সে বসল নিজের চেয়ারে। ঘড়ির দিকে একবার তাকিয়ে দেখে—আটটা পঞ্চাশ অর্থাৎ প্রথম মহিলার আসতে এখনও দশমিনিট বাকী। শর্মা একটা সিগ্রেট ধরায়। টেনে নেয় অ্যাশট্রেটা। টেবিলের উপর অ্যাশট্রে ছাড়াও আছে ঢাকা দেওয়া এক গ্লাস জল, একপাশে কাঁচের কাগজ-চাপা দেওয়া থান-ছয়েক লম্বা শীট কাগজ—নং ২০৩৭ থেকে ২০৪২ পর্যন্ত। সকাল নটা থেকে একটা—আধঘণ্টা করে ইন্টারভিউ, আর মাঝে দুশ মিনিট করে বিশ্রাম। টেবিলের ও-প্রান্তে একটা ফুলদানী—আহ্! আবার সেই হলুদ রঙের চন্দ্র-মল্লিকা! হঠাৎ যেন ক্ষেপে গেল শর্মা! ফুলদানী থেকে টেনে বার করল ফুলের তোড়াটা। সদ্যস্ফুট একমুঠো জিনেস্থিমাম। ফুলগুলো যেন শিউরে উঠল—ওর পরুষ হাতের পীড়নে। তারা প্রচণ্ডভাবে লুটোপুটি খেতে থাকে। মিনিট দেড়-দুই—দুমড়ানো-মুচড়ানো ফুলের গোছাটা আশ্রয় লাভ করল ছেঁড়া কাগজ ফেলার বেতের

ঝুড়িতে। পা দিয়ে শর্মা ঝুড়িটা ঠেলে দিল টেবিলের নিচে—ওর দৃষ্টিসীমার বাইরে। সিগ্রেটটা তুলে নিল অ্যাশট্রে থেকে। তারপর আরাম করে হেলিয়ে দিল মাথাটা।

হাসল হঠাৎ। আচ্ছা কোন মানে হয়? ফুলগুলোর কী অপরাধ? সংস্কারের কৈঙ্কর্য! ভাবসাযুজ্যের দাসত্ব। যেহেতু ওর জীবনের এক ক্লেদাক্ত অধ্যায়ের সঙ্গে ঐ হলুদ-রঙের চন্দ্রমল্লিকা একবার যুক্ত হয়েছিল তাই দুনিয়ায় যাবতীয় সদ্যফোটা হলুদ-রঙের ক্রিসেন্থিমাম ঘৃণার্হ? যুক্তিবাদী বৈজ্ঞানিক মন সায় দেয় না—কিন্তু মানুষ কি সবসময়ে যুক্তির নির্দেশ মেনে চলে? সংস্কারের কৈঙ্কর্য তার অলিখিত বিধিলিপি।

সিগারেটের রিংগুলো বদ্ধ বাতাসে গোল হয়ে একের পর এক উপরে উঠে যাচ্ছে। সেই দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে তন্ময় হয়ে গেল ত্রিযুগীনারায়ণ শর্মা—মধ্যবয়সী স্ত্রীরোগ-বিশেষজ্ঞ ডাক্তার। জীবনের প্রায় ত্রিশটা বছর পিছিয়ে গেল সে। মনে পড়ল কৈশোর, না কৈশোর নয়, বাল্যকালেরই একটা ঘটনার কথা। তখন ওর বয়স কত? দশ-এগারো হবে। শর্মা ওর বাপ-মায়ের একমাত্র সন্তান। বাপ বিদেশে চাকরি করতেন, মাসে মাসে তাঁর মনি-অর্ডার আসত, আর আসত চিঠি। মাসে তিন-চারখানা। বছরে দু-তিনবার বাড়ি আসতেন তিনি। দশেরায় এবং বড়দিনের সময়। বাপের সাহচর্য সে বড় একটা পায়নি। পেয়েছিল মায়ের সান্নিধ্য। মা-ই ছিল তার খেলার সাথী, প্রাণের বন্ধু। সেই মাকে শর্মা হারালো ঐ এগারো বছর বয়সে—এক ঘুঘুডাকা নিঝুম দুপুরে!

না। মা মারা যায়নি। মা বেঁচে ছিল অনেকদিন। সে কলেজে ঢোকা পর্যন্ত। কিন্তু ঐ এগারো বছর বয়সেই এক মর্মন্তুদ দুর্ঘটনায় দ্বিতীয়বার মায়ের সঙ্গে নাড়ির যোগ ছিন্ন হয়েছিল শর্মার। মনে আছে ঘটনাটা স্পষ্ট···

হঠাৎ কী-একটা কারণে অপ্রত্যাশিতভাবে হাফ-হলিডে হয়ে গেল স্কুলে। বন্ধুরা বললে, চল, শর্মা ক্রিকেট খেলি। ও রাজী হল না। বললে, বাড়ি যাবে সে। একজন উঁচু ক্লাসের ছেলে এসে ওর গালটা টিপে দিয়ে বলেছিল—ষাট, ষাট! বাছারে! মায়ের জন্য মন কেমন কচ্ছে বুঝি? যাও বাছা বাড়ি যাও—ডুডু খাওগে, মায়ের বুকে মুখ লুকিয়ে। ছেলেটা ওর চেয়ে বয়সে বড়, গায়েও তার জোর বেশি। তবু শর্মা মায়ের অপমান সহ্য করেনি। আচমকা ঝাঁপিয়ে পড়েছিল তার উপর। তারপর যা আশঙ্কা করা গিয়েছিল। জামাটা ছিঁড়ে ফাৎলাফাই, হাঁটুর কাছটা ছড়ে গেছে, একটা চোখে কালশিটে পড়েছে। তবু শর্মার দুঃখ নেই। সে মুখ বুজে মায়ের অপমান সহ্য করেনি। ব্যাগটা কাঁধে ঝুলিয়ে বাড়ির পথে রওনা হয়েছিল।

সদর দরজা বন্ধ। ভিতর থেকে। কড়া নাড়তে সাহস হল না বেচারির।

boiRboi.net

আগে লুকিয়ে জামাটা ছাড়তে হবে, হাঁটুর রক্তটা মুছে ফেলতে হবে, গায়ের ধুলো সাফ করতে হবে। মা এ সময় ঘুমায়—শর্মা জানে। আরও জানে পিছনের পাঁচিল টপকিয়ে উঠানে ঢোকার পথটা। বাইরে একটা কল আছে, যেখানে ঝি বাসন মাজে। ঐ কলেই হাত-মুখ ধুয়ে নেবে আগে।

সে কথা সেই কাজ। পাঁচিল ডিঙিয়ে এগারো বছরের ছেলেটি বাড়ির পিছন দিকের উঠানে নামে। মায়ের ঘরের জানলাগুলো ভিতর থেকে বন্ধ। শর্মা নিশ্চিন্ত হতে চাইল—মা ঘুমাচ্ছে তো? কলের জলের শব্দে তার ঘুম ভেঙে যাবে না তো! সন্তর্পণে পা টিপে টিপে সে এগিয়ে এল জানলার নিচে। অতি সন্তর্পণে খড়খড়ি-জানলার একটি পাখি উঁচু করে ভিতরে দৃষ্টিপাত করল!

…ঠিক সেই মুহূর্তেই ওর জীবনে মায়ের মৃত্যু হল। মায়ের খাটে, মায়ের মুখোমুখি হয়ে যে লোকটা বসে আছে সে ওর বাবা নয়! ওর মা ছিল চিৎ হয়ে শুয়ে, তার মাথার খোঁপায় গোঁজা আছে একটা চন্দ্রমল্লিকা, আর সব চেয়ে বীভৎস ব্যাপার…

আঃ ত্রিশ বছরেও ছবিটা মুছে যায়নি! কিছুতেই ভুলতে পারে না শর্মা! কত কী তো ভুলে গেছে—এককালে সংস্কৃত শব্দরূপ-ধাতুরূপ মুখস্থ করেছিল, তার তো কিছু মনে পড়ে না, অথচ ঐ ছবিটা কিছুতেই মোছা যায় না কেন? না, কিছুতেই ভুলতে পারেনি! মনের অগোচর পাপ নেই—ঐ ঘটনায় তার বালক মনে যে কী প্রচণ্ড প্রতিক্রিয়া ঘটেছিল তা সে নিজেই জানত না। ছবিটা যেন জলজন্তুর মত বুড়বুড়ি কাটতে কাটতে ওর চেতন মনে ভেসে উঠতে চাইত—আর বালক শর্মা, কিশোর শর্মা, যুবক শর্মা একটা লগি হাতে ক্রমাগত সেটাকে পিটিয়ে ঠেশে ধরত মনের তলায়। একদিকে ওর জাগ্রত শুভবুদ্ধির লগির খোঁচা, অপর দিকে বালক মনের অবচেতনের প্রতিক্রিয়ার 'বয়্যান্সি'—কে হারে, কে জেতে? শেষ পর্যন্ত সেই নাংকীয় ঘটনাটার প্রতিক্রিয়াই জয়ী হয়েছিল—সেটা টের পায় পরিণত বয়সে। একটি মর্মান্তিক মুহূর্তে। একটি নার্সের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা হয়েছিল—ঠিক সেদিন যেভাবে গল্প করছিলেন আয়াঙ্গার সাহেব। শর্মা কিন্তু ফুলে ফুলে মধু খেতে চায়নি। সে নার্সটিকে ভালবেসে বিয়েই করতে চেয়েছিল। 'প্রপোজ' করেছিল; সে প্রস্তাব গৃহীতও হয়েছিল। তারপর এক চরমতম মুহূর্তেই জলজন্তুটা এসে আঘাত করল ওর মনে। ওর সঙ্গিনী যখন আসন্ন কালবৈশাখীর প্রত্যাশায় আমলকি পাতার মত কেঁপে কেঁপে উঠছে,—ঠিক তখনই সেই চিৎ হয়ে শুয়ে থাকা বান্ধবীর সর্বাবয়বে শর্মা পরিস্ফুটিত হতে দেখেছিল ওর মায়ের সেই আলেখ্য—সিনেমায় দেখা যেন সুপার-ইম্পোজ ছবি! দেখতে পেয়েছিল নিরাবরণ মাকেই!

banglainternet.com

আর্তনাদ করে উঠেছিল শর্মা! ছিটকে সরে এসেছিল। প্যান্টের বোতাম আঁটতে আঁটতে বাইরে—রাস্তায়। বান্ধবীকে বলতেই পারেনি তার মনোবিকলনের লজ্জাকর ইতিহাস। সেই প্রথম, সেই শেষ। শর্মা আজ তাই কনফার্মড ব্যাচিলার···

হঠাৎ চমকে ওঠে একটি নারীকণ্ঠের প্রশ্নে, এক্সকিউজ মি! আপনি কি ওদিকে বসে আছেন?

সম্বিত ফিরে পায় শর্মা। নটা বেজে এক হয়েছে। প্রশ্নটা এসেছে পার্টিশান দেওয়ালের ওপার থেকে। কাগজ-চাপার তলা থেকে প্রথম শীটখানা টেনে নিয়ে বলে: সুপ্রভাত! আপনি নিশ্চয় মিসেস ২০৩৭?

—হ্যাঁ। আপনার প্রশ্নবাণে বিদ্ধ হবার আশঙ্কায় প্রহর গুণছি!

—আপনার বয়স?

সেই বৈচিত্র্যহীন ক্লান্তিকর ইতিহাস। যার আদিও নেই অন্তও নেই। এ কী বিড়ম্বনার চাকরি নিয়েছে শর্মা? কী লাভ হবে অযুত-নিযুত মহিলার যৌন-জীবনের ইতিকথা সংকলন করে? সব মেয়েই তো শেষমেশ সেই কুন্তি।

২০৩৭-এর বর্তমান বয়স ঊনত্রিশ। বিবাহ হয়েছিল একুশ বছরে। বি. এ. পাশ। ওরা ছিল তিন ভাই, দুই বোন। বাপ উচ্চবিত্তের। স্বামীর মাসিক আয় সত্তের শ টাকা। ধর্মে হিন্দু। না পূজা-আর্চা করে না। ওসব বাতিক নেই। ওর কর্তারও নেই। একটি মাত্র সন্তান। পুত্র। তার বয়স সাত। বিয়ের বছরেই তার জন্ম। তারপর আর হয়নি। হ্যাঁ, জন্মনিয়ন্ত্রণ করে। ওর‍্যাল-পিল। না, অন্য কোন কিছু চেষ্টা করে দেখেনি। কেন?

—কেন বোঝাতে হলে অনেক কথা বলতে হয়। সব চেয়ে বড় কারণ আমার স্বামী এতে রাজী নন। তিনি আরও সন্তান চান। আমি চাই না তাই।

—আপনি যে ওর‍্যাল-ট্যাবলেট খান তা আপনার স্বামী জানেন না?

—না।

—এই দীর্ঘ সাত-আট বছর ধরে তিনি টের পাননি?

—তাই তো বলছি আপনাকে। আমিই কিনে আনি, লুকিয়ে খাই।

শর্মা প্রশ্ন করে, কেন সন্তান চান না আপনি? একটি মাত্র সন্তান নিয়েই আপনি সন্তুষ্ট থাকতে চান?

—তাই চাই।

—প্রথমবার সন্তান হতে কি খুব কষ্ট পেয়েছিলেন? অস্বাভাবিক কোন কিছু···

boiRboi.net

বাধা দিয়ে মেয়েটি বললে, না। স্বাভাবিক ভাবেই হয়েছিল। সে জন্য নয়। আমার বিশ্বাস সন্তান হলে আমার শরীর ঢিলে হয়ে যাবে, আমি বুড়িয়ে যাব—

শর্মার ইচ্ছে করছিল এক টানে পর্দাটা সরিয়ে দেয়। তারপর ঐ মেয়েটির মুখোমুখি দাঁড়িয়ে বলে, মহাশয়া, সন্তান না হলেও একদিন আপনার শরীর ঢিলে হয়ে যাবে, আপনি বুড়িয়ে যাবেন। ত ন মাথা খুঁড়লেও আর একটি সন্তানকে পাবেন না আপনি। সে ইচ্ছা পূরণ হল না তার। প্রসঙ্গান্তরে আসতে হল। তালিকা ধরে। অবশ্য এ-ক্ষেত্রে আপনা থেকেই তালিকা সংক্ষিপ্ত হয়ে গেছে। মেয়েটি ওর‍্যাল পিল ছাড়া আর কিছু পরখ করেই দেখেনি—অন্যান্য পদ্ধতির সুবিধা-অসুবিধার কথা সে কী জানে? শর্মা এবার তৃতীয় পর্যায়ের প্রশ্নাবলীতে এসে পৌছায়—

—প্রাকবিবাহ অথবা বিবাহোত্তর জীবনে স্বামী ভিন্ন অন্য কোন পুরুষের দৈহিক নিবিড় সান্নিধ্যে আসার অভিজ্ঞতা আপনার আছে?

প্রশ্নটি পেশ করতে করতেই শর্মা জবাবের ছোট্ট খোপে একটি চিহ্ন বসিয়ে দিয়েছিল। সাঙ্কেতিক চিহ্নটি ডিসাইফার করলে অর্থ দাঁড়াবে—'না'। সংখ্যাতত্ত্ব ওর মুখস্থ। এ প্রশ্নে শতকরা ৯৭·৬ ভাগ জবাব এ পর্যন্ত হয়েছে 'না'। লালগড়ের সমীক্ষা শুরু হবার আগে পর্যন্ত। অবশ্য শর্মার ধারণা ঐ ৯৭·৬ শতাংশের ভিতর আবার ৯৭·৬ শতাংশ তাহা মিথ্যা কথা বলেছেন! তাঁদের উত্তর হওয়া উচিত ছিল 'হ্যাঁ'! তাঁরা সেটা স্বীকার পাননি। যতই পর্দা টাঙাও আর পরিচয় গোপন কর—ও বিষয়ে পেটে বোমা মারলেও সত্যি কথাটা বলবে না ঐ হারামজাদীরা! কুত্তির দল!

চমকে উঠল মেয়েটির কণ্ঠস্বরে, আছে!

লে হালুয়া! এ যে দেখা যাচ্ছে ঐ ২·৪ শতাংশের এক বিরল ভাগিদার। শর্মার ইচ্ছে হল তালিকা-বহির্ভূত পরবর্তী প্রশ্নটায় জানতে চায়, মহাশয়াই কি সত্যকাম-জননী জবালা?

ইরেজার দিয়ে ঘষে ঘষে 'না'-কে তুলে 'হাঁ' করল। তারপর প্রশ্ন করল, প্রাকবিবাহ জীবনে না বিবাহোত্তর জীবনে?

—বিয়ের পরে!

—কতদিন পরে?

—কতদিন পরে? তা ধরুন বছর আষ্টেক—

—আট বছর! আপনার বিয়েই তো হয়েছে বলছেন আট বছর?

boiRboi.net

—তাতে কী ?

তাই তো ! তাতে কী ? অঙ্কের হিসাব। অর্থাৎ মেয়েটি বলতে চায় বিয়ের আট বছর পরে স্বামী ভিন্ন অন্য পুরুষের···দাঁড়াও, দাঁড়াও ! ওর ছেলের বয়স এখন কত ? সাত-আট। তার মানে শর্মার জীবনে যখন এই জাতের দুর্ঘটনা ঘটেছিল তখন ও আরও বছর তিনেকের বছর ছিল। ঠিক একই রকম মোড় নিচ্ছে কিন্তু কাহিনীটা। তালিকা-বহির্ভূত আর একটি প্রশ্নবাণ নিক্ষেপ করে বসে শর্মা, আপনার স্বামী বোধহয় এখন লালগড়ে থাকেন না ?

—কে বললে ? ও তো এখানেই আছে !

আত্মসম্বরণ করতে পারল না শর্মা। দাঁতে দাঁত চেপেও মনোভাবটা বুকের পাঁজরায় আটকে রাখতে পারল না। অস্ফুট ওষ্ঠাধর উচ্চারণ করল, কুত্তি !

পর্দার ওপাশ থেকে ভেসে এল প্রশ্ন, বেগ্, য়োর পার্ডন ? 'কুত্তিন' অর্থ ?

মরমে মরে যায় শর্মা। রুমাল দিয়ে এই ডিসেম্বরের শীতে ফুটে ওঠা কপালের ঘামটা মুছে নিয়ে বললে, 'কুত্তিন' নয় আমি বলছি 'কিৎনি দিন' ?

মেয়েটি ইংরেজিতে বললে, আপনার মাতৃভাষা বোধহয় হিন্দুস্থানী নয়, আপনি ইংরেজিতেই প্রশ্ন করুন—'কিৎনি দিন' অশুদ্ধ হিন্দি।···হ্যাঁ, আপনার প্রশ্নের জবাব —মাস-তিনেক।

—শেষ কবে তার সঙ্গে আপনার সাক্ষাৎ হয়েছে ?

—গতকাল দুপুরে।

দুপুরে ! অর্থাৎ স্বামী অফিসে। ছেলে স্কুলে। কিন্তু ওর ছেলের তো হঠাৎ হাফ-হলিডে হয়ে যেতে পারত ? মারামারি করে রক্তমাখা দেহে সে তো বাড়ি ফিরে আসতে পারত ? তারপর পিছনের পাঁচিল ডিঙিয়ে···কিন্তু সে তো এগারো বছরের ছেলে নয়, মাত্র সাত বছরের বাচ্চা। জানলার পাখি খুলে ভিতরে দৃক্‌পাত করলে সে কি কিছু বুঝতে পারত ? তার মানসপটেও কি ছবিটা অমনি ভাবে পাথরে খোদাই করা হয়ে থাকত ? সেও কি পরিণত বয়সে লীলাসঙ্গিনীর দেহে মাতৃমূর্তিটা—

—আপনি আর কিছু প্রশ্ন করবেন ?

—ও হ্যাঁ, মাপ করবেন। আচ্ছা এবার বলুন—আপনার স্বামী কি এ বিষয়ে কিছুই সন্দেহ করেননি ; না কি আন্দাজ করেছেন, অথবা জানেন কিন্তু স্বীকার করছেন না, কিংবা জানেন এবং প্রকাশ্যে অনুযোগও করেছেন ?

মেয়েটি রীতিমত বিচলিত হয়ে বলে ওঠে, হাউ হরিবল্ ! না, না, যশ্, এর বিন্দুবিসর্গও জানে না, আন্দাজ করেনি।

boiRboi.net

যশ্। ওর স্বামীর ডাক নাম 'যশ্'। 'যশুয়া' হিন্দুর নাম হবে না, যশোদানন্দন, যশোদা দুলাল, বা ঐ জাতীয় কিছু হবে। শর্মা কাগজটার এক কোণায় সাঙ্কেতিক ভাষায় শুধু লিখল : যশ। স্বামীর ডাক নাম। তারপর বললে, মিসেস ২০৩১, এবার দয়া করে বলুন—স্বামীর সান্নিধ্য নিত্য পাওয়া সত্ত্বেও কেন আপনি ওঁকে—আই মীন, এ ঘটনার মূল কারণটা কী? আপনি কি স্বামীকে নিয়ে সুখী নন, তিনি কি আপনার ক্ষুধা মিটিয়ে দিতে অক্ষম? তাঁর সঙ্গে কি আপনার মতের অমিল হচ্ছিল? অথবা ঐ অপর লোকটি আপনাকে সম্মোহিত করেছে, বা—

মেয়েটি অসহিষ্ণু হয়ে প্রতিপ্রশ্ন করে, এসব কি জন্মনিয়ন্ত্রণের প্রাসঙ্গিক প্রশ্ন?

—আপনি যদি জবাব না দিতে চান, তবে বলবেন 'জবাব নেই'।

—তাই বলছি অগত্যা—'জবাব নেই'।

শর্মা মনে মনে বললে, কুত্তি! আমার কাছে নেই, কিন্তু তোমার বিবেকের কাছে? তোমার পুত্রের কাছে? একদিন মৃত্যুশয্যায় তুমিও তাকে টেলিগ্রাম পাঠিয়ে ডেকে পাঠাবে, আর সে আসবে না—তা জান? টেলিগ্রামখানা হাতে নিয়ে সে বেনারসের গঙ্গার ঘাটে ঘাটে সারারাত কেঁদে বেড়াবে তবু তোমার মৃত্যু-শয্যার পাশে এসে দাঁড়াবে না! তা জান? তারপর সেই ছেলে যখন আবার টেলিগ্রাফ পাবে—'মায়ের মৃতদেহের সৎকার করে যাও' তখন সে আসবে। তোমার আজকের ঐ সাতবছরের একফোঁটা ছেলেটা। তুমি তখন চিৎ হয়ে পড়ে আছ! তোমার কোন সান নেই। এ দুনিয়ার ভাল-মন্দ, আলো-কালো সব তোমার কাছে সমান হয়ে গেছে। তখন সেই সাত বছরের ছেলেটা বাইশ বছরের জোয়ান হয়ে ফিরে আসবে। তোমার মরা বুকে মুখ ঘষতে ঘষতে বলবে—মা! মাগো! এ তুই কী করলি মা! তুই নিজেও মরলি, আমাকেও মেরে গেলি! তারপর সাদা চাদরখানা টেনে দেবে তোমার মুখের উপর।

—এক্সকিউজ মি ডক্টর! আপনি আর কিছু প্রশ্ন করবেন কি?

—নো থ্যাংকস্। য়ু মে গো নাউ—টু য়োর ড্যামড্ প্যারামোর।

গন্তব্যস্থল নির্দেশক শেষ শব্দগুলি অবশ্য শর্মা বলল মনে মনে।

boiRboi.net

করবী সাবধানী। একা থাকে। সদর দরজায় তাই ম্যাজিক-আই লাগিয়েছে। কলিং বেল-এর সঙ্কেতধ্বনি শুনে তাই এগিয়ে এসে ছিদ্রপথে উঁকি দেয়। না, অপরিচিত আগন্তুক নয়। এসেছেন সাহিত্যিক নীরদ মুস্তাফি, যদিও তাঁর পাশে দাঁড়িয়ে আছেন একজন অপরিচিত ভদ্রলোক। দরজা খুলে দেয়, বলে, আসুন মিস্টার মুস্তাফি—

—আজ আমি একা আসিনি, এসেছি সবান্ধবে।

করবী যুক্তকর বুকের কাছে তুলে বললে, সে তো আরও আনন্দের কথা।

মুস্তাফির পিছনে দাঁড়ানো ভদ্রলোক প্রতিনমস্কার করলেন স্মিত হাস্যে। বছর-ত্রিশ-বত্রিশ বয়স হবে, এসেছেন ধুতি-পাঞ্জাবির উপর শাল চড়িয়ে। কাঁধে ক্যামেরা। চোখে চশমা।

দুজনকে নিয়ে এসে বসায় ড্রইংরুমে। মুস্তাফি পরিচয় করিয়ে দেন, অলক রায়, গেস্ট-হাউসে আছেন ডঃ মজুমদার, তাঁর বন্ধু। কদিনের জন্য লালগড়ে এসেছেন। আপনার সঙ্গে আলাপ করতে ইচ্ছুক। ধরে নিয়ে এলাম।

করবী ভদ্রলোককে প্রশ্ন করে, লালগড়ে কি কাজে, না বেড়াতে?

—রথ দেখতে দেখতে কলা বেচা আর কি!

—উঠেছেন কোথায়? কারও বাড়িতে?

—না, আপ্যায়নে।

মুস্তাফি বলেন, অলকবাবু রথ দেখতে চান দেখুন, আমি কিন্তু আজ এসেছি নিছক কলা বেচতে; নিতান্ত কেজো ভূমিকায়। শোন করবী, অলকবাবু ভালো ফটো তোলেন। সে কথা শুনে আমিই ওঁকে ধরে এনেছি। তোমার খানকয় ফটো নেব। জিতেন্দ্রনাথের ভাল ফটো পেয়েছি, কিন্তু ব্লক বানানোর উপযুক্ত তোমার ফটো পাইনি একখানাও—

করবী প্রতিবাদ করে, না না, আমার ফটো ছাপবার কী দরকার?

অলক এতক্ষণ খুঁটিয়ে দেখছিল মেয়েটিকে। ভেবেছিল, মেয়েটিকে দেখলেই ওর দুরন্ত কৌতূহলটার নিবৃত্তি হবে—হ'ল উল্টো ফল। কৌতূহল ওর উত্তরোত্তর বেড়েই চলেছে। আশ্চর্য! এ মেয়েটির সত্যস্বরূপ কী? এই বৈকালিক পরিবেশে মেয়েটি প্রসাধন করেছে বলে মনে হচ্ছে না। সরু পাড় একখানা তাঁতের সাধারণ শাড়ি, সাধারণ করে পরা, ডান হাত নিরলঙ্কার, বাঁ-হাতের মণিবন্ধে হাত-ঘড়ি; দু-হাতে একটিও আংটি নেই, কানে মুক্তোর দুল, গলায় এক চিলতে একটি মফচেন। ঠোঁটে নেই লিপস্টিক, চোখে নেই কাজল, পাউডার মেখেছে

boiRboi.net

কি না বোঝা যায় না। তবু অদ্ভুত একটা বিষণ্ণ স্নিগ্ধতা ওকে ঘিরে আছে। যৌবন মধ্যাহ্নে যে মেয়ে নিঃসঙ্গ তার শুচিশুভ্র পবিত্রতাই যেন ফুটে উঠেছে ওর সাজ-পোশাকে, ভাবে-ভঙ্গিমায়। কে বলবে এই মেয়েই বলতে পারে—অনুতপ্ত হবার কী আছে? আমরা দুজনেই তো ওটা চেয়েছিলাম—

মুস্তাফি বললেন, দরকার আছে কি নেই সেটা আমরা বুঝব। তোমার আপত্তি কিসের?

করবী জবাব দেবার আগেই অলক বলে ওঠে, নীরদবাবুকেই···মিস্টার মুস্তাফি, আপত্তি ওঁর অনেক কারণে হতে পারে। প্রথমত আমি যে ছবি তুলব সেটা ছাপার যোগ্য না হতে পারে, দ্বিতীয়ত—

করবী বাধা দিয়ে বলে ওঠে, সেজন্য নয়—

অলকও বাধা দিয়ে বলে, আমার কথাটা শেষ হয়নি করবী দেবী। আমার বক্তব্য ছবি ছাপাতে আপনার আপত্তি আছে কি না সে প্রসঙ্গটাই আপাতত মূলতুবি থাক না। ছবি তুলতে তো আপত্তি নেই? ছবিটা তুলি, ডেভেলপ করি, প্রিন্ট করি, আপনাকে দেখাই—তখন যদি আপনি আপত্তি করেন, করবেন।

করবী বললে, ঐ পোজ মেরে ছবি তুলতে আমার বিশ্রী লাগে।

—আমি তো আপনাকে পোজ দিয়ে বসতে বলিনি। আপনারা দুজনে কথা বলবেন আমি ঘরের এ-প্রান্ত ও-প্রান্ত থেকে আপনাদের না জানিয়েই ছবি তুলব—

এর জবাবে করবী যা বলল তা নিতান্ত অপ্রাসঙ্গিক! বললে, আপনাকে কোথায় দেখেছি বলুন তো?

অলক আকাশ থেকে পড়ে, আমাকে? অসম্ভব! আপনি আমাকে দেখলে আমিও আপনাকে নিশ্চয় দেখতাম। আমার চেহারা অত্যন্ত সাধারণ, তবু আপনার মনে থাকল; অথচ আপনার চেহারা অত্যন্ত অসাধারণ, আমার মনে থাকবে না?

নীরদবাবু বলেন, বেশ ঘুরিয়ে কম্‌প্লিমেন্টস্ দিচ্ছেন তো অলকবাবু?

—কম্‌প্লিমেন্টস্! আদৌ নয়। আমি সেল্‌ফ্ ডিফেন্সে লড়ছি। আমার স্মৃতিশক্তির উপর করবী দেবী কটাক্ষপাত করছেন—

করবী বললে, না—কী জানি—আপনার কণ্ঠস্বরটা খুব চেনা-চেনা লাগছে।

শীতের মধ্যেও অলক ঘামতে শুরু করে। তাড়াতাড়ি প্রসঙ্গটা বদলাবার জন্য বলে, যাই হোক, উইথ য়োর পার্মিশান, আমি ক্যামেরা রেডি করছি।

প্রায় ঘণ্টাখানেক আলোচনা হল। ইতিমধ্যে, মুন্নির-মা এসে গেছে। সে কফি করে আনল। অলক একাধিক স্ন্যাপ-শট নিল। ঘরে আলো ছিল কম, তাতে অসুবিধা হয়নি। ওর ক্যামেরায় ফ্ল্যাশ অ্যাটাচমেন্ট আছে। নীরদ করবীর

boiRboi.net

আলাপচারি তাই মাঝে মাঝে ঝলমলিয়ে উঠল। দিনের আলো যখন মিলিয়ে এল, অন্ধকার ঘনালো, লালগড় থেকে বিতাড়িত শিবাকুল দূর জঙ্গলের দিক থেকে প্রাত্যহিক সান্ধ্য প্রতিবাদ জানালো, তখন নীরদবাবু উঠলেন, বললেন, এবার আমাকে উঠতে হয়। আজ রাত্রে জি. এম.-এর বাড়ি ডিনারের নিমন্ত্রণ আছে।

অলকও উঠে দাঁড়িয়েছিল। করবী বলল, আপনারও নিমন্ত্রণ আছে নাকি ওখানে ?

—না! আমার কোন তাড়া নেই। হোটেলে ফিরে গিয়ে পুরানো ম্যাগাজিনের পাতা ওল্টাবো।

—তাহলে আপনি আরও একটু বসে যান না—

অগত্যা। নীরদবাবু বিদায় হলেন। তাঁকে দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে ফিরে এসে করবী মুখোমুখি বসল। বললে, অলকবাবু আপনাকে আটকে রাখার একটা বিশেষ কারণ আছে। কথাটা আমি নীরদবাবুর সামনে বলতে চাইনি—

—বলুন ?

—আমি খুশী হব যদি আপনার ক্যামেরায় আজ কোন ছবি না ওঠে, যদি কোন দুর্ঘটনায় আপনার এক্সপোজড ফিল্মটা আলো লেগে সাদা হয়ে যায়।

অলক একটি সিগারেট ধরায়। বলে, কেন বলুন তো ?

—নীরদবাবু কাল-পশু ফিরে যাবেন। আপনি আমাকে সাহায্য করলে উনি আমার কোন ছবি আদৌ পাবেন না। ফলে আমার স্বামীর জীবনীতে আমার কোন ছবি ছাপানো যাবে না। সেটাই আমি চাই।

অলক পুনরায় একই প্রশ্ন করে, কিন্তু কেন বলুন তো ?

করবী জবাব দেয় না। নতনেত্রে নখ খুঁটতে থাকে। মুন্নির-মা এসে দাঁড়ায়। জানায়, তার ঘরের কাজ শেষ হয়েছে। বাড়ি যাবে কিনা জানতে চায়। করবী বলে, আর একটু থেকে যা মুন্নির-মা, কথা আছে তোর সঙ্গে—

মুন্নির মা বুদ্ধিমতী। সে বুঝতে পারে প্রয়োজনটা। ঐ বাবু বিদায় হওয়া পর্যন্ত তাকে অপেক্ষা করতে হবে। করবী অলককে বলে, আর এক কাপ কফি খাবেন?

অলক হেসে বলে, সেটা নির্ভর করছে আমার আগের প্রশ্নটির জবাব আপনি দেবেন কি না তার উপর।

—বুঝলাম না !

—আপনি যদি রহস্যটা পরিষ্কার করে দিতে রাজী থাকেন, তাহলে আমিও আর এক কাপ কফি খেতে রাজী। না হলে নয়। আমার আশঙ্কা হচ্ছে এমনিতেই আজ ঘুম আসতে চাইবে না—তার উপর যদি আপনি রহস্যটা···

boiRboi.net

জলতরঙ্গের শব্দ যেন। করবী খিলখিলিয়ে হেসে ওঠে। বলে, ও বাবা, এতটা? বেশ। তাতেই রাজী। যা মুন্নির-মা, আর দু-কাপ কফি বানা—

মুন্নির-মা অন্তর্হিত হতেই অলক তাগাদা দেয়, এবার বলুন—ছবি ছাপাতে এত আপত্তি কেন আপনার?

জবাবে এক নিঃশ্বাসে অনেকগুলো কথা বলে গেল করবী, একটা কথা আপনারা বুঝতে চাইছেন না। জিতেন্দ্রনাথকে আপনারা শহীদ বানাতে চান বানান, সেই সঙ্গে আমাকে কেন তার সঙ্গে বেঁধে ফেলছেন? আমি তাঁকে ভালবেসেছিলাম, তাঁকে বিয়ে করেছিলাম, সবই মানছি। কিন্তু এমন কী মানে আছে যে, বাকি জীবন সেই পরিচয় বহন করেই কাটাতে হবে আমাকে? আমার নিজস্ব ব্যক্তিসত্তা বলে কিছু থাকতে নেই? ধরুন কথার কথা—আমি যদি আবার বিয়ে করতে চাই, আপনারা আপত্তি করবেন?

—নিশ্চয় নয়। শহীদ কেনেডির স্ত্রীকে গোটা আমেরিকা যদি মুক্তি দিয়ে থাকতে পারে, তবে লালগড়ও পারবে আপনার ক্ষেত্রে—

—তখন ঐ ছাপানো বইটা আমাকে প্রতিদিন খোঁচা দেবে না?

—আমি এদিক দিয়ে জিনিসটা ভেবে দেখিনি। আমি আপনার সঙ্গে একমত। তবে সে জন্য এক্সপোজড ফিল্মটাকে নষ্ট করার দরকার নেই। ছবিগুলি আপনাকে পাঠিয়ে দেব; আপনার আপত্তি না থাকলে আমার অ্যালবামেও এক কপি করে থাকবে। আর কেউ জানবে না।

—আমি তাতে রাজী। আপনার তোলা ফটো আপনার অ্যালবামে রাখতে আমার আপত্তি হতেই পারে না।

—আচ্ছা, আপনার ভাল ফটো কি সত্যিই নেই? একখানাও?

—কেন থাকবে না? অসংখ্য আছে। দাঁড়ান দেখাই—

করবী শোবার ঘর থেকে একটি অ্যালবাম নিয়ে এল। মুখোমুখি একই অ্যালবামের ছবি দেখতে হলে একজনকে শির-পা ছবি দেখতে হয়; তাই করবী এসে বসল ওর পাশে—একই সোফায়। অলকের এতক্ষণে মনে হল—না মেয়েটি একেবারে প্রসাধন যে না করেছে তা নয়; স্নো-পাউডার লিপস্টিক হয়তো মাখেনি—কিন্তু ওর সান্নিধ্যে এসে এখন একটা মৃদু সৌরভ ওর ঘ্রাণে সাড়া জাগালো। অ্যালবাম ভর্তি ছবি। অধিকাংশই করবীর। এ বাড়ির, এ বাগানের, লালগড়ের বিভিন্ন দ্রষ্টব্য দৃশ্যকে পশ্চাদপটে রেখে দাঁড়ানো করবীর। পাগলা-ঝোরার অনেকগুলি দৃশ্য। একটা অদ্ভুত ছবি আছে তার ভিতর। কেন্দ্রিং-এর সামনে দাঁড়িয়ে

boiRboi.net

আছে করবী। তার সামনে, রেলিং-এর ওপাশে—হাতখানেক দূরত্বে অতলস্পর্শী খাড়া খাদ। অলক বললে, এটাও কি ঐ পাগলা-ঝোরায় তোলা ?

—হ্যাঁ। কর্তৃপক্ষ ঐ জায়গাটার নাম দিয়েছেন 'ঈগল্‌স্-নেস্ট'; যদিও এ অঞ্চলে সবাই ওটাকে বলে 'সুইসাইড স্পট'।

—সর্বনাশ! অমন মনোরম একটি পিকনিক স্পটের এমন অদ্ভুত নাম ?

—এ পর্যন্ত—আমার জানা চারটি সুইসাইড কেস হয়েছে ঐখানে। লালগড়ের ব্যর্থ প্রেমিক বিষ খায় না, গলায় দড়ি দেয় না, সোজা চলে যায় পাগলা ঝোরায়। বাসে যেতে একটাকা পঁচিশ নয়া পয়সা। লালগড়ে তাই সবাই বলে—পাগলা ঝোরাকে পাঁচসিকের পুজো দাও বাবা, সব জ্বালা যন্ত্রণা মিটবে।

অলক বললে, একটা জিনিস লক্ষ্য করছি—এ অ্যালবামে জিতেনবাবুর ছবি নেই তো একটাও ?

—না, এগুলো সবই তোলা হয়েছে ওঁ মারা যাবার পর। এ বছর।

—একই ক্যামেরায় তোলা মনে হচ্ছে। এই ভদ্রলোকের তোলা বুঝি সব ?

অ্যালবামে একটি বলিষ্ঠদেহী যুবকের দিকে আঙুল দেখিয়ে প্রশ্ন করে।

করবী বলে, অধিকাংশই। যে ছবিটা দেখাচ্ছেন, ওটা আমার তোলা।

—উনি আপনার কোন আত্মীয় বুঝি ?

—না আমার স্বামীর বন্ধু। ক্যাপ্টেন বসাক। আমার স্বামীর মৃত্যুর পর উনি এখানে এসেছিলেন এ্যায়ারক্রাফ্‌ট্‌টা চালাতে। আমার ফ্ল্যাটেই পেইংগেস্ট হয়েছিলেন মাসতিনেক। তখনই এই ছবিগুলো তোলা—

তিন মাস! 'অনুতপ্ত হবার কী আছে! আমরা দুজনেই তো ওটা চেয়েছিলাম'!

অলক আর সামলাতে পারল না নিজেকে, বললে—মাপ করবেন, করবী দেবী ওঁর কথা মনে করেই কি আপনি আপনার ছবিটা ছাপাতে চান না!

করবী চমকে ওর চোখে-চোখে তাকায়। গম্ভীর সে হয়নি তবু কণ্ঠস্বরে কৃত্রিম গাম্ভীর্য এনে জবাবে বললে, আপনার কৌতূহল কি শালীনতার সীমা অতিক্রম করছে না অলকবাবু ?

অলক হেসে বলে, আমি তা মনে করি না; শালীনতার নয়, অধিকার সীমা অতিক্রম করছে অবশ্য। আফটার অল, আমার সঙ্গে আপনার মাত্র এক সন্ধ্যার পরিচয়···

করবী এবার হেসে বলল, না, আপনি যা ভাবছেন তা নয়। ক্যাপ্টেন বসাক এখন ইণ্ডিয়ান এয়ারলাইনস্-এ আছেন—চিঠিপত্রও লেখালেখি নেই আমাদের।

boiRboi.net

স্বামীর বন্ধু, একই ছাদের তলায় ছিলাম, অন্তরঙ্গতা সেইজন্যই হয়েছিল। সেসব চুকেবুকে গেছে।

'চুকেবুকে গেছে'! কথাটা আগেও শুনেছে অলক। ওরই কণ্ঠে। একই বিষয়ে! আরও কী একটা কথা বলতে যাচ্ছিল হঠাৎ ঝন্‌ঝন্ করে বেজে উঠল টেলিফোনটা। করবী উঠে গিয়ে ধরল: হ্যালো! কে? প্রমীলাদি? বলুন?···না নীরদবাবু চলে গেছেন অনেকক্ষণ, কেন বলুন তো?···এখনও··· না, একজন ফটোগ্রাফার বন্ধু···নাম? শ্রী অলক রায়, না না গেস্ট হাউসে নয়, উঠেছেন আপ্যায়নে···কী?

অলক কাঠ হয়ে যায়। মিসেস প্রমীলা দাশগুপ্তা তাকে ভাল ভাবেই চেনেন। একদৃষ্টে সে লক্ষ্য করতে থাকে করবীকে। অনেকক্ষণ সে কোন কথাই বলে না. শুনে যায় শুধু। প্রথমটা চমকে ওঠে, তারপর একেবারে সাদা হয়ে যায়। কোন বিদায় সম্ভাষণ না করেই সে স্বস্থানে রেখে দেয় টেলিফোনটা। ঘুরে দাঁড়ায়। অলকের মুখোমুখি। এখন সে সাদা নয়. রক্ত ফিরে এসেছে তার মুখে। যেন একটু বেশি পরিমাণেই! দাঁতে দাঁত চেপে বলে, মিস্টার অলক রায়! সো দ্যাটস্ দ্যাট!···তাই প্রথম থেকেই আমার মনে হচ্ছিল আপনার কণ্ঠস্বর কোথায় যেন শুনেছি।

অলক জবাব দেয় না। কোলের উপর থেকে অ্যালবামটা নামিয়ে রাখে টেবিলে।

—আপনি ডঃ ত্রিবেদীর সঙ্গে একই টিমে এসেছেন! ইজ দ্যাট কারেক্ট?

এবার করবী প্রশ্ন করছে। জবাব দেবার দায় অলকের। জবাব সে দেয় না, কিন্তু প্রশ্নের পাহাড় জমতেই থাকে, আপনিই সেদিন আমার ইন্টারভিয়ু নিয়েছেন! অস্বীকার করতে পারেন? আর সেই জন্যই পরিচয় গোপন করে এসেছেন আমার বাড়িতে? আপনি মিথ্যাবাদী। প্রবঞ্চক! ঠগ!

মুন্নির-মা ট্রেতে করে দু-কাপ কফি নিয়ে পূর্ব মুহূর্তে ঘরে ঢুকেছিল। চিত্রার্পিতার মত সে দাঁড়িয়ে থাকে। ন যযৌ ন তস্থৌ।

—কথা বলছেন না কেন? য়ু লায়ার! ইম্পস্টার।

অলক নড়েচড়ে বসে। হাসে! বলে, আপনি স্থির হয়ে বসুন আগে—

—এর পরেও আমি স্থির হয়ে বসব আপনার সামনে? বাড়িতে পুরুষমানুষ নেই। থাকলে গলা ধাক্কা দিয়ে আপনাকে রাস্তায় বার করে দিতাম!

মুন্নির মাকে কেউ গলা ধাক্কা দেয়নি, তবু সে স্থান ত্যাগ করাই সুবিবেচনার কাজ বলে মনে করল। কফির ট্রে সমেত। অলক উঠে দাঁড়াল। ক্যামেরাটা ঝুলিয়ে নেয় কাঁধে। বললে, অতটা উত্তেজিত হবেন না। গলায় হাতের স্পর্শ না পড়লেও সেই পরিমাণে অপমানিত করতে পেরেছেন আপনি—স্বীকার করছি।

BanglaBook.org

আমি চলেই যাচ্ছি। শুধু একটা কথা ভেবে দেখবেন মিসেস বাসু—আমি যাঁর ইন্টারভিয়ু নিয়েছিলাম সে মহিলাটি আপনি নন। তাঁর স্বামী মারা গিয়েছিলেন মটর দুর্ঘটনায়, বিমান দুর্ঘটনায় নয়!

করবী সমান তেজে বলে ওঠে, আপনি পাশ কাটাবার চেষ্টা করবেন না, মিস্টার রায়! আপনি জানতেন যে, বিমান দুর্ঘটনার কথা আমি বলতে পারতাম না। মৃত পাইলটের বিধবা লালগড়ে একজনই মাত্র আছে—এটা আপনিও জানেন, আমিও জানি! কিন্তু আপনারা প্রতিশ্রুতি দেননি যে, ইন্টারভিয়ু যাঁরা দিতে আসবেন তাঁদের পরিচয় গোপন থাকবে? আপনি সজ্ঞানে সে প্রতিশ্রুতি ভাঙেননি?

অলক বললে, প্রতিশ্রুতি আমিও ভেঙেছি, আপনিও ভেঙেছেন। আপনিও কি এই প্রতিশ্রুতির অঙ্গীকার নিয়ে ওখানে যাননি যে, আদ্যন্ত সত্যি কথা বলবেন? তাই বলেছেন আপনি? মিসেস বাসু, আমার মিথ্যাচরণের কৈফিয়ৎ আমি দিয়ে যাই—আমার সন্দেহ হয়েছিল যে, আপনি একাধিক মিথ্যা জবাব দিয়েছেন—আমাদের বৈজ্ঞানিক সমীক্ষাটা বানচাল হয়ে যেত আপনার রিপোর্টখানা রাখলে। তাই আমি জানতে এসেছিলাম ওটা রাখব, না ছেঁড়া কাগজের ঝুড়িতে ফেলব। তা জেনে গেলাম আমি। তা সে যাই হোক, আমার মিথ্যাভাষণের শাস্তি আমি নতমস্তকে মেনে নিয়ে অপমানিত হয়ে বিদায় নিচ্ছি।···এখন আপনি আপনার বিবেকের কাছে কৈফিয়ৎ দেবেন, আপনি কেন আদ্যন্ত মিথ্যার আশ্রয় নিয়েছিলেন। আমরা দুজনেই মিথ্যেবাদী, কিন্তু মাপ করবেন করবী দেবী, রাগ যখন পড়ে যাবে একটু ভেবে দেখবেন মিথ্যের বেসাতি কে প্রথম শুরু করেছিল!

ধীর পদে অলক এগিয়ে যায় নিষ্ক্রমণ দ্বার পর্যন্ত। সেখানে সে থেমে পড়ে। কী কথা মনে করে হাসে। কাঁধ থেকে ক্যামেরাটা নামায়। সেটা খুলতে খুলতে বলে, আপনার অনুরোধটাই রাখি বরং। নীরদবাবুকে বলব, একটা দুর্ঘটনায়, এক্সপোজড ফিল্মটা আলো লেগে সব সাদা হয়ে গেছে—

ক্যামেরা খুলে সদ্য-সম্পূর্ণ এক্সপোজড ফিল্মটা সে করবীর দিকে ছুঁড়ে দেয়। হেসে বলে, অদ্ভুত ভবিষ্যৎবাণীটা করেছিলেন কিন্তু! উই আর বোথ এক্সপোজড! আলো লেগে দুজনেই সাদা হয়ে গেছি! তাই নয়? সত্যের আলো!

পরমুহূর্তেই সে দ্বার খুলে পথে নামে।

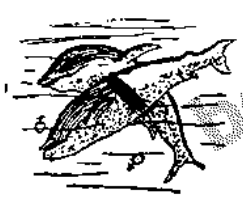

SoiRboi.net

ত্রিধুর্গীনারায়ণ শর্মা করিৎকর্মা পুরুষ। সে উঠে পড়ে লেগেছে ঐ ২০৩৭ মার্কা মেয়েটিকে খুঁজে বার করতে। না, ভুল বললাম—সে মেয়েটিকে ও খুঁজছে না। ও খুঁজছে তার সাত বছরের বাচ্চাটাকে। শর্মার ভীষণ দরকার তাকে। ও সেই ছেলেটার কাছ থেকে জেনে নিতে চায়, সে কতটা জানে, কতটা বোঝে। সেও কি শর্মার মত সব জেনে-বুঝে দাঁতে-দাঁত দিয়ে দিন গুজরান করছে? স্কুলের বন্ধুদের সঙ্গে মিশতে পারে না, খেলতে ভালবাসে না, বই পড়তে মন বসে না, মায়ের দিকে চোখ তুলে তাকাতে পারে না। বাবাকে দেখলে ডুকরে কাঁদতে ইচ্ছে করে তার? স্কুলের বাথরুমে লেখা অশ্লীল কথাটাকে ছুরি দিয়ে কাটতে গিয়ে কি তারও হাত রক্তারক্তি হয়ে যায়? এগারো বছরের বালক এ ক্ষেত্রে কী করে থাকে, শর্মা জানে—ও জানতে চায় সাত বছরের ছেলের প্রতিক্রিয়াটা কী জাতের!

শুধু তাই বা কেন? এমনও হতে পারে যে, সে বেচারা কিছুই জানে না এ পর্যন্ত। সে-ক্ষেত্রে তাকে বলে দেওয়া দরকার স্কুলে হাফ-হলিডে হয়ে গেলে সে যেন বাড়ি ফিরে জানলা দিয়ে 'টুকি' না দেয়। কিন্তু কেমন ভাবে এসব কথা বোঝাবে শর্মা সেই অচেনা ছেলেটাকে?

সে সব কথা পরে। আপাতত ছেলেটাকে খুঁজে বার করতে হবে। ছেলেকে খুঁজতে হলে আগে চাই তার বাপের পরিচয় এবং সেটা খুঁজে পাওয়ার একমাত্র রাজপথ ঐ ২০৩৭ সংখ্যাটাকে ডিসাইফার করা।

অনেকটা এগিয়েছে শর্মা। প্রথমত সে বুঝে ফেলেছে ওর বাপের উপাধিটা ইংরাজি অক্ষর I থেকে P-র মধ্যে। কেমন করে? অতি সহজে। হস্তাক্ষর দেখে। জানি, তুমি কী বলতে চাইছ। শুধু 'ফিগর' দেখে কখনও হস্তাক্ষর চেনা যায়? যায়, যদি ত্রিধুর্গীনারায়ণ শর্মার মত পর্যবেক্ষণ শক্তি তোমার থাকে। শর্মা লক্ষ্য করে দেখেছে মিস মেহতা ইংরাজী '7' লিখবার সময় তার পেট কাটে। কেন জান? পাউণ্ড চিহ্ন লিখতে যেমন L লিখে তার পেট কাটো। এটা হচ্ছে 'ম্যারিকান স্টাইল'! উদ্দেশ্য নাকি ইংরাজি '১' এবং '৭'-এর তফাৎটা সুচিহ্নিত করা। মোট কথা, শর্মা দেখেছে একমাত্র মিস মেহতাই সাতের পেট কাটে; আর দুজন কাটে না। মিস মেহতা বসেছিল মাঝের টেবিলটায়—ঐ 'আই' থেকে 'পি'-র জন্য। মিস মেহতা নিজেই বলেছে সে-কথা গল্পে গল্পে। শর্মার স্পষ্ট মনে আছে ২০৩৭-এর 'সাত' পেট কাটা। সুতরাং—

পরবর্তী কাজটা খুব কঠিন হয়নি। প্রথমে হাৎড়েছে মহিলা সমিতির সভ্যাদের নামের তালিকা। একশ তেরটি নামের ভিতর ৩৮টি নাম পাওয়া গেল ঐ রেঞ্জ-এ।

boiRboi.net

এবার সে হাওড়াতে বসল স্থানীয় টেলিফোন ডাইরেকটারি। যে কোন কারণেই হ'ক লালগড়ে টেলিফোনের খুব ছড়াছড়ি। অধিকাংশ উচ্চবিত্তের মানুষের বাড়িতেই টেলিফোন আছে। ২০৩৭-এর স্বামীর মাসিক আয় সতের শ টাকা। টেলিফোন গাইড হাতড়ে সাতটি নাম পাওয়া গেল যাঁদের উপাধি 'আই-থেকে-পি' এবং যাঁর পিতৃদত্ত নামের আদ্য অক্ষর 'জি' অথবা 'জে'। শর্মা পরপর সাতটি টেলিফোন করে তার ক্ষেত্রকে মাত্র দুইটি সম্ভাবনার মধ্যে সীমিত করতে পেরেছে—কারণ বাকি পাঁচজনের নাম সংক্ষেপিত আকারে 'যশ' হবার সম্ভাবনা অল্প। সেই দুজন হচ্ছেন, যশোদারঞ্জন মুখার্জি এবং যশোবন্ত কাপুর।

উদ্যোগী-পুরুষ শর্মা প্রথম ফোন করল মুখার্জি সাহেবকে।

—হ্যালো! মুখার্জি স্পিকিং!

শর্মা বললে, মিস্টার মুখার্জি, আপনি আমাকে চিনবেন না—আপনার ছেলে আমার ছেলের ক্লাস ফ্রেণ্ড—

—গুড গেডেন্স! কত নম্বর চাইছেন বলুন তো! আমি বিয়েই করিনি, অথচ আমার ছেলে—

মুখার্জি সাহেব কথাটা শেষ করবার সময় পাননি। তার আগেই যান্ত্রিক গোলযোগে লাইন কেটে গেল।

আবার ডায়াল করলে শর্মা।

—হ্যালো! কিস্‌কো চাতে হেঁ আপ্‌? মাম্মী ইয়ে ড্যাডী? শিশুকণ্ঠ।

—তুম্‌কোই চাহতে হেঁ মুন্না!—'মুন্না' মানে খোকা। না জেনেই শর্মা ওর ডাকনামে ওকে ডেকেছে। মুন্না তার মাতৃভাষায় বললে, আমাকে? কিন্তু আমি তো আপনাকে চিনতে পারছি না। আপনার নাম কী?

শর্মা একটা চান্স নিল। বললে, নাম বললে কি চিনবে আমাকে! আমার নাম স্যান্টাক্লস্!

—ও মাই গড্! আপ্‌ খোদ স্যান্টাক্লস্! ঠাহ্‌রিয়ে, মাম্মীকো বোলা—

শর্মা তৎক্ষণাৎ ওকে বোঝায়—না, এ খুব গোপন কথা। মাম্মী অথবা ড্যাডিকে বললেই সব পণ্ড! স্যান্টাক্লস যে ফোন করেছে এ কথা যেন সে কাউকে না বলে। অল্প আয়াসেই সে মুন্নাকে ব্যাপারটা বুঝিয়ে দিতে পারে। সেন্ট নিকোলাস রক্ষা করেছেন—ইংরাজি কায়দায় যশোবন্ত এবং তার ধর্ম (!) পত্নীর ব্যবস্থাপনায় এই ছেলেটিকে প্রতি বছর স্যান্টাক্লস বড়দিনের আগের রাত্রে উপহার দিয়ে থাকেন। শর্মা তাই জানালো—সে অর্থাৎ স্যান্টাক্লস মুন্নার কাছ থেকে চুপি চুপি জেনে নিতে চায় এ বছর চব্বিশে ডিসেম্বর রাত্রে সে কী উপহার পেতে

boiboi.net

চায়। সারা পৃথিবীর এত ছেলে-মেয়েকে উপহার দেওয়া তো সহজ নয়; তাই সান্টাক্লস তৈরী হচ্ছেন। মুন্না অসঙ্কোচে বললে তার মনোবাসনা এবার একটি ক্রিকেট ব্যাট। ড্যাডির একটা ব্যাট আছে—কিন্তু সেটা বড্ড বড়—ওর জুৎ হয় না। শর্মা প্রতিশ্রুত হয়। জিজ্ঞাসা করে বুঝতে পারে স্কুল ছুটির পরে বা স্কুল বসার আগে তার সঙ্গে দেখা হওয়া সম্ভব নয়—কারণ সে স্কুল বাসে যাতায়াত করে। বাইরের লোকের সঙ্গে কথা বলা একদম মানা। তবে হ্যাঁ, বিকেলবেলা ওদের বাড়ির পিছনে ফুটবল মাঠে দেখা হতে পারে। কৃষ্ণচূড়া গাছটার তলায়। শর্মা বলে, কিন্তু অত ছেলের মধ্যে আমি তোমাকে চিনব কেমন করে!

—বা রে! আমাকে তুমি চেন না? টেলিফোন নম্বরটা পর্যন্ত মুখস্ত আছে তো তোমার! ঠিক আছে, তুমি না চিনলেও আমি তোমাকে চিনতে পারব।

শর্মা হাসে। বলে দূর পাগল! আমি তো ছদ্মবেশে থাকব। তা না হলে সবাই মিলে আমাকে ছিঁড়ে খেয়ে ফেলবে না? শোন, আমার পরনে থাকবে একটা সাদা প্যান্ট, গায়ে গ্রে-রঙের কোট, লাল রঙের টাই—মনে থাকবে? ঠিক বিকাল চারটের সময় আমি ঐ কৃষ্ণচূড়া গাছতলায় বসে বসে সিগারেট খাব। আমার দাড়ি থাকবে না কিন্তু—

মুন্না বাধা দিয়ে বলে, সে আমি বুঝেছি। তুমি তো ছদ্মবেশে থাকবে। ঠিক চিনে নেব আমি—সাদা প্যান্ট, গ্রে-কোট, লাল-টাই! থ্যাঙ্কু সান্টাক্লস!

—বাই বাই! টেলিফোনটা রিসিভারে নামিয়ে রেখে ঘুরে দাঁড়ায় শর্মা। দেখে একটি মহিলা এগিয়ে আসছেন ওরই দিকে। শর্মা টেলিফোন করছিল আপ্যায়নের রিসেপশান কাউন্টার থেকে। ও এখন ঘর বদলে অলকের সঙ্গে এক ঘরে আছে। সেখান থেকে ফোন করলে অলকের সন্দেহ হত। না, মহিলাটি ওর কাছে আসছেন না। কাউন্টার ক্লার্ককে প্রশ্ন করলেন, মিস্টার দস্তুর কি ঘরে আছেন? রুম নম্বর ৩০৫।

কাউন্টার ক্লার্ক পিছনের কবুতর খোপের দিকে তাকিয়ে বলল, আছেন।

টেলিফোনটার উপর হাত রেখে বলল, ফোন করে জানিয়ে দেব?

মেয়েটি চকিতে একবার শর্মার দিকে তাকিয়ে দেখে। বলে, নো, থ্যাংক্স্। আমার অ্যাপয়েন্টমেন্ট করাই আছে।

আর একবার শর্মার দিকে দৃকপাত করে মেয়েটি সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠে যায়।

আশ্চর্য ঘটনাচক্র! একেই বলে কাকতালীয়। শর্মা চিনতে পেরেছে। এই মহিলাটিই মিসেস যশোবন্ত কাপুর। এক নম্বর, কণ্ঠস্বর। দু নম্বর—একেই সে

boiRboi.net

দেখেছিল সেদিন সিঁড়ির মুখে—তখন ওর খোঁপায় গোঁজা ছিল একটা হলুদ রঙের ক্রিসেন্থিমাম্! আশ্চর্য যোগাযোগ, নয়?

তবু একেবারে নিশ্চিন্ত হবার জন্য এগিয়ে এসে কাউন্টার ক্লার্ককে বললে, উনি মিসেস যশোবন্ত কাপুর, নয়?

—হ্যাঁ। চেনেন নাকি ওঁকে?

—না। ওঁর স্বামীর সঙ্গে আলাপ আছে আমার।

শর্মা থাকে দ্বিতলে, কিন্তু সিঁড়ি বেয়ে সে উঠে গেল তিনতলায়। বসল গিয়ে লাউঞ্জের ও-প্রান্তে, যেখান থেকে তিনতলার ঐ পাঁচ নম্বর ঘরটা—যেটা হোটেলের কেতাবি-ভাষায় রুম নং ৩০৫, সেটার উপর নজর রাখা চলে। সে ঘরের দরজা বন্ধ। শর্মা ঘড়ি দেখল। সে দেখতে চায় কতক্ষণ পরে মুন্নার মা ঐ ঘর ছেড়ে বেরিয়ে আসে—দেখতে চায়, তখন তার কপালের টিপটা ঠিক থাকে কিনা, মুখ-চোখে কোন পরিবর্তন লক্ষিত হয় কিনা।

—গুড আফটারনুন মিসেস ২০৭২। আপনি প্রস্তুত?

—ইয়েস।

—আপনার বয়স?

—পঁয়ত্রিশ।

—কত বছর বয়সে বিবাহ হয়েছে আপনার?

—আমার আদৌ বিবাহ হয়নি!

অলক চমকে ওঠে—গুড হেভেন্স! এই পঁয়ত্রিশ বছরের কুমারী মেয়েটি কেমন করে ঢুকে পড়ল এ নিষিদ্ধ রাজ্যে? এ বিষয়ে যথেষ্ট সাবধানতা তো অবলম্বন করা হয়েছে!

অলক তোৎলামি শুরু করে, বাট···বাট···আই মীন···

BanglaBook.net

—ডোন্ট বি এমব্যারাসড্, ডক্টর! আপনি আমার সত্য-স্বরূপটা জানতে চাইছেন বৈজ্ঞানিক সমীক্ষার জন্য। আদ্যন্ত সত্যকথা বলবার প্রতিশ্রুতি আমি দিয়েছি—সত্য কথাই বলতে এসেছি। বলছি। সমাজে আমার পরিচয়—আমি বিবাহিত এবং বিধবা। আপনি আমার কাছে কোন জাতের জবাব চাইছেন? যা আমার সামাজিক পরিচয়, না যা আমার প্রকৃত ব্যক্তিসত্তা?

—আমায় মাপ করবেন। না, আমি জানতে চাই আপনার সত্যকার পরিচয়।

—তাহলে আমার জবাব—আমি অবিবাহিতা, কুমারী।

—আপনার···ইয়ে···সন্তানাদি···

—একটি মাত্র কন্যা আছে আমার।

—কত বছর বয়স তার?

—ষোলো বছর।

—তার মানে সে যখন জন্মগ্রহণ করে তখন আপনার বয়স উনিশ?

—ছাটস্ কারেক্ট!

—তার পরে আপনার গর্ভে আর কখনও সন্তান আসেনি?

—না। তার পরে কোন পুরুষ সংসর্গই হয়নি আমার।

—তার আগে, আই মীন ঐ কন্যাটি গর্ভে আসার আগে কি একাধিক পুরুষের ঘনিষ্ঠ দৈহিক সান্নিধ্যে আসার অভিজ্ঞতা আপনার হয়েছিল?

—না। একমাত্র আমার কন্যার পিতাকেই আমি নিবিড়ভাবে জেনেছি।

—আই সী। এবার আপনার বাল্য ও কৈশোরের কথা জানতে চাইব আমি।

সেই মামুলী প্রশ্নোত্তর—বাপের রোজগার, বাল্য-কৈশোরের স্কুল জীবন, প্রথম যৌন বিষয়ে ধ্যান-ধারণা। মহিলাটি একে একে সব প্রশ্নেরই জবাব দিয়ে যান। গল্পটা যতই জমাট বাঁধে, যতই ঐ অজ্ঞাত মিসেস ২০৭২-র খড়ের কাঠামোর উপর মাটি চাপে, ততই প্রতিমাটা চেনা-চেনা ঠেকে। অলকের মনে হয়—এ মেয়েটি তার পরিচিত, ওর মর্মন্তুদ কাহিনী তার অজানা নয়; কিন্তু কোথায় কিভাবে সে ঐ মেয়েটিকে দেখেছে, চিনেছে অথবা জেনেছে তা মনে পড়ে না। ইংরেজি সাহিত্যের ছাত্রটির মনে হয় এ কোন উপন্যাসে পড়া কাহিনী—টমাস হার্ডি, মোপাসাঁ, টুর্গেনিভ···কার গল্প? না কি সিনেমায় দেখা অর্ধেক ভুলে-যাওয়া এক বিয়োগান্ত উপাখ্যান? নাঃ! মনে পড়ে না, অথচ কিছুতেই অলক মেনে নিতে পারে না এ কাহিনীটা ও প্রথম শুনছে। প্রশ্ন করতে ও ভুলে যায়—আর প্রশ্ন করার আছেই বা কী? মহিলার দাম্পত্য-জীবন বলে তো কিছুই নেই। দীর্ঘ

BanglaBook.org

পঁয়ত্রিশ বছর ব্যাপী জীবনের দিগন্ত-অনুসারী সমুদ্রের মাঝখানে সাতদিনের একটা ছোট্ট প্রবাল-দ্বীপ! অশক চুপ করে বসে শুনে যায়—

কেরালার একটি ছোট্ট জনপদ। আরব সাগরের ধারে। নাম নাই বা জানলে ডক্টর, যদি কোনদিন যাও মুগ্ধ হয়ে যাবে তুমি। সমুদ্রের ধার বরাবর সোনাবালুর চর—আধ মাইলও হবে না চওড়ায়। তার পরই খাড়া পাহাড়। তার খাঁজে খাঁজে বাড়ি। মানুষজনের বাস। নারিকেল গাছ ছাওয়া শান্ত জনপদ। আরব সাগর থেকে যখন ঝোড়ো হাওয়া আসতে থাকে সেই অযুত-নিযুত নারকেল গাছ তাকে মাথা দুলিয়ে দুলিয়ে স্বাগত জানায়। ঘর অধিকাংশই গোলপাতার। কিন্তু কী ছিমছাম, পরিপাটি। রাস্তা-ঘাট ঝকঝকে, তকতকে। গাঁয়ের লোক গরিব—মৎস্য শিকারই অধিকাংশের উপজীবিকা। কিন্তু গরিব হলেও ওরা নোংরা নয়। ধর্মে ওরা খ্রীষ্টান। গ্রাম নয়, গণ্ডগ্রামই বলা উচিত—হাজার-পাঁচেক লোকের বাস। ঐ পাহাড়ের ঢালুতে আছে একটি চার্চ: ফাদার স্টিভেন্স থাকেন সেখানে। প্রভু যীশুর বাণী প্রচার করেন। শুধু মৌখিক বাণী প্রচার নয়, গ্রামের বাড়ি বাড়ি ঘুরে দেখেন—কে কেমন আছে; কার গরু বিয়ালো, কার ক্ষেতে পোকার উপদ্রব হচ্ছে, কারা বদন্তের টিকা নিতে ভুলেছে।

সেই গাঁয়েরই মেয়ে। পড়াশুনা—আদি পর্যায়ে ঐ চার্চের রোমান ক্যাথলিক স্কুলে। শৈশবেই মাকে হারিয়েছে। ও আর ওর ছোট ভাই নোয়েল মানুষ হচ্ছিল মাসির কাছে। বাপ দ্বিতীয়বার বিবাহ করেছিলেন। বিমাতা ওদের দেখতে পারত না! স্কুলের গণ্ডি পার হল কৃতিত্বের সঙ্গে। ফাদার স্টিভেন্স এসে ওর মাসিকে বললেন, তোমার বোনঝির মাথা আছে। তুমি যদি চাও ওকে ত্রিবেন্দ্রামে পাঠাতে পারি, নার্সিং শিখতে। সব খরচ-খরচা চার্চের। মাসি রাজি হল। ও গেল ত্রিবেন্দ্রাম।

গাঁয়ের মেয়ে শহরে এলে যা হয়। যা দেখে তাতেই অবাক। কাটল আরও তিন-চার বছর। শেষে একদিন পাশ করে বের হল পাকা-পোক্ত নার্স হয়ে। চাকরি পেল। পুণা মেডিকেল কলেজ হসপিটালে। এল প্রথম কর্মস্থলে। সেখানেই ওর জীবনের প্রথম প্রেমের সাক্ষাৎ পেল। প্রথম ও শেষ। 'ল্যভ অ্যাট ফার্স্ট সাইট'—শব্দ-সমষ্টিতে যারা বিশ্বাস করে না তারা ওর এ পাগলামীর অর্থ খুঁজে পাবে না। ওরই 'বস্', ওদের হাউস সার্জেন, ডক্টর আচারিয়া। প্রথম দর্শনেই মেয়েটি ওর পায়ে মন প্রাণ সঁপে দিল। যদি বল—কেন? ও জবাব খুঁজে পাবে না।

প্রথম সাক্ষাতে ওপক্ষের চঞ্চলতাও লক্ষ্য করেছিল সে; কিন্তু মন-জানাজানি

BanglaBook.org

কেমন করে হল জান? বিশ্বাস করতে পারবে না! এক মৃত্যুপথযাত্রীর শয্যাপার্শ্বে। সারা রাত ডাক্তার আর নার্স চেষ্টা করল রোগীকে বাঁচাতে। পারল না। ভোর রাত্রে মারা গেল পেশেন্টটা। পেশেন্ট বাঁচেনি কিন্তু ওদের পরিচয়টা পরিণত হল প্রেমে···

—অলক উঠে দাঁড়ায়। কী আশ্চর্য! এ গল্প সে কোথায় শুনেছে? এই প্লট, শুধু প্লট নয় ঠিক এই ভাষায়—

মহিলার দীর্ঘ কাহিনী যখন শেষ হল তখনও অলক কোন কূলকিনারা করতে পারেনি এ সমস্যার। প্রশ্ন করল, ডক্টর আচারিয়া বিলেত চলে গেলেন আপনাকে না জানিয়ে,—অর্থাৎ পালিয়েই গেলেন; কিন্তু তিনি কি তখন জানতেন যে, আপনাদের সন্তান তিন মাস রয়েছে মাতৃগর্ভে?

—না। ও তা জানত না। জানলে নিশ্চয়ই আমাকে এতবড় বিপদের মধ্যে ফেলে পালাতো না।

অলক এবার নিজের লাইনে ফিরে আসে, আপনি নার্স, আপনার বন্ধু ডাক্তার, সেক্ষেত্রে আপনারা সাবধানতা অবলম্বন করেননি কেন?

—তার কথা জানি না। আমি যে বিশ্বাস করেছিলাম আমাদের বিয়ে হবে।

একটু ইতস্তত করে শেষ পর্যন্ত অলক না জিজ্ঞাসা করে পারল না—কিন্তু আপনি তো ইচ্ছা করলে গর্ভভার মুক্তও হতে পারতেন—আফটার অল আপনি নার্স!

—আমার সন্তান কী অপরাধ করল ডক্টর, যে তাকে হত্যা করব?

অলক অপ্রস্তুত হল। বললে, ডক্টর আচারিয়া যখন ফিরে এলেন না, তখন আপনি আর কাউকে বিবাহ করলেন না কেন?

জবাব আসতে দেরী হল। তারপর ভদ্রমহিলা বললেন, কী জানেন, আমি বিশ্বাসই করতে পারিনি ও আমাকে চিরকালের জন্য এভাবে ত্যাগ করে গেছে! আমার মন বলত ও ফিরে আসবে—অনুতপ্ত হয়ে, নানান ঘাটে ধাক্কা খেয়ে। একদিন না একদিন এসে বলবে, মারা! তুমি আমাকে ক্ষমা কর!

অলক বললে, এক্সকিউজ মি মিসেস ২০৭৩। এই 'মারা' নাম, এই ডক্টর আচারিয়া নাম সবই কাল্পনিক তো?

—ও ইয়েস! আয়াম ভেরি কেয়ারফুল অ্যাবাউট দ্যাট! সবই কাল্পনিক।

—বেশ। তারপর যখন নিশ্চিতভাবে বুঝলেন যে, ডক্টর আচারিয়া আর ফিরবেন না—

boiRboi.net

—শুধু তাই নয় ডক্টর, যখন নিশ্চিতভাবে খবর পেলাম তিনি বিদেশে গিয়ে বিয়ে-থা করেছেন, সংসার করেছেন তখনও আমি নূতন করে জীবন শুরু করতে পারিনি। যদি বলেন, কেন? তাহলে আমাকে চিন্তা করতে হবে। ঠিক জানি না। প্রথমত বয়স হয়ে গিয়েছিল—দ্বিতীয়ত আরও একটা আঘাত পেয়েছিলাম। আর একজন মানুষও আমার মন ছুঁয়েছিলেন। হয়তো তাঁকে আমার জীবনের ভোগে আহ্বান করতাম—কিন্তু তিনি কঠিন শর্ত করলেন যে, আমার মেয়েকে কনভেন্টে পাঠাতে হবে। তাকে তিনি সহ্য করবেন না। ব্যস। ঐ শেষ তারপর আর ও চিন্তাই করিনি। মায়ে-ঝিয়ে দিব্যি কাটিয়ে দিলাম জীবনটা।

—মেয়ে বাপের পরিচয়টা জানে?

—না। নামটা পর্যন্ত বদলেছি। কী দরকার ডক্টর আচারিয়াকে বিব্রত করার? ভদ্রলোক যখন কিছুই জানেন না। মেয়ে জানে, তার বাবা ছিলেন ডাক্তার—মারা গেছেন। মেয়েকে আরও বলেছি, একটা বিধ্বংসী আগুনে আমাদের সব কিছু পুড়ে গেছে। ওর বাবার যা কিছু স্মৃতিচিহ্ন ছিল,—ফটো, চিঠিপত্র আমাদের বিবাহের দলিল! ওর বার্থ-সার্টিফিকেট।

নাঃ! কিছুতেই মনে পড়ল না। কোন ঔপন্যাসিকের কোন গল্পের সঙ্গে এই কাহিনীর নিবিড় যোগাযোগ আছে কিছুতেই মনে পড়ল না ইংরাজি সাহিত্যের সেই ছাত্রটির। শেষ পর্যন্ত বললে, মিসেস ২০৭৩, একটা ব্যক্তিগত প্রশ্ন করব আপনাকে? বৈজ্ঞানিক সমীক্ষার ব্যাপারে নয়। এ আমার নিছক কৌতূহল। অনুমতি দিচ্ছেন?

—বলুন?

—ধরুন যদি ডক্টর আচারিয়ার সঙ্গে এখন, এই বয়সে, ঘটনাচক্রে আপনার সাক্ষাৎ হয়ে যায়? আপনি কী করবেন?

ও-পক্ষ অনেকক্ষণ জবাব দেন না। তারপর বলেন, ও যদি চিনতে না পারে পরিচয় দেব না. ও যদি চিনতে পারে ওকে বলব না ওর মেয়ে আমার কাছে মানুষ হচ্ছে!

উত্তেজনায় উঠে দাঁড়ায় অলক, বাট হোয়াই? কেন? কেন?

অন্তরালবর্তিনীর ম্লান হাসিটা অলক প্রত্যক্ষ করেনি, অনুভব করল শুধু। জবাবে শুনল, তিনি একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ ডাক্তার। তাঁর সংসার আছে। স্ত্রী আছে, ছেলে-মেয়ে আছে! অহেতুক এতগুলি লোকের শান্তি নষ্ট করে কী লাভ হবে ডক্টর?

boiRboi.net

অলক আবার বসে পড়ল। তাই তো! কী লাভ এতগুলি লোকের জীবন বিষময় করে তুলে? আইন অনুযায়ী উনি হয়তো খোরপোষ দাবী করতে পারেন; কিন্তু আইনের নির্দেশ কি সব সময়েই মঙ্গলময়? শান্তি? না শান্তি ডক্টর আচারিয়া পায়নি, পাবে না। বিরাট রোজগার, ভরা সংসার নিয়ে সে দিব্যি কাটিয়ে যাবে বাকি জীবন। কোন গ্লানি কোন ক্লেদ তার নেই। তার কাছে নার্স 'মারা' ছিল কদিনের খেলার পুতুল—আর সে বিশ্বাস করে সেও ছিল মারার কাছে সাময়িক খেলনাই!

চিন্তাস্রোতে বাধা পড়ল ও-পার থেকে প্রশ্ন হওয়ায়, আর কিছু জিজ্ঞাসা আছে ডক্টর?

অলক উঠে দাঁড়ায়। আবার, না মা! জিজ্ঞাস্য কিছু নেই। শুধু একটা কথা বলার আছে। আমি বহু মহিলার জীবনের গোপন কথা শুনেছি; কিন্তু আপনার মতো মহিমময় চরিত্রের সান্নিধ্যে আমি অল্পই এসেছি। ঈশ্বর আপনার মঙ্গল করুন।

—গড ব্লেস্ য়ু মাই চাইল্ড। আমেন!

হিমেল হাওয়ায় পাতাঝরা দিনে পার্কের বড় বড় গাছগুলো নেড়া হয়ে এসেছে। তারই পরিপূরক যেন মরশুমী ফুলের কেয়ারিগুলো। ডায়ান্থাস, ফ্লক্স, পপি, ডালিয়া, পিটুনিয়া—আর হ্যাঁ, সেই ফুলের গাছগুলোও হাসছে এ-ওর গায়ে ঢলে ঢলে। ফুল তোলা বারণ, তা বারণ তো এ দুনিয়ায় অনেক কিছুই। কে মানছে? শর্মা নিচু হয়ে একটা ফুল ছিঁড়ল—হ্যাঁ, হলুদ রঙের চন্দ্রমল্লিকাই। সেটা নিয়ে গিয়ে বসল একটা বিল্বপত্র কৃষ্ণচূড়া গাছের তলায়। হাতঘড়িতে দেখল পৌনে চারটে। আজ এ-বেলায় তার ইন্টারভিয়ু নেবার প্রোগ্রাম ছিল না। তাই চলে আসতে অসুবিধা হয়নি কিছু। চন্দ্রমল্লিকা ফুলটাকে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখছিল।

মনে পড়ে গেল অনেকদিন আগেকার একটা ঘটনা। সেই মর্মান্তিক দ্বিপ্রহরের ঠিক পরের দিনের সকালের ঘটনা। মায়ের ঠেলাঠেলিতে ঘুমটা ভেঙে গেল ওর। প্রথমটা কিছুই মনে ছিল না; চোখ রগড়ে বললে, কী মা?

—বাগানে গিয়ে ছাখ্—কী কাণ্ডটা হয়েছে। তোর সবগুলো ত্রিসেন্থিমামের চারাগাছ কে উপড়ে ফেলেছে। কী পাজি বজ্জাত! দুমড়ে দুমড়ে ঐখানেই ফেলে গেছে। ছাখ্ গে!

বীজ ছড়িয়ে সীড-বেড করেছিল ওর মা। তারপর ছোট ছোট শিশু-তরু যখন মাটির বুক থেকে উঁকি দিয়ে দেখতে চেয়েছিল এই রোদ-বাতাস ভরা দুনিয়াটাকে তখন ওরা মায়ে-পোয়ে সেগুলিকে ট্রান্সপ্লান্ট করেছিল—বাগানের এ-প্রান্তে ও-প্রান্তে। আর তারও পরে মায়ে-ছেলেয় মিলে প্রতিদিন জল দিয়েছে, গোড়া খুঁড়েছে, সার দিয়েছে। সেই গাছে যখন প্রথম ফুল ফুটল তখন শিশু শর্মার কী ফূর্তি। মাকে বলেছে, বাবা এখানে থাকলে ভারি মজা হত, না মা? সেই গাছ! গতকাল রাত্রে কে বা কারা শুধু হিংসে করে উপড়ে ফেলেছে। শুধু উন্মূলিত করেই ক্ষান্ত হয়নি, দুমড়ে-মুচড়ে মৃত গাছের চারাগুলোকে ক্ষতবিক্ষত করেছে। সারি সারি শুয়ে আছে ফুটন্ত চন্দ্রমল্লিকা গাছের মৃতদেহ।

কী অনায়াস ভঙ্গিমায় শর্মা ডাগর দুটি চোখ মেলে বলেছিল, কে এমন শত্রুতা করল মা?

মা আন্দাজ করতে পারেনি। তাতে খুশিই হয়েছিল শর্মা। মায়ের কাছে মিথ্যাচারটা ঠিকমত শিখতে পেরেছে তাহলে—এমনকি অভিনয়টাও!

শুধু ঐ গাছ উপড়ানো নয়, আসল কথাটাও ওর মা কোনদিন আন্দাজ করতে পারেনি। শর্মার মা যে ওর এগারো বছর বয়সে মরে গেছে এই খবরটা আদৌ পায়নি ওর মা! আশ্চর্য চাপা ছেলে। সেই এগারো বছর বয়স থেকেই। ক্রমে শর্মা বড় হয়েছে। মার অনুযোগ বেড়েছে। ছেলে মায়ের সুখ-দুঃখ বোঝে না। শর্মা ডাক্তারি পড়তে গেছে। ওর মা প্রতিবেশীদের কাছে-অভিযোগ করেছে—শর্মা চিঠিপত্রও লেখেনা, ছুটিছাটাতেও আসে না। সবাই বলে—কী ছেলেই পেটে ধরেছিলে!

মা খবর পেয়েছিল ও একটি মেয়েকে ভালবেসেছে। ও তখন বেনারসে। মা বলেছিল—ঐ ডাইনীই আমার ছেলেকে কেড়ে নিয়েছে। শর্মা তখনও বলতে পারেনি—ভুল বলছ মা, আমি মাতৃহীন হয়েছি এগারো বছর বয়সে!

তারপর মায়ের অসুখ। মৃত্যুশয্যাতেও মায়ের সঙ্গে দেখা করতে আসেনি। এসেছিল মায়ের মৃতদেহ সৎকার করতে। মায়ের বুকের উপর আছাড় খেয়ে

banglainternet.com

পড়েছিল। তার বুকে মুখ ঘষতে ঘষতে বলেছিল—মা, মা, মা। এ তুই কী করলি মা! তুই নিজেও মরলি, আমাকেও মারলি।

পাড়ার লোক মুখ টিপে বলেছিল, আধিক্যেতা।

মাসি যা বললেন তার ভাবার্থ, থাকতে দিলে না ভাত কাপড়, মরলে করবে দানসাগর।

তখনও শর্মা কোন প্রতিবাদ করতে পারেনি। কী কৈফিয়ৎ আছে তার?

…হঠাৎ সম্বিৎ ফিরে পায় শিশুকণ্ঠের প্রশ্নে, তুমিই বুঝি সেই ইয়ে?

শর্মা তাকিয়ে দেখল ছেলেটিকে। পরনে হাফ প্যান্ট। পুরো হাতা লাল সোয়েটার। ফুল মোজা আর জুতো। দুটি হাত দু-মাজায় দিয়ে ঘাড় কাৎ করে ওকে অনেকক্ষণ থেকে লক্ষ্য করছিল সে। ওর প্যান্ট, কোট, টাই। এতক্ষণে বললে, তুমিই বুঝি সেই ইয়ে?

সিগারেটের স্টাম্পটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে শর্মা বললে, না, আমি সেই 'ইয়ে' নই।

—ও!—বিজ্ঞের মত মাথা নাড়ল ছেলেটি। পিছন ফিরল। এ-দিক ও-দিক কী যেন খুঁজল। তারপর চলতে গিয়েও ফিরে এসে বললে, 'ইয়ে' মানে 'কিয়ে' বলতো?

শর্মা বললে, কাছে এস, কানে কানে বলব।

ছেলেটি কান বাড়িয়ে দেয়। শর্মা ওর কানে কানে বলে সান্টাক্লস।

আবার ঘাড় নাড়ে। বলে, ঠিক তো? তা তুমি সে নও?

—দূর! আমার কি দাড়ি আছে?

—দাড়ি তো থাকবে না বলেছিলে। তুমিই সেই! তাই না?

শর্মা বললে, আমি সে নই, তবে আমি তার কাছ থেকেই আসছি।

ছেলেটি বসে পড়ে ঘাসের উপর। চোখ পিট পিট করে বলে, সে এল না কেন গো?

—কেমন করে আসবে? তার কত কাজ। আজ বাদে কাল ক্রিসমাস!

শর্মা বুঝিয়ে দেয় বড়দিনের আগের কটা দিন সান্টাক্লসের বাজেট ইয়ারের মার্চ-ফাইনাল। তাঁর এখন কত কাজ! তাইতো শর্মাকে পাঠিয়েছেন মুন্নার কাছে। খবরগুলো জেনে আসতে—

চোখ দুটো ছোট করে পেট চুলকাতে চুলকাতে মুন্না বললে, কী খবর গো?

—এক নম্বর খবর—ব্যাটটাতে রবারের হ্যাণ্ডেল গ্রিপ থাকবে, না থাকবে না?

—থাকবে। লাল রঙের।

—আর জানতে বলেছে—মুন্নাকে কে বেশি ভালবাসে, মাম্মি না ড্যাডি।

boiRboi.net

—ড্যাডি।

—কেন? মাম্মি কী দোষ করল?

—খালি বকে। অঙ্ক ভুল হলে, বানান ভুল হলে।

—আর কোন দোষ নেই তা?

—আরও আছে। ফ্রিজ খুলে চুরি করে খেলে মারে।

শর্মা নিশ্চিন্ত হয় খানিকটা। না—মুন্নার আর কোনও অভিযোগ নেই তার মায়ের বিরুদ্ধে! প্রশ্ন করে, তুমি মোহন দস্তরকে চেন? তোমার বাবারই বয়সী —বড় জুলপি আছে, গোঁফ আছে?

মুন্না বললে, না! আর শোন, ব্যাটটা যেন বেশি বড় না হয়। এই এ্যাত্ত বড়!

শর্মা বলে, ব্যাটের সাইজ আমি জানি। আর একটা কথা শোন। খুব মন দিয়ে। সান্টাক্লস বলেছে এটা না শুনলে পরের বছর কিছু দেবে না—

—কী কথা গো? —মুন্না এবার পিঠটা চুলকাচ্ছে। সোয়েটারের ভিতর হাত চালিয়ে।

—যদি কোনদিন তোমার স্কুলে হাফ হলিডে হয়ে যায়— তাহলে বাড়ি ফিরে খবদ্দার—

হঠাৎ থেমে পড়ে। এ কী পাগলামো করছে সে? শিশু মনে নিষেধের কী প্রতিক্রিয়া তা কি সে জানে না? আজ বারণ করলে কালই যে ক্লাস পালিয়ে দুপুর বেলা বাড়ি ফিরবে। জানালার পাখি তুলে 'টুকি' দিতে চাইবে। ব্যস্! তৎক্ষণাৎ মুন্নার মায়ের মৃত্যু হবে। আর মুন্না সারাটা জীবনভর—

—কই কী করতে হবে বললে না? হঠাৎ হাফ-হলিডে হলে?

শর্মা সামলে নেয় নিজেকে। বলে, ও কথা থাক। আচ্ছা তোমাদের স্কুলে কি ইংলিশে ক্লাস হয় না হিন্দিতে?

—ইংলিশে।

—ডিক্টেশান লিখতে পার?

—হ্যাঁ।

শর্মা পকেট থেকে নোটবই আর পেনসিল বার করে বলে, কই লেখ তো, "আমি সব জানি। তুমি চলে যাও। না হলে বাবাকে বলে দেব।"

তিন-তিনটে বানান ভুল করল মুন্না; কিন্তু বড় বড় হরফে লিখতে পারল ঠিক। শর্মা বললে, তুমি নিজের নাম সই করতে পার?

—তা আর পারি না?—তলায় বড় বড় হরফে মুন্না নিজের নামটা সই করে দিল।

boiRboi.net

সান্টাক্লসের চ্যালার সঙ্গে দেখা হয়েছে একথা সে যেন কাউকে না বলে এটা পৈ-পৈ করে বুঝিয়ে এবং সময়মত ব্যাট পৌঁছে দেবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে শর্মা যখন উঠল তখন পশ্চিমের আকাশ লালে লাল হয়ে গিয়েছে।

ইন্টারভিয়ুর ক্লান্তিকর অধ্যায় সেরে সন্ধ্যা নাগাদ অলক ফিরে এল হোটেলে। প্রবেশপথে কাউন্টার-ক্লার্ক ওকে রুখল, এক্সকিউজ মি স্যার। আপনার একটা টেলিফোন মেসেজ আছে।

—অলক ঘনিয়ে আসে—কই দেখি?

কাউন্টার-ক্লার্ক একখণ্ড কাগজ বার করে দেখায়। তাতে লেখা, রিং ব্যাক প্লীজ!

অলক ভ্রূকুটি করে বলে, এটা কি একটা 'মেসেজ'? —কাগজখানা মেলে ধরে সে। বলে, কোন নাম্বারে রিং ব্যাক করব সেটা তো লিখে রাখবেন।

কেরানি ভদ্রলোক অত্যন্ত সঙ্কুচিত হয়ে বললেন, কী করব বলুন স্যার? আমি বারে বারে সে-প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করলাম, উনি বললেন না। শুধু বললেন, আপনাকে জানাতে, কাল সন্ধ্যাবেলা আপনি যে ফটোর দোকানে একটা এক্সপোজড ফিল্ম্ ডেভালপ করতে দিয়ে এসেছেন সেই দোকান থেকে ফোন করছেন।

—পুরুষ না মহিলা?

—নিঃসন্দেহে মহিলা স্যার।

—ঠিক আছে। বুঝেছি।

—উনি তাই বললেন স্যার। কাল তো আর আপনি শহরের বিশটা দোকানে ছবি ডেভালপ করতে দেননি!

—ধন্যবাদ।

নিজের ঘরে ফিরে এল অলক। সে আর শর্মা আজকাল এক ঘরে থাকে। শর্মা ঘরে নেই। আজকাল তাকে প্রায় পাওয়াই যায় না। একটা মোটর বাইক

boiRboi.net

ভাড়া করেছে। সেটা চেপে সারাদিন কোথায় ঘোরে, কী করে কিছু বোঝা যায় না। শর্মা এমনিতেই একটু অদ্ভুত ধরনের, লালগড়ে এসে তার ক্ষ্যাপামিটা যেন বেড়েছে। সেও কি এখানে এসে কোন অন্তরালবর্তিনীর হৃদয়-নিংড়ানো দুঃখের কথায় মনের ভারকেন্দ্র থেকে একপাশে সরে গেছে অলকের মত? অলক বেচারি তো পর পর তিনটি আঘাত পেয়েছে। ঘুরে ফিরে ঐ তিনটি অবগুণ্ঠনবতী ওর মনের ভারসাম্যকে বিচলিত করে তোলে। করবী বাসু, সেই চার সন্তানের নিঃসন্তানা জননী আর এই আজকে-শোনা নার্সটি। তিনজনেই রহস্যময়ী। না, সেই চার-সন্তানের সন্তানহীনা নারীর মধ্যে রহস্য কিছু নেই। সব কথা তিনি অকপটে স্বীকার করেছিলেন—অকুণ্ঠ সত্যনিষ্ঠায়। বাল্যের কথা, কৈশোরের কথা—যখন খোকা-খুকুর দল 'ইচ্ছে' হয়ে লুকিয়ে ছিল ওঁর অপাপবিদ্ধ কিশোরী মনের কোরকে। তারপর ভরা সংসারের আনন্দঘন দিনগুলি, এবং তারও পরে সেই অকস্মাৎ বজ্রপাতের নিদারুণ আঘাত। সেখানেই কিন্তু স্বীকারোক্তির শেষ হয়নি। তারও পরে ছিল একটি ক্লান্তিকর অধ্যায়—অনাগত সন্তানের জননী হবার অধিকার রইল তাঁর অটুট, কিন্তু পিতৃত্বের অধিকার থেকে ওঁর স্বামী বঞ্চিত করেছেন নিজেকে। অদ্ভুত সমস্যা! অলকের মনে হল কাহিনীটা ওঁর স্বামীর জবানবন্দি থেকে লিপিবদ্ধ হলে কেমনতর হত? ওঁর স্বামী হয়তো বলতেন—তাঁর স্ত্রীই পাগল হতে বসেছিলেন, আর তিনি ছিলেন সহজ, স্বাভাবিক, অবিচলিত। হয়তো তিনি বলতেন—স্ত্রীর মাতৃত্বকামনাকে তিনি কাঁপতে দেখেছিলেন তাঁর চোখের পাতায়। ইচ্ছে করে তিনি পাগল সেজে অভিনয় করেছিলেন, না হলে তাঁর স্ত্রী পুনরায় সন্তানবতী হতে রাজী হতেন না। উঃ বিচিত্র ঘটনাচক্র! ওঁদের দাম্পত্যজীবনের এই গোপনতম লজ্জাকর ইতিহাস ভদ্রমহিলা কেন অমনভাবে মেলে ধরলেন তার কাছে? তার একটিমাত্র জবাব, ডাক্তারবাবু, যাদের আপনারা ঈশ্বরের অযাচিত দান থেকে চিরতরে বঞ্চিত করছেন আমার কথাটাই তাদের শুনিয়ে দেবেন। বলবেন,—এমনটাও হতে পারে!

আর সেই নার্স-মহিলাটি? তার কাহিনীটা আবার আদ্যন্ত পড়ে দেখতে হবে। ওর কেমন মনে হল ঐ মেয়েটি কাহিনী তার অজানা নয়। এক সময়ে অলক কিছু মনস্তত্ত্বের বই লাইব্রেরী থেকে এনে পড়েছিল। তাই জানত, এই জাতীয় অভিজ্ঞতাকে বলে 'প্যারামনেসিয়া'—বাঙলায় গিরীন্দ্রশেখর যাকে বলেছেন 'স্মৃত্যাভাস'। যে ঘটনা প্রকৃতপক্ষে প্রথম শুনছি বা দেখছি, এ রকম স্মৃতিবিভ্রমের ফলে হঠাৎ মনে হয়, যেন পূর্বেই এ ঘটনা চোখের সামনে ঘটতে দেখেছি। চোখের সামনে না হক, মনের সামনে—হয় স্বপ্নে, নয় বইয়ে-পড়া বিদ্যা, কিম্বা সিনেমায়

দেখা ছবি, নিদেন কারও কাছে শোনা গল্প। কোন কারণে হয়তো তারপর সেই স্মৃতির উপর পড়েছে বিস্মৃতির একটা প্রলেপ। স্পষ্ট দেখা যায় না, কুয়াশাঘন একটা আবছায়া চেতন-মনের সামনে মাঝে মাঝে বিদ্যুৎ চমকের মত জেগে ওঠে। অন্তত বার্গস প্রভৃতি কয়েকজন মনস্তত্ত্ববিদ পণ্ডিতের মতে এ জাতীয় স্মৃত্যাভাসের পিছনে কোন না কোন বাস্তব অভিজ্ঞতা থাকেই থাকে। ওর ক্রমাগত মনে হচ্ছে ঐ ভর্তৃহীনা জবালার দুঃখ সে বুক পেতে সহ্য করেছে ইতিপূর্বেই। জানা গানের বাণীহীন বেদনাবিধুর সুরের রেশের মত ওর মনে একটা তান গুনগুন করে ফিরতে থাকে!

তৃতীয়ত করবী। সে কেন একঝুড়ি মিথ্যার পশরা ওর সামনে···

হঠাৎ ককিয়ে উঠল ঘরের টেলিফোনটা। অলক হাত বাড়িয়ে তুলল সেটাকে।

—হ্যালো?

—কই রিং-ব্যাক করলেন না তো? সারাটা দিন বসে আছি ফোনের সামনে।

বুঝতে অসুবিধা হয় না। শুধু কে ফোন করছে তাই নয়, কেন ফোন করছে তাও। অনুশোচনা! অলক গাম্ভীর্য বজায় রেখেই বলে, লালগড় ফটো স্টোর্স থেকে বলছেন? কালকে সেই এক্সপোজড ফিল্মটার বিষয়ে?

—ইয়েস স্যার! এখন পরীক্ষা করে দেখা গেছে সেটা পুরোপুরি এক্সপোজড নয়। সে এক্সপোজড হতে চায়। সব খুলে মেলে ধরতে চায়। বুঝেছেন?

অলক চুপ করে থাকে। এর পর কী করণীয় তার? একটু ভেবে নিয়ে বলে, বেশ, বলুন?

—অমন এক নিঃশ্বাসে বলা যায় নাকি? আমাকে অনেক কথা যে বলতে হবে—

—অনেক কথাই বলুন। আমার এখন অখণ্ড অবসর—

—অখণ্ড অবসরই যদি থাকে তবে চলে আসুন না। কাল থেকে এককাপ কফি আপনার জন্যে অধীর প্রতীক্ষায় প্রহর গুনছে—

অলক বলে, আলোচনাটা কী আবার আপনার মেড সার্ভেন্টের সামনে হবে?

করবী তৎক্ষণাৎ বললে, স্থূল কথাটা তাহলে আগেই সেরে রাখি—এক নিঃশ্বাসেই। আমি অনুতপ্ত। আমাকে ক্ষমা করুন।

—ওটা আমার প্রশ্নের জবাব নয়—

—কী আশ্চর্য! আপনার রাগ পড়বে কী করলে? আমি হাত জোড় করতে পারি, কিন্তু সে তো আপনি দেখতে পাবেন না, মিছামিছি টেলিফোনটা হাত থেকে পড়ে ভাঙবে—

boiRboi.net

—এটাও আমার প্রশ্নের জবাব নয়। আমার প্রস্তাব—আমাদের বোঝাপড়াটা আপনার মেড সার্ভেন্টের অলক্ষ্যেই হওয়া বাঞ্ছনীয়। আজ রাত্রে আমার সঙ্গে ডিনার করবেন?

—নাঃ। আপনি সত্যিই ভাল লোক। আপনাকে কফিটা পর্যন্ত খেতে দিলাম না—আর আপনি আমাকে ডিনারে নিমন্ত্রণ করছেন? তবে একটা কথা—'আপ্যায়নে' নয়। ওখানে সবাই আমাকে চেনে—

—বেশ। তাহলে আপনার বাড়ির কাছাকাছি পেট্রোল পাম্পটার পাশে যে চীনা-রেস্তোরাঁটা আছে—বাই দ্য ওয়ে, চীনা খাবার আপনার রোচে তো?

—ডেলিশাস্! প্রন চাও মিন আর চিলি-চিকেন!

—ঠিক আছে। এখন ছয়টা। ধরুন সাড়ে আটটায়?

—তাই সই। একটা কথা বলি। মুখোমুখি হয়তো কথাটা বলতে সঙ্কোচ হবে। টেলিফোনেই বলি—কাল আমার মাথার ঠিক ছিল না কেন জানেন? প্রমীলাদির টেলিফোন শুনে বুঝতে পারলাম আপনার কাছেই সেদিন ইন্টারভিয়ু দিয়েছি। তখনই আমার মনে হল—টেলিফোনটা রেখেই আমি ঘুরে দাঁড়ালাম, দেখলাম আপনি একদৃষ্টে আমার দিকে তাকিয়ে আছেন—আমার মনে হল, আমার গায়ে শাড়ি-ব্লাউস-ব্রা কিছু নেই: আমি···আমি·· উলঙ্গ হয়ে দাঁড়িয়ে আছি আপনার সামনে। শুধু তাই নয়, যেন আমার গায়ের চামড়া, মাংস ভেদ করে আপনি রঞ্জনরশ্মির দৃষ্টিতে আমার অন্তরেন্দ্রিয়গুলিও দেখতে পাচ্ছেন—আমার পাকস্থলী, হৃৎপিণ্ড, যকৃৎ···

—থাক করবী দেবী। কিন্তু আপনি ভুল করেছিলেন। আপনার বোঝা উচিত ছিল, তেমন করে যাকে আমি দেখছিলাম সে আপনি নয়, আপনার কপোল-কল্পিত কাহিনীর নায়িকা—যার স্বামী মারা গেছে মটর অ্যাকসিডেন্টে, যার···

—থাক! রাত সাড়ে আটটা পর্যন্ত ও আলোচনা মুলতুবী থাক। তবে আরও একটা কথা—সব কৈফিয়ৎ আপনাকে দিতে পারব না কিন্তু—

—কৈফিয়ৎ তো চাইনি আমি। আমাকে কেন দেবেন? আপনাকে বলেছিলাম আপনার বিবেকের কাছে কৈফিয়ৎ দিতে—

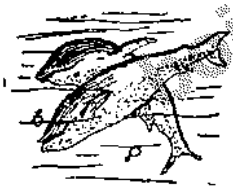

BanglaBook.org

নোয়ামি যখন ইণ্টারভিয়ু দিয়ে বাড়ি ফিরে এল তখন ওর মনটা অনেক হালকা হয়ে গেছে। আজ ক্রিসমাস ঈভ। চব্বিশে ডিসেম্বর। স্থির করেছিল বাড়ি ফিরে কেটিকে নিয়ে বাজারে যাবে। কিছু কেনাকাটা করবে। আগামীকাল সে তার বাড়িতে ছোট্ট একটি ডিনারের আয়োজন করেছে। দুটি মাত্র নিমন্ত্রিত অতিথি। পাশের বাড়ির মিস্টার রঙ্গচারী এবং করবী বাসু। লালগড়ে ওর পরিচিত বন্ধুবান্ধবী বড় কম নয়। তা হোক, নোয়ামি তার মধ্যে বেছে-বেছে মাত্র দুজনকে নিমন্ত্রণ করেছে। বিশেষ কারণে। উৎসবের দিনে সব বাড়িই হবে জমজমাট। স্বামী-স্ত্রী, পুত্র-কন্যা, মেয়ে-জামাই। ওর পরিচিত দুনিয়ায় ও দুজনকে লক্ষ্য করেছে যাদের নিঃসঙ্গতাটার কথাই সর্বাগ্রে মনে পড়ে। পাশের ফ্ল্যাটের মিস্টার রঙ্গচারী। উইডোয়ার। একা মানুষ। আর জিতেন্দ্রনাথের বিধবা নিঃসঙ্গী নায়িকা করবী বাসু। ওদের দুজনকে নিয়ে সান্ধ্য-আসরটা জমাবে স্থির করেছিল। রান্নাবান্না সব নিজেই করবে। মিস্টার রঙ্গচারী দাক্ষিণাত্যের লোক হলেও আমিষাশী। করবী বিধবা হয়েও তাই। নোয়ামি স্থির করেছিল রাঁধবে—চিকেন-স্যুপ, ভেটকির ফ্রাই আর ফিঙ্গার চিপস্, ফ্রায়েড-রাইস্ অ্যাণ্ড রোস্ট। পুডিং বাদ। ফ্রুট-স্যালাডও নয়। ডেনার্ট হিসাবে ক্রিস্টমাস কেক তো থাকবেই। নোয়ামি তাই ভেবেছিল কেটিকে নিয়ে সন্ধ্যার পর বাজারে বেরুবে একবার—কেনাকাটি করতে। আজ রাত্রে অবশ্য ডিনারে নিমন্ত্রণ করেছেন মিস্টার রঙ্গচারী। নিজে রেঁধে খাওয়ানো তাঁর পক্ষে সম্ভবপর নয়—তাই টেবল্ বুক করেছেন একটি চীনা-রেস্তোরাঁয়। ওদের পাড়াতেই। নোয়ামি, রঙ্গচারী আর কেটি। রাত আটটায়। তা আটটার মধ্যে সে বাজার করে ফিরে আসতে পারবে।

নোয়ামি বাড়িতে এসে দেখল কেটি অনুপস্থিত। তালা খুলে ঢুকল ঘরে। সদর দরজার গা-তালার দুটি চাবি—একটি থাকে মায়ের কাছে একটি বেটি কেটির। একটু অসন্তুষ্ট হল নোয়ামি। মেয়ের কোন আক্কেল নেই। তাকে বারে বারে বলে রেখেছে সন্ধ্যার সময় বাজারে বেরুবে ঠিক সাড়ে পাঁচটায়, অথচ—

হাতঘড়ির দিকে একবার তাকিয়ে দেখল, পৌনে ছয়টা হয়ে গেছে। নোয়ামি এ সময় এক কাপ চা খায়। কেটি থাকলে সেই করে দেয়। আজ আর কোন উৎসাহ বোধ করল না। সদর দরজা বন্ধ করে রেডিওটা খুলে দিল। তারপর বাথরুমে ঢুকল।

হাসপাতালের ধরা-চূড়া খুলে সান্ধ্য-ভ্রমণের পোষাক পরে নিয়ে, অল্প প্রসাধন

BanglaBook.net

সেরে আবার বাইরের ঘরে যখন ফিরে এল তখন সাড়ে ছটা। কেটির তখনও পাত্তা নেই: স্থির করল আর পনের মিনিট অপেক্ষা করে একাই বেরিয়ে যাবে। অপেক্ষাই যদি করতে হয় তবে চা-টা খেয়ে নেওয়া যাক। ইলেকট্রিক কেট্‌ল-এ বসিয়ে দিল জল। তখনই নজরে পড়ল টেবিলের উপর কেটির চিঠিটা, মাগো, রাগ কর'না, একটা ভালো ফিল্‌ম এসেছে। আমি আর বব্‌ দেখতে যাচ্ছি। আর একটা কথা, রাত্রে আমি খেয়ে ফিরব। রঙ্গচারীকাকাকে রাগ করতে বারণ ক'র। উনি বুঝবেন, এককালে ওঁর বয়সও তো ছিল ববের মত।

কী কাণ্ড! নোয়ামি রাগ করবে না হাসবে বুঝতে পারে না। বব্‌-এর সঙ্গে কেটির একটা মন-ক্ষাকষির পালা চলছিল—নোয়ামি জানে, দিনকতক ধরে। ব্যাপারটা নোয়ামিকে নিয়েই। সেই যে নোয়ামিকে মিস্টার রঙ্গচারীর স্টুডিয়োতে যেতে দেখে বব্‌ কী-একটা বাঁকা রসিকতা করেছিল তার পর থেকেই। হয়তো বড়দিনের উৎসবের আবহাওয়ায় সেই মান-অভিমানের পালাটা শেষ হয়েছে। এ-ক্ষেত্রে নোয়ামি রাগ করে কোন্ আক্কেলে? তার নিজেরও তো একদিন ঐ বয়স ছিল। বুড়ো-বুড়ির মাঝখানে চীনে হোটেলে নির্বাক ক্রিসমাস ঈভ করবে কেন সে—যদি তার তারুণ্যে ভরপুর সঙ্গী তাকে হাতছানি দেয় জ্যাজ-কম্যুটেটর নাচের আসরে?

রঙ্গচারী নিশ্চয় বুঝবে। কেটিই তো বলেছে—আংকলেরও একদিন ছিল ববের বয়স।

কেটির চিরকুটখানা হাতে নিয়ে দরজা খুলে বাইরে আসে নোয়ামি। পাশের ফ্ল্যাটের দরজায় কলিং-বেলটা টেপে।

—হ্যালো মিসেস্ স্মিথ। তোমার ঘড়ি ফাস্ট না আমার ঘড়ি স্লো?

—না না, সেজন্যে নয়। ডিনারে যাবার দেরী আছে জানি। শোন, কেটি এক কাণ্ড করেছে। একখানা চিরকুট রেখে পালিয়ে গেছে—

রঙ্গচারী ওর হাত থেকে চিঠিখানা নিয়ে পড়ে। হাসে। বলে, আমি কেটিকে দোষ দিতে পারি না। জীবন আর যৌবনকে ভোগ করারই তো বয়স তার।

—চা খেয়েছ অফিস থেকে এসে?

—না তো। কেন?

—আমি জল বসিয়েছি। একটু বাড়িয়ে দিচ্ছি। এ ঘরে এস। খাবে কিছু? ডিম আছে, রুটিও আছে?

—না, না, স্রেফ চা—এখন ডিম-রুটি খেলে রাত্রে ডিনারটা নষ্ট হবে।

BanglaBook.net

—সে তো খালি পেটে চা খেলেও হবে।

—তা ঠিক। তবে কিছু 'অ্যাপিটাইজার' খাওয়া যাক না। কেটি তো আর থাকছে না সঙ্গে। তোমার পা একটু টল্‌লেও ক্ষতি নেই। যা শীত পড়েছে।

নোয়ামি হাসে। বলে, হুইস্কি খাব না তাই বলে। অনেক দিন খাইনি।

—তুমি বরং জিন উইথ লাইম খাও। আমি নীট হুইস্কি চালাই—

এক ঘণ্টা পরে। নোয়ামির ড্রইংরুমে ওরা দু'জনে বসেছে। রঙ্গচারীর এটা তৃতীয় পেগ, নোয়ামির দ্বিতীয়। কিন্তু এই অল্প সময়ের মধ্যেই অনেক কিছু ঘটে গেছে ওদের দুজনের মধ্যে। নোয়ামি আজ সন্ধ্যায় মার্কেটিঙে যাবার প্রোগ্রাম বাতিল করেছে। কারণ ইতিমধ্যে রঙ্গচারী সাহস সঞ্চয় করে এতদিনের না-বলা কথাটা বলে ফেলতে পেরেছে।

পরিবেশটা অনুকূল ছিল। কেটি অনুপস্থিত। আসন্ন উৎসবের আমেজে মনটা দুজনেরই উচ্ছল। তার উপর কেটির চিরকুটে এমন কিছু ছিল যাতে ওদের মনে একটা নূতন প্রতিক্রিয়া হয়েছে। সর্বোপরি হুইস্কি আর জিন খুলে দিয়েছে মনের শেষ আগলটা!

নোয়ামি ধৈর্য ধরে শুনেছে। জবাবটা দেয়নি। বলেছে, সে ভেবে দেখবে। দু-একদিনের ভিতরেই সে জবাবটা জানাবে। তাড়াহুড়ো করার উচ্ছল দিনগুলি দুজনেই ফেলে এসেছে অনেক অনেকদিন আগে—বিপত্নীক রঙ্গচারী এবং বিধবা নোয়ামি স্মিথ। এখন যা করার ধীরে-সুস্থে বুঝে-সুঝে করতে হবে। হ্যাঁ, দুজনেই ওরা অবলম্বন খুঁজছে। রঙ্গচারীর জীবন ঊষর—মরুপান্থশালা তার নজরেই পড়ে না; আর নোয়ামিও জানে তার একমাত্র মরুদ্যানটা মরীচিকার মতই মিলিয়ে যাবে অচিরে—যেদিন কেটি ববের হাত ধরে এসে বলবে, মা, আমরা তোমার অনুমতি চাইতে এসেছি।

অনেকক্ষণ দুজনেই চুপচাপ। শেষে নীরবতা ভেঙে নোয়ামি বললে, মিস্টার রঙ্গচারী—

বাধা দিয়ে প্রৌঢ় মানুষটি বলে ওঠে, এখনও মিস্টার রঙ্গচারী? এখনও কী আমরা ডাকনামের সমতলে নেমে আসব না? অন্তত আজ রাতে?

নোয়ামি মাথা ঝাঁকিয়ে বললে, সেটাই আমার প্রশ্ন। আমার মনে হয় সব কথা তোমাকে খুলে বলা দরকার। তুমি শোন। শুনে তারপর বল, আমরা ফার্স্ট-নেমের সমতলে নেমে আসব কিনা।

—সব কথা মানে? কী কথা?

BanglaBook.org

—আমার জীবনের ইতিহাস। সেটা শুনে তুমি আবার বিবেচনা করে দেখ আমাকে যে প্রস্তাব করেছ সেটা উইথড্র করবে কিনা।

ভ্রূ কুঞ্চিত হল রঙ্গচারীর। বললে, কী এমন কথা? বল? আমি কর্ণময়।

নোয়ামি আবার শুরু করল তার ইতিহাস। আজ দীর্ঘ ষোলটি বছর সে এই ইতিহাসকে গোপন রেখেছে। কখনও কাউকে মন খুলে বলেনি। কেটিকে তো নয়ই। ওর ধারণা ছিল এসব কথা কাউকে কোনদিন বলা যাবে না। আজই—এই তো ঘণ্টাচারেক আগে দেখেছে—না বলা যায়। বলতে বাধে না কোথাও। তখন সামনে একটা পর্দা ছিল, এখন নেই। না থাক, নোয়ামি পারবে। সব কথা আবার খুলে বলতে পারবে। রঙ্গচারীর জানা উচিত। জানা দরকার। কেটিকে কন্যাত্বে বরণ করার আগে তার জানা প্রয়োজন কেটি হচ্ছে, যাকে বলে··· হ্যাঁ, অস্বীকার করে লাভ কী? বাস্টার্ড!

দীর্ঘ সময় ধরে নোয়ামি বলে গেল তার কাহিনী। তার প্রেমের কথা, তার বঞ্চনার কথা। ঠিক যে ভাষায় সে বলেছে ঘণ্টা-চারেক আগে সেই অজ্ঞাতকুলশীল প্রশ্নকারীকে। শুধু তফাৎ এই: এবার কাহিনীর নায়িকা 'মারা' নয়, নোয়ামি; নায়ক 'আচারিয়া' নয় 'আয়াঙ্গার'—এবার ওর ভাই নোয়েল নয়, ভিনসেন্ট।

একসময় শেষ হল ওর গল্প। নোয়ামি ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বললে, সাড়ে আটটা বাজে। চল যাই এবার ডিনারে—

রঙ্গচারী বললে, গল্পটা শুনে আমার কী প্রতিক্রিয়া হল জানতে চাও না?

—না, এখনই নয়। এখন গল্পটা হুইস্কিতে ডাইলিউট হয়ে আছে। কাল যখন সুস্থ স্বাভাবিক হবে তখন গল্পটাকে বিচার কর। ভেবে দেখ—ঐ বাস্টার্ড 'কেটি'কে তুমি সহ্য করতে পারবে কিনা। না হলে তার বিবাহ পর্যন্ত তোমাকে অপেক্ষা করতে হবে।

রঙ্গচারী বললে, ঠিক আছে। চল যাওয়া যাক।

দু-জনে দু-ঘরে চাবি দিয়ে রওনা হল। স্কুটারে। রঙ্গচারী চালাচ্ছে। নোয়ামি বসেছে তার পিছনে। দু-হাত দিয়ে বেষ্টন করে ধরে রেখেছে চালকের মাঝটা!

ওদের দুজনের কারও লক্ষ্য হল না ইউক্যালিপটাস গাছটার পিছনে লুকোনো একজোড়া চোখ ওদের লক্ষ্য করছিল।

boiRboi.net

স্কুটারটা মিলিয়ে যেতেই ইউক্যালিপটাসের আড়াল থেকে বেরিয়ে এল কেটি। সে এসেছে অনেকক্ষণ—তা ঘণ্টাখানেক আগে। বাড়িতে ঢোকেনি। বসেছিল ওদের ড্রইংরুমের বাইরে—অন্ধকারে, শীতের মধ্যে। নোয়ামি সদর দরজাটা বন্ধ করেনি। সেটা বিসদৃশ দেখাতো যদি কেটি ফিরে আসে, অথবা আর কেউ দেখা করতে আসে—রুদ্ধদ্বার কক্ষে রঙ্গচারী আর নোয়ামি। তাই সদর দরজাটা খোলাই ছিল। পর্দা ঝুলছিল শুধু। নিঃশব্দ চরণে কেটি ফিরে এসেছিল বাড়িতে। ঢোকেনি। আড়াল থেকে লুকিয়ে সে দেখতে চেয়েছিল, বুঝে নিতে চেয়েছিল। জানতে চেয়েছিল—ববের সেই কুৎসিত রসিকতাটার কতটা সত্যি, কতটা মিথ্যা। না, অহৈতুক কৌতূহল নয়। ও জানতে চেয়েছিল ও নিজেই কি মায়ের সুখের পথে কাঁটা হয়ে বিরাজ করছে। তাই নিখুঁতভাবে একটি ফাঁদ পেতে আড়ালে সে বসেছিল। জানত—দুজনের ডিনারের অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে। এমন শীতের রাতে প্রাক-নৈশ-আহার ড্রিংক করবেই ওরা—বিশেষ কেটি যখন অনুপস্থিত।

কেটি যা আশা করেছিল তার চেয়ে অনেক বেশি দেখল, অনেক বেশি শুনল, বুঝল। ও হঠাৎ জানতে পারল ডক্টর স্মিথ একটা অলীক মায়া। যে গালাগালটা সবচেয়ে খারাপ—ওর মা অনায়াসে সেই গালাগালটাই দিয়েছে ওকে; কেটির অসাক্ষাতে, তাকে উদ্দেশ্য করে। বলেছে, কেটি বাস্টার্ড!

হাসল কেটি। বাস্টার্ড! বাঃ গালাগালটা কেটিরই প্রাপ্য। কিন্তু অপরাধটা? কেটির দায়িত্ব কতটা? আজ কেটিকে বোঝা বলে মনে হচ্ছে ওর মায়ের, কিন্তু সে তো আকাশ থেকে স্টর্কের ঠোঁটে ঝুলতে ঝুলতে এ দুনিয়ায় নেমে আসেনি। তাহলে?

অনেকক্ষণ পায়চারি করল রুদ্ধদ্বার কক্ষে। কী করবে সে এখন? তার পিতৃ-পরিচয়হীন জীবন শেষ করে দেবে? অনায়াসেই তা করা যায়। মায়ের অনিদ্রা রোগ আছে। ঘুমের বড়ি কোথায় থাকে ও জানে, আর নার্সের মেয়ে হয়ে তার জানতে বাকি নেই ন্যূনতম কয়টা বড়ি হচ্ছে 'ফেটাল ডোজ'।

কিন্তু না। কেন মরবে সে? কার উপর অভিমান করে? সে তো সবার চোখেই অবাঞ্ছিতা নয়। বব্ তো তারই পিছনে ঘুরঘুর করছে আজও—কেটিই তাকে পাত্তা দিচ্ছে না ইদানীং। ববের চেয়েও লোভনীয় আকর্ষণ আছে আর একজন। রমলাদি, সরমাদি, শীলাদির মায়া কাটিয়ে যে ছেলেটা কেটি-সুন্দরীকেই বরণ করে নিয়েছে। একমাত্র কেটিকেই। মনমোহন দস্তুর। সে ওকে কথা দিয়েছে আগামী সপ্তাহেই কেটিকে নিয়ে বোম্বাই পালাবে। বোম্বাইয়ে ওর ফ্ল্যাট

boiRboi.net

আছে সেখানে গিয়ে উঠবে প্রথমে। ওর প্রথম ফিল্মের নায়িকা হবে—সে তো দস্তুর বলেই রেখেছে। তারপর ও হবে ডাইরেক্টারের ঘরণী!

না। আত্মহত্যা করবে না কেটি। মাকে বরং মুক্তি দিয়ে চলে যাবে। পথের কাঁটা সরে গেলে রঙ্গচারীও নিশ্চয় আপত্তি করবে না। আশ্চর্য লোক কিন্তু ঐ রঙ্গচারী। যে মুহূর্তে শুনল কেটি জারজ—কেটির এ দুনিয়ায় আসার ছাড়পত্র নেই, অমনি গুটিয়ে গেল লোকটা! এত প্রেম হাওয়ায় উপে গেল!

ঘড়ির দিকে নজর গেল। রাত নটা। আর ঘন্টাখানেকের মধ্যেই ফিরে আসবে ওর মা আর রঙ্গচারী। প্রৌঢ়া প্রেমিক-প্রেমিকা। তার আগেই কেটি বিদায় নেবে। চিরকালের জন্য। একটা ছোট হাতব্যাগে তাড়াতাড়ি গুছিয়ে নিল কাপড়-চোপড়। পকেটমানি যে কটা টাকা বাকি ছিল তাই নিল শুধু। মা কোথায় টাকা রাখে তা ও জানে—কিন্তু না, এরপর মায়ের টাকায় সে হাত দেবে না। দস্তুরই তো আছে। লেটার-প্যাডটা টেনে নিয়ে মাকে শেষ পত্রটা লিখতে বসল। সম্বোধন করল না কিছু। সোজাসুজি বক্তব্য—

'দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে সব শুনেছি আমি। মিস্টার রঙ্গচারীকে বল, তাঁর সিদ্ধান্তের পথে যে একমাত্র বাধা ছিল সে চিরতরে বিদায় নিয়েছে। তোমাদের জীবনে আমি কোন ছায়াপাত করতে আর কখনও ফিরে আসব না। আমাকে বৃথা খোঁজাখুঁজি কর না। আমি আমার পথ খুঁজে পেয়েছি। বব্‌কে অহেতুক প্রশ্ন কর না। সে কিছু জানে না। টাকাকড়ি কিছু নিলাম না। আমার ঘড়ি আর আংটিটা খুলে রেখে গেলাম। কার সঙ্গে যাচ্ছি সে কথা বলব না। কোথায় যাচ্ছি শুধু সেইটুকুই বলি, বোম্বাই!

মস্ত শহর। খুঁজে পাবে না আমাকে। এত জায়গা থাকতে বোম্বাই কেন? সেই শিক্ষাই যে দিয়েছ তুমি! মেরিন-ড্রাইভ, এলিফান্টা কেভ, জুহুবীচ! মনে পড়ে?···তোমরা সুখী হও—আজ ক্রিসমাসের শুভসন্ধ্যায় এই শুভেচ্ছা জানিয়ে গেলাম। ইতি তোমার বাস্টার্ড কন্যা!"

চিঠিখানা টেবিলের উপর কাগজচাপা দিয়ে রেখে কেটি টেলিফোনটা তুলে নিল। ডায়াল করল আপ্যায়ন—রুম নং ৩০৫।

—হ্যালো?

—কেটি।

—কী ব্যাপার?

—তুমি ঘরে থাক। আমি এখনই যাচ্ছি—

—এই না। আমি এখনই বের হচ্ছি। জরুরী দরকার—

boiRboi.net

—যতই জরুরী হক, তার চেয়ে আমার ব্যাপারটা জরুরী। তুমি অপেক্ষা কর। আমি আধঘন্টার মধ্যে আসছি।

জবাবে রূঢ় শোনালো দস্তুরের কণ্ঠস্বর, ছেলেমানুষি কর না কেটি! বলছি এখন আমি বেরিয়ে যাচ্ছি। তোমার যা দরকার তা কাল সকালে এসে বল—

কিন্তু এরপর একটা রাত কেটি কেমন করে থাকবে এ-বাসায়? আর মোহন এমন অবুঝ হচ্ছে কেন? এই রাত্রে কী তার দরকার? কোথায়? বললে, কাল সকালে বললে হবে না। আজ রাত্রেই আমি গৃহত্যাগ করছি। তোমার সঙ্গে! তুমি তৈরি হয়ে নাও। ভোর রাতের ট্রেনে আমরা যাব।

—কী পাগলামি করছ? হয়েছে কী তোমার?

—তুমি অপেক্ষা কর। আধঘন্টার মধ্যে গিয়ে সব বলছি তোমাকে—

দস্তুরকে জবাব দেবার সুযোগ না দিয়ে কেটি লাইন কেটে দিল।

ট্যাক্সি নিয়ে আপ্যায়নে পৌঁছতে আধঘন্টাও লাগেনি। দস্তুর প্রস্তুত হয়ে অপেক্ষা করছিল ঘরে। তার সাজ-পোশাক দেখে মনে হচ্ছে তার কোথাও ডিনারের নিমন্ত্রণ আছে। অথবা অভিসারের। সে সব নজরই হল না কেটির। সংক্ষেপে সে তার সঙ্কল্পের কথা জানালো। সে গৃহত্যাগ করে চলে এসেছে। বাড়িতে চিঠি লিখে রেখে এসেছে। হয়তো এতক্ষণে সেটা তার মা পড়েছে। অথবা আর আধঘন্টার মধ্যেই পড়বে। ফেরার পথ তার রুদ্ধ। এখন শুধু সামনে এগিয়ে যাবার পথটাই খোলা। বললে, তুমি তৈরি হয়ে নাও মোহন। রাত বারোটা দশের মেলেই আমরা পালাব দুজন।

—মাইরি! তুমি কি ভাব তোমার হুকুম মত সব ফেলে-ছড়িয়ে দুদ্দাড়িয়ে পালাতে হবে আমায়?

—তুমি আমার বিপদের কথাটা বুঝতে পারছ না। আমি আর কিছুতেই ফিরতে পারব না বাড়িতে। তুমি আজ যদি না যেতে পার তাহলে—বেশ, আমাকে প্যাসেজ মানি আর তোমার ফ্ল্যাটের চাবিটা দাও। আমি আজ রাত্রেই বম্বে চলে যাব। তুমি দু-চারদিন পরে গুছিয়ে নিয়ে এস।

দস্তুর ওর মানি-ব্যাগ খুলে একটা একশ টাকার নোট বার করে বললে, নাও ধর।

মাত্র একশ টাকা? থার্ডক্লাসের টিকিট কাটলেও যে—

সে ভাব গোপন করে বললে, আর তোমার ফ্ল্যাটের ঠিকানা? চাবিটা?

দস্তুর গম্ভীর হয়ে বললে, বোম্বাই নয় কেটি, অন্য কোথাও যাও।

—অন্য কোথাও! কোথায়?

boiRboi.net

—তার আমি কী জানি? বাড়ি ছেড়ে পালাতে চাও, পালাও, আমি বাধা দেবার কে? কিন্তু প্লীজ! আমার স্কন্ধে নয়।

বজ্রাহত হয়ে গেল কেটি। ঢোক গিলে বলে, কী বলছ তুমি! তার মানে?

দস্তর একটা সিগ্রেট ধরালো। বললে, তুমি তোমার বার্থ সার্টিফিকেটটা দেখেছ কোনদিন?

—বার্থ সার্টিফিকেট!—আকাশ থেকে পড়ল কেটি।

—হ্যাঁ। বার্থ সার্টিফিকেট। আনলেস য়ু আর এ বাস্টার্ড তোমার একটা জন্মস্বীকৃতি পত্রিকা থাকার কথা। সেটা দেখেছ কোনদিন? তাহলে তোমার জানা থাকা উচিত যে, তুমি নাবালিকা। আইনসম্মত অভিভাবিকার কাছ থেকে তোমাকে অপহরণ করলে আমাকে ডোরাকাটা হাফ-প্যান্ট পরে কপি বুনতে হবে, বুঝলে?

ঠোঁট দুটি নড়ে উঠ্‌ল কেটির। দাঁত দিয়ে নিচের ঠোঁটটা কামড়ে কোনক্রমে বললে, এতদিন তাহলে কেন আমায়···

—নাও ধর!—নোটখানা বাড়িয়ে ধরে দস্তর, যোগ করে, যৌবনকে আমি একাই উপভোগ করিনি কেটি! তোমাকেও আমি ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোনদিন···

—য়ু সোয়াইন।—কেটি একটা চড় মারতে যায়; কিন্তু দস্তর প্রস্তুত ছিল। এমন একটা আঘাত যে কোন মুহূর্তে আসতে পারে তা জানা ছিল তার। বোধকরি এমন অভিজ্ঞতা তার আজ নতুন নয়। খপ্‌ করে কেটির উদ্যত হাতটা ধরে ফেলে বলে, আমার পরামর্শ শুনবে? এখনই একটা ট্যাক্সি নিয়ে বাড়ি চলে যাও। তোমার মা হয়তো চিঠিখানা দেখেনি এখনও! তাহলে সমস্ত ব্যাপারটা চেপে যাও!

ঝড়ের মত ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যায় কেটি।

দস্তর দরজা পর্যন্ত ওকে এগিয়ে দেয়। প্রায় টলতে টলতে কেটি নেমে যায় সিঁড়ি দিয়ে। দস্তর হাসে। সিগ্রেটে টান দেয়। খেয়াল হয় ওর বাঁ-হাতে ধরা আছে একখানা একশ টাকার নোট। খুশিই হয় দস্তর। বেমক্কা এখনই একশ টাকা লোকসান হতে বসেছিল তার। নোটটা পকেটে রাখে। এবং তখনই ওর হাতে ঠেকে আর একখানা কাগজ। মুখভাব বদলে যায় মুহূর্তে। কুঁচকে ওঠে ভ্রূ। অন্যমনস্কভাবে পকেট থেকে বার করে কাগজটা। আবার পড়ে। এবার নিয়ে সারা দিনে বোধকরি বিশবার পড়ল চিরকুটখানা—অথচ তার রহস্য ভেদ করতে পারেনি। রিসেপশান কাউন্টারে চাবির কবুতর খোপে ওর চিহ্নিত কুটুরিতে ছিল বন্ধ-খামে এই চিঠিটা। কে কখন রেখে গেছে রিসেপশন জানে না। কে রেখেছে?

boiRboi.net

কার মাথাব্যথা পড়েছে এমন একটা মারাত্মক রসিকতা করার। লাইনটানা একটা নোটবুকের পাতায় আঁকা-বাঁকা হরফে শুধু লেখা আছে :

"আই নো এভরিথিং। গো এ্যাওয়ে! অর এল্‌স্ আ'ল টেল ড্যাড। মুন্না।"

—আমি সব জানি। ভাগো! নইলে বাবাকে বলে দেব। মুন্না!

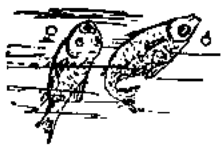

আজ আর ধুতি-পাঞ্জাবি নয়। অলক আজ স্যুটেড-বুটেড। ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখল। রাত আটটা। ট্যাক্সি নেবে না। মাইলখানেক রাস্তা তো মোটে। শীতের রাত্রে হাঁটতে ভালই লাগবে। শর্মা এখনও ফেরেনি। কোথায় কোথায় মটর বাইকে চেপে ঘুরছে হতভাগা তা ও-ই জানে। ইন্টারভিয়ুর তালিকা শেষ হয়ে এসেছে। কাল বড়দিনের বন্ধ। পশু দিন বাকি পনের জনের ইন্টারভিয়ু নেওয়া শেষ হয়ে যাবে। ডঃ ত্রিবেদী খুব খুশি। এ পর্যন্ত কাজ খুব ভালই হয়েছে। কাল-পশু নাকি মিস্টার কানোরিয়া আসছেন লালগড়ে। এখানে একটা প্রেস কনফারেন্স হবার কথা। এ পর্যন্ত কী করেছেন না করেছেন তার একটা সংক্ষিপ্ত বিবৃতি দেবেন ডঃ ত্রিবেদী। অলক তার সঙ্কলিত রিপোর্টগুলি দাখিল করেছে। সবগুলি নয়,—এখনও দুটি রিপোর্ট সে নিজের কাছে রেখেছে। করবীর থানা এবং সেই নার্স-ভদ্রমহিলার। কারণ ছিল। সেই যে চার-সন্তানের পুত্রহীনা জননী—তাঁর রিপোর্টখানা ডঃ ত্রিবেদী অকারণে বাতিল করেছেন। এ নিয়ে অলকের সঙ্গে কিছু কথা-কাটাকাটিও হয়েছে তাঁর। ডঃ ত্রিবেদীর মতে ঐ রিপোর্টখানা টেক্‌নিক্যালি গ্রহণযোগ্য নয়। ভদ্রমহিলা প্রশ্নোত্তরের আকারে জবানবন্দি দেননি—একটা উপন্যাসের প্লট ফেঁদেছেন। ওঁর বৈজ্ঞানিক সমীক্ষায় তা নাকি অপ্রয়োজন। প্রক্ষিপ্ত। অলক বোঝাতে চেয়েছিল—তাঁর কেসটা একটা অত্যন্ত টিপিক্যাল কেস। লাখে একটা অমন ব্যতিক্রম নজরে পড়ে। আর সেজন্যই তার মূল্য অনস্বীকার্য। পরিকল্পনার একটি অনালোচিত দিক উদ্ভাসিত করেছেন উনি। তিন-চারটি সন্তান থাকলে চিরতরে নিষ্কৃতি পাওয়ার চেষ্টাটা ঠিক

BanglaBook.org

উচিত কিনা এ প্রশ্ন তিনি তুলেছেন। সঙ্গত প্রশ্ন। কিন্তু ডঃ ত্রিবেদীর মতে ঐ সব ব্যতিক্রমগুলি সঙ্কলিত হলে গ্রন্থের রসাভাস ঘটবে; মূল বক্তব্য থেকে বিচ্যুত হবেন গবেষক। অলক তর্ক করেছিল—আপনার মূল বক্তব্য তাহলে কী? মূল বক্তব্যটা তো নিয়ন্ত্রিত হবে সমীক্ষার ফলাফল অনুসারে। নাকি, আপনি একটি পূর্বসিদ্ধান্ত করে রেখেছেন এবং যে উদাহরণগুলি সেই পূর্বসিদ্ধান্তের সঙ্গে খাপে খাপে মিলবে না সেগুলিকে আপনি টেকনিক্যালি বাতিল করবেন? ডক্টর ত্রিবেদী বলেছিলেন, ওসব তুমি বুঝবে না!

ক্রমেই ডক্টর ত্রিবেদীর এই সমীক্ষার উপর থেকে শ্রদ্ধাটা সরে আসছে। হয়তো ঠিকই বলেছিলেন ডঃ মজুমদার। ত্রিবেদীর আসল উদ্দেশ্য বৈজ্ঞানিক সমীক্ষা আদৌ নয়।

ঘরে তালা মেরে বেরুতে যাবে, হঠাৎ দেখে ডঃ আয়াঙ্গার এগিয়ে আসছেন এদিক পানেই, কী রায়সাহেব! এত সেজেগুজে বের হচ্ছেন কোথায়? ডিনারের নিমন্ত্রণ আছে নাকি?

আবার ঘরের তালা খোলে, আসুন, আসুন ডঃ আয়াঙ্গার। হ্যাঁ, ডিনারেরই নিমন্ত্রণ। তবে দেরী আছে।

—ডিনার? কোথায়? এখানে কি আপনার চেনা-শোনা কেউ ছিল নাকি? অথবা নতুন আলাপ?

—নতুন আলাপই বলতে পারেন। মহিলা-সমিতিরই এক সভ্যা—

—কী সর্বনাশ! লালগড় মহিলা-সমিতির সভ্যারা যে আমাদের 'টাবু'!

ডঃ ত্রিবেদী জানতে পারলে কেলেঙ্কারি কাণ্ড হবে।

অলক সজ্ঞান মিথ্যাভাষণ করে, না, উনি আদৌ ইন্টারভিয়ু দেননি।

—তবু রক্ষে! তাহলেও বলি মশাই। ফাঁদে পা দেবেন না যেন; ওরা মায়াবিনীর জাত।

আয়াঙ্গার বসেন একটা সোফায়। বলেন, কাল ছুটি, আজ ক্রিসমাস ঈভে একটু বারে বসব ভেবেছিলাম। তা শর্মা না-পাত্তা; আপনিও তো অভিসারে বের হচ্ছেন—

—অভিসারে নয়; মানে—

—আরে ঐ হলো মশাই। আমরাও কী বয়সকালে ওসব করিনি? জানেন রায়-সাহেব, পুণায় আমি তখন হাউস-সার্জেন। একেবারে প্রথম জীবন। একটি মেয়ে আমার প্রেমে পড়ল, যাকে বলে হেড-ওভার-হীলস্। আমার চেহারা বিশ্ব তখন—

boiRboi.net

বিদ্যুতস্পৃষ্টের মত উঠে দাঁড়ায় অলক। বলে, জাস্ট এ মিনিট, কী নাম বলুন তো নার্সটর ?

আয়াঙ্গার হতচকিত। বলেন, নাম ? নাম দিয়ে কী হবে ?—নাম নোয়ামি !

অলক পায়চারি শুরু করে। কপালে টোকা মারে। বিড়বিড় করে বলে, নোয়ামি ! নোয়ামি, নার্স !···মারা নয়, তাকে নিয়ে আপনি বোম্বাই পালিয়ে গিয়েছিলেন···এলিফান্টা···মেরিন-ড্রাইভ···জুহুবীচ ! হ্যাঁ মনে পড়ছে একটু একটু করে···

—কী মনে পড়ছে ? আপনি এতকথা জানলেন কেমন করে ?

অলক আবার বসে পড়ে ওঁর মুখোমুখি। বলে. লুক হিয়ার ডক্টর। যেদিন আপনি আপনার জীবনের প্রথম প্রেমের গল্প আমাদের শুনিয়েছিলেন মনে পড়ে ? তখন আপনিও ছিলেন 'বুজড্', আমরাও বেতালা। এক কান দিয়ে শুনেছি আর এক দিয়ে বার করে দিয়েছি। কিন্তু না, এতক্ষণে সব মনে পড়ে গেছে আমার।

আয়াঙ্গার মাথা নেড়ে বলেন, ইয়েস, এবার আমারও একটু একটু করে মনে পড়ছে। আয়াম সো সরি। অনেক আজেবাজে কথা বলেছি নোয়ামির নামে। তখন আমার একেবারে মত্তাবস্থা ! কী বলেছি, কিছুই মনে নেই অবিশ্যি। তবু যদি তার নামে কটু কথা কিছু বলে থাকি তবে আমি তা উইথড্র করছি। নোয়ামি ছিল দেবী !

অলক ওঁর হাতখানা চেপে ধরে বলে, ডক্টর ! এমন যদি হয়—ঘটনাচক্রে আপনি যদি আপনার প্রথম যৌবনের সেই বান্ধবীর সম্মুখীন হয়ে পড়েন কী করবেন ?

আয়াঙ্গার হেসে বলেন, সে সম্ভাবনা আদৌ নেই—কী জবাব দেব ?

ওঁর হাতের উপর চাপ দিয়ে অলক বলে, সত্য কখনও কখনও কল্পনাকেও ছাপিয়ে ওঠে ডক্টর—জবাব দিন আমার প্রশ্নের। যদি তার দেখা পান···

আয়াঙ্গার উদাস কণ্ঠে বললেন, সে যদি চিনতে না পারে পরিচয় দেব না, আর যদি চিনতে পারে তবে তাকে না-চেনার ভান করব। আফটার অল তার ছেলে-মেয়ে হয়েছে, সে একটা সংসারের কর্ত্রী। সে এখন মিসেস্ স্মিথ।

অলক প্রচণ্ড এক থাপ্পড় মারে ওঁর হাঁটুতে, য়ু ফুল ! য়ু ইডিয়ট !

ডক্টর আয়াঙ্গার চমকে ওঠেন। ব্যাপার কী ? অলক ততক্ষণে ওঁর সামনে মেলে ধরেছে একখানা রিপোর্ট, পড়ুন। মিসেস ২০৭৩-র জবানবন্দি !

আয়াঙ্গার নির্লিপ্তের মত একবার সেই রিপোর্টখানা আর একবার অলকের দিকে তাকিয়ে বলেন, কেন ? কী হবে এটা পড়ে ?

boiRboi.net

—রিড ইট, ওল্ড ফুল !

আয়াঙ্গার পড়তে শুরু করে। অলক একটা সিগ্রেট ধরায়। একটু দূরে গিয়ে বসে। আয়াঙ্গারের মুখের ভাব বদলাচ্ছে। তিল তিল করে বদলাচ্ছে। পড়ছে না, গোগ্রাসে গিলছে। অ্যাকসিলারেশান! ওর হাতটা কাঁপছে। চশমাটা খুলে কাচটা মুছে আবার নাকে চড়ালো। নিষ্প্রভাত রাত্রি নেই। শেষ হল এক সময়ে রিপোর্টখানা। মুখ তুলল আয়াঙ্গার। শুধু বলল, আশ্চর্য! সে এখানেই আছে? এই লালগড়ে?

—সে একা নয় ডক্টর। তোমার মেয়েও। সে আজ ষোড়শী!

—আই নো! ওকে খুঁজে বার করতেই হবে।

—সেটা খুবই সহজ—যখন জানা গেছে মিসেস ২০৭৩-র নাম মিসেস নোয়ামি স্মিথ।

—কিন্তু ওর নাম যে 'নোয়ামি' তা তো ও স্বীকারই করেছিল ওর জবান-বন্দিতে—তুমি খেয়াল করনি?

—কই? তো বলেছে ওর নাম 'মারা'।

হাসল আয়াঙ্গার। বললে, অলক, তুমি ইংরাজিতে এম. এ. পাশ করেছ অথচ ইংরাজি ভাষায় যে গ্রন্থের বিক্রি সর্বকালের বিশ্ব-রেকর্ড হয়ে আছে সে বইখানাই পড়নি? আমি 'দ্য হোলি বাইবেল'-এর কথা বলছি। 'নোয়ামি' আর 'মারা' তো একই মেয়ে, চাঁদের এ-পিঠ আর ও-পিঠ!

অলক অপ্রস্তুত হল। বললে, মনে পড়েছে এতক্ষণে—"কল্ মি নট্ 'নোয়ামি', কল মি 'মারা'!"

বাইবেল-বর্ণিত চরিত্র নোয়ামির স্বামী যখন মারা গেল, ও প্রতিবেশীদের বলেছিল—আমাকে আর 'নোয়ামি' বলে ডেক না, আজ থেকে আমার নাম 'মারা'।

এ যেন 'পান্না' নামের মেয়ে বলছে—আজ থেকে আমার নাম 'কান্না'; অথবা 'লক্ষ্মী' নামের মেয়ে, 'দুঃখী'!

BanglaBook.org

আজও প্রণবের প্রচণ্ড মাথা ধরেছে। অফিস থেকে এসেই আলো নিবিয়ে শুয়ে পড়েছে। শ্যামলী কোনই কূল-কিনারা দেখতে পাচ্ছে না। তবে কিছুদিন আগে পর্যন্ত সে প্রণবের রোগের উৎসটাই ধরতে পারছিল না—আজ যেন পারছে। প্রণব ঠিক কথাই বলেছে—এই লালগড়ের জল-হাওয়া ওর সহ্য হচ্ছে না। না, লালগড় স্বাস্থ্যকর জায়গা—শ্যামলী জানে; কিন্তু প্রণবের কেন সেটা সহ্য হচ্ছে না তাও কি এতদিনে বোঝে না শ্যামলী? বোধহয় প্রণবই ঠিক বলছে—শ্যামলীই ভুল করছে। এই তো জগতের নিয়ম—"আপনি বুঝিয়া দেখ, কার ঘর কর"। বিবাহের পরেও শ্যামলী মনেপ্রাণে মিসেস চ্যাটার্জি হতে পারেনি···সে হয়ে আছে 'প্রাক্তন মিস ব্যানার্জি।' লালগড়ে তার পরিচয় প্রণবের স্ত্রী বলে নয়, জি. এম.-এর মেয়ে বলে। তাতে কি সবটাই লোকসান? তা নয়, লাভের অঙ্ক ফুলে ফেঁপে উঠেছে। যেখানে যায়, সেখানেই খাতির! আহার-বিহার-পোশাক-পরিচ্ছদ সব কিছুই অতি উচ্চমানের। যা প্রণব চ্যাটার্জির স্ত্রীর পক্ষে কল্পনাতীত, যা জি. এম.-তনয়া হিসাবে খুবই স্বাভাবিক। শ্যামলী কী করবে? কী করতে পারে সে? জ্ঞান হবার পর থেকে সে যে এতেই অভ্যস্ত! সে কি রাঁধতে জানে? এঁটো বাসন ধুতে? কাপড় কাচতে? সংসারের কাজ বলতে ফ্রিজের বোতলগুলো মাঝে মাঝে ভরে রাখে—পর্দা বা বেড-কভারের রঙ পছন্দ করে দেয়, বড়জোর ধোবার হিসাবটা লিখে রাখে খাতায়। আলাদা সংসার করা কি চাট্টিখানি কথা? আর করবেই বা কেন? ড্যাডি কি ওকে তুলোর বাক্সয় মুড়ে রাখতে পরাঙ্মুখ?—'শমু-মা, তোমার মুখটা আজ ভার-ভার কেন? শমু-মা, তুমি অনেকদিন আমার সঙ্গে মার্কেটে যাচ্ছ না, এ তো ভাল নয়।' অথবা 'চল্ শমু আজ সন্ধ্যায় টেনিস ক্লাবে।' প্রণব কেন এই জীবন-ছকে মানিয়ে নিতে পারে না? তার পারা উচিত ছিল—

রাত্রে ডিনার টেবিলে নেমে এসে দেখল ড্যাডি একা বসে আছেন।

—মা আসবে না?

—ওর বাতের ব্যথাটা আবার চাগিয়েছে। ওর ডিনার ওপরের ঘরে দিতে বলেছি।

শ্যামলী লজ্জা পায়। এ খবর তারই আগে জানা উচিত ছিল। বাপ কেন মেয়েকে এ খবর জানাবে সারাদিন অফিস করে এসে? শ্যামলীরই জানবার কথা সেটা, জানাবার কথা। শ্যামলী জানত না। প্রণবের সঙ্গে কথা কাটাকাটি করতে করতেই বিকালটা কেটেছে। এতবড় কথাটা প্রণব ওকে বলে কোন্ সাহসে?

boiboi.net

ডঃ ব্যানার্জি বলেন, কই প্রণব এল না ?

—না। খাবে না বলল। আজও ওর মাথা ধরেছে।

—ও! আজ অবশ্য মাথা ধরার একটা হেতু আছে। তোকে বলেছে ?

—কী ?

—অফিসে আমাদের যেসব কথাবার্তা হয়েছে ?

—না তো! কী কথা ?

—ও! এখনও বলেনি তাহলে। বলবে। ওর কাছ থেকেই শুনিস্ বরং—

—না। তুমি বল।

ডঃ ব্যানার্জি ছুরি-কাঁটা সরিয়ে রেখে সোজা হয়ে বসলেন। ন্যাপকিনে মুখটা মুছে নিয়ে বললেন, তোর মনে আছে নিশ্চয়, কদিন আগে তোকে বলেছিলাম—প্রণবকে আমি একটা নতুন কাজের দায়িত্ব দেব ?

শ্যামলীর মনে পড়ে যায়। সেদিন টেনিস-ক্লাবে এমন একটা ইঙ্গিত উনি দিয়েছিলেন। সবটা সেদিন ভাঙেননি। বললে, হুঁ! সেই বিষয়ে আজ কথা হয়েছে তোমাদের ?

ব্যানার্জি ডেসার্ট-এর প্লেটটা টেনে নেন। বেয়ারা ওঁর অর্ধভুক্ত মাংসের প্লেটটা তুলে নিয়ে চলে যায়। গ্রীবা সঞ্চালনে ডঃ ব্যানার্জি জানালেন—কথা হয়েছে।

—নতুন অ্যাসাইনমেন্টটা কী ?

—আমরা একটা ওয়েস্ট জার্মান ফার্মের সঙ্গে আমাদের এক্সটেনশান স্কিমের মেশিনারি সাপ্লায়ের একটা কনট্রাক্ট করেছিলাম মনে আছে ? সেই যে কার্ল গুটেনডর্ফ নামে একজন জার্মান এসে কিছুদিন লালগড়ে ছিল ?

—হ্যাঁ মনে আছে। তাই কী ?

—ওদের ফার্মের সঙ্গে একটা মামলা বেধেছে। ওরা শর্ত মানছে না। মুশ্‌কিল হয়েছে কি মামলাটা লড়তে হবে ওয়েস্ট জার্মান কোর্ট-এ। কারণ কনট্রাক্টটা আমরা সেখানেই করেছিলাম। সেটাই ভুল হয়েছে আমাদের। তাই আমাদের সলিসিটারকে জার্মান-কোর্টে গিয়ে সওয়াল করতে হবে। অবশ্য জার্মান সলিসিটারকেই আমরা নিয়োগ করব—কিন্তু আমাদের তরফে দু-একজন উকিল থাকা দরকার। তাই আমি মিস্টার মেহরা আর প্রণবকে ওয়েস্ট জার্মানিতে পাঠাবো স্থির করেছি।

শ্যামলী লাফিয়ে ওঠে। ভারতবর্ষের বাইরে সে যায়নি। খুশিয়াল হয়ে বলে, গ্র্যাণ্ড হবে ড্যাডি! কবে যাব আমরা ? কদ্দিন থাকব ?

boiRboi.net

ত্রিদিবেশ মুখটা তুললেন না। নতনেত্রেই বললেন, 'আমরা' নয় শমু। প্রণব একাই যাবে—

—একা?—শ্যামলী মর্মাহত। ত্রিদিবেশ নীরব। সুতরাং প্রশ্নটাকে আরও সুনির্দিষ্ট করতে হয়, একা কেন?

—প্রণব তো বেড়াতে যাচ্ছে না। যাচ্ছে কোম্পানির কাজে। কোম্পানি দুজনের ব্যয়ভার বহন করবে কেন? মিস্টার মেহরাও ফ্যামিলি নিয়ে যাচ্ছেন না। প্রণব আমার জামাই বলেই তো আমি পক্ষপাতিত্ব করতে পারি না?

এতক্ষণে ত্রিদিবেশ চোখ তুলে তাকালেন কন্যার দিকে। শ্যামলী বলল না—মিস্টার মেহরা বিপত্নীক—তাঁর ছেলেমেয়েরা সবাই বড়, স্কুল-কলেজে পড়ছে। সে শুধু বললে, কতদিন বাইরে থাকতে হবে?

—তা কি বলা যায়? কোর্ট-কাছারির ব্যাপার!

—তবু আন্দাজ কতদিন?

—ধর মাস-ছয়েক—মিনিমাম!

—ও রাজী হয়েছে?

—তা হলে তো ল্যাঠা চুকেই যেত—ও বলেছে তোর সঙ্গে কথা বলে জানাবে।

—ও। তা কোম্পানি খরচ না দিলেও—

শ্যামলী থেমে যায়। ত্রিদিবেশ কথা বললেন না। তাঁর দৃষ্টিতে ফুটে উঠল একটা সাঙ্কেতিক চিহ্ন— '?'

শ্যামলী সামলে নিল নিজেকে। বাক্যটা সমাপ্ত করল অন্যভাবে—আমি নিজের খরচেই যেতে পারি!

—নিজের খরচ মানে? শুধু যাতায়াতের প্লেন ভাড়াই তো নয়, ছয়মাস—কী বাড়তে বাড়তে এক বছরও হতে পারে—এতদিনের খরচ কি সোজা কথা?

শ্যামলী এতক্ষণে সহজ হয়েছে। বললে, আমার গহনাও তো কম নেই—তাছাড়া তোমরা ওকে যে আউট-স্টেশন অ্যালাউন্স দেবে তাতেই কমদামী হোটেলে চালিয়ে নেব আমরা। আমি চাকরি-বাকরিও ধরতে পারি।

—পাগলামি করিস না শমু! বড়জোর 'ডিপেণ্ডেন্ট' ভিসা পেতে পারিস। তাতে তোকে ওখানে চাকরি করতে দেবে না। আর কোম্পানি ওকে পেমেন্ট করবে ভাউচারের এগেন্সটে। কোম্পানির একটা মর্যাদা আছে। সেকেণ্ড ক্লাস হোটেলে থাকতে দেবে কেন? ডব্‌ল্‌-বেড রুমের চার্জ—

—বুঝেছি।—শমু উঠে দাঁড়ায়।

BanglaBook.net

—কী বুঝেছিস ?—ত্রিদিবেশের কণ্ঠস্বরও কঠোর শোনায়।

—তুমি আমাকে ওর কাছ থেকে আলাদা করতে চাইছ !

—কী পাগলামী করছিস্ শমু ? আমার স্বার্থ ?

—আমার ছেলেপুলে না হওয়াতেই বা তোমার কী স্বার্থ ?

এবার ত্রিদিবেশও উঠে দাঁড়ান : মানে ?

—তুমিই মাকে দিয়ে আমায় বলাওনি ?—তুমি—তুমি চাও না আমি মা হই—

প্রচণ্ড ধমক দিয়ে ওঠেন ত্রিদিবেশ, স্টপ্ ইট ! কাকে কী বলছিস্ ?

শ্যামলী চেয়ারটা ঠেলে দেয়। অভুক্ত প্লেটটা সরিয়ে সে স্থানত্যাগের উদ্যোগ করে।

—কোথায় যাচ্ছিস ?

—ওর কাছে। ওকে আমার জবাবটা জানাতে—

— শমু ! কথা শোন। ব'স ! মাথা গরম করিস না। আমি যে ব্যবস্থা করছি তা তোর ভালোর জন্যই। কিছুদিন ছাড়াছাড়ি হয়ে থাকলেই ওর আকর্ষণটা বাড়বে ! ও তোর মূল্য বুঝতে পারবে। আমার আর কী স্বার্থ থাকতে পারে বল্ ?

শ্যামলী চলে যাচ্ছিল। ফিরে দাঁড়ায়। বলে, সেটা আমার মুখে শুনতে তোমার খুব খারাপ লাগবে ! ওটা বরং থাক !

—না। তুই বলে যা—

—শুনবে ? সারাজীবন আমাকে তোমার পুতুল করেই যদি রাখতে চাও তাহলে একটা নপুংসকের সঙ্গে আমার বিয়ে দিলে না কেন ?

ঝড়ের বেগে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যায় শ্যামলী।

দড়াম করে দরজাটা খুলে যায়। অন্ধকার ঘরে এক ঝলক আলো হুড়মুড়িয়ে ঢুকে পড়ে। প্রণব উঠে বসে। বলে, কী হল ? এত বেগে মঞ্চে প্রবেশ ?

আবার অন্ধকার। শ্যামলী দরজাটা ঠেলে বন্ধ করে দিয়েছে। প্রণব তার প্রশ্নের জবাব পায় না। তার বদলে পায় একটা উষ্ণ আলিঙ্গন। শোনে, তুমি নাকি আমাকে ছেড়ে জার্মানি চলে যাচ্ছ ?

—এই কথা ? কিন্তু 'সাহেব' যে সেই রকমই আদেশ করেছেন !

—সাহেব ! আর তুমি কি গোলাম ? কেন ? তুমি পার না তোমার বন্ধু মণি বোসের সঙ্গে প্র্যাকটিস শুরু করতে ?

প্রণব উঠে বসে। বলে, তুমি কি তাই চাও ?

—হ্যাঁ চাই ! এ পাষাণপুরী থেকে আমাকে উদ্ধার কর। আমি সব পারব ! রান্না করা থেকে বাসন মাজা—সব, সব !

boiRboi.net

প্রণব ওকে নিবিড় করে জড়িয়ে ধরে। বলে, এ যে আমার স্বপ্নেরও অগোচর শ্যামু! তুমি রাজী? পারবে? সব কষ্ট সইতে পারবে?

—পারব। তুমি পাশে থাকলে।

প্রণব চুমোয় চুমোয় ওর মুখখানা ভরিয়ে দেয়।

নিশ্বাস ফেলবার প্রথম সুযোগ পেতেই শ্যামলী বললে, এই?

—উঁ?

—আর একটা কথা—

—কী?

—এবার থেকে আর···শ্যামলী থেমে পড়ে।

—এবার থেকে আর···?

—আঃ! বোঝ না কেন? এতদিন বিয়ে হয়েছে।—এবার সবাই আমাকে আঁটকুড়ে বলবে না?

প্রণব এবার লাফিয়ে ওঠে। আলিঙ্গনপাশ মুক্ত করে ওর দুই বাহুমূল চেপে ধরে বলে, সত্যি?

প্রণবের বুকে মুখ লুকিয়ে শ্যামলী শুধু বললে, হুঁ!

যোগাযোগটা ভালই হচ্ছে শীলার মতে। ভগবান তার সহায়। যে সব প্রতিবন্ধকতা দেখা দেবে ভাবছিল আপনা থেকেই তার জট ছাড়িয়ে যাচ্ছে। সব চেয়ে বড় সমস্যা ছিল মুন্নাকে নিয়ে। কেঁদেকেটে ছেলেটা একশা করত। বাড়িতে দ্বিতীয় স্ত্রীলোক নেই। শীলা রাতারাতি নিরুদ্দেশ হলে ছেলেটাকে কে দেখে? ভগবান মুখ তুলে চাইলেন। হঠাৎ সদলবলে এসে উপস্থিত হল সরযূবা। যশোবন্ত কাপুরের বোন। অ্যাম্বাসাডার গাড়ি নিয়ে। বোন, ভগ্নীপতি, তার বোন এবং স্বামী, আরও দুটি ছেলেমেয়ে। ওরা বড়দিনের ছুটিতে 'বাই-রোড' বেড়াতে বেরিয়েছে।

লালগড় হয়ে যাবে সাইথন, শান্তিনিকেতন, দেওঘর। যশোবন্তকে নিয়ে ঝোলাঝুলি শুরু করল। সে আর একখানা গাড়ি নিয়ে যোগ দিক ওদের সঙ্গে। গাড়ির অভাব কী? কোম্পানির গাড়ি না পাওয়া গেলে ট্যাক্সি পাওয়া যাবে। কিন্তু যশোবন্ত রাজী হতে পারল না। সরকারিভাবে অফিস ছুটি থাকলেও তার নাকি ছুটি নেই। কাজ আছে। কী বুঝি গণ্ডগোল দেখা দিয়েছে মেশিনে। তা সত্য কথা। যশোবন্ত এখন দিবারাত্র কারখানায় পড়ে থাকে। 'ফল্ট' দেখা দিয়েছে কী বুঝি। স্পেয়ার পার্টস্ কিনতে লোক পাঠিয়েছে। তারা ফিরে না-আসা পর্যন্ত যম ডাকলেও যশোবন্ত সাড়া দেবে না। যশোবন্ত না গেলে শীলা কেমন করে যায়? আহা, ছুটির মধ্যে যে-মানুষটা দিন নেই রাত নেই খাটা-খাটুনি করছে তাকে দেখ্-ভাল করে কে? অগত্যা সরযূরা মুন্নাকে নিয়ে গেছে। দিন-পাঁচেকের তো ব্যাপার। ফেরার পথে নামিয়ে দিয়ে যাবে। মুন্নাদের স্কুল খুলছে দোশরা জানুয়ারি। ও বছরে।

মুন্নাই কি ছাই যেতে চায়? এমন হৈ-হৈ বেড়ানোর প্রোগ্রাম—তবু ছেলে বেঁকে বসল। কেন যাবে না, তাও বলে না। শেষ পর্যন্ত স্বীকার করল কারণটা। ওর নাকি একটা জরুরী অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে একজনের সঙ্গে। কে সেই ভাগ্যবান পুরুষ। বিশ্বাস করবে তোমরা? তিনি সান্টাক্লস! হেসে বাঁচেনা সবাই। শেষ পর্যন্ত মুন্নার মা কথা দেয়, সান্টাক্লস এলে তাঁকে যথোচিত আপ্যায়ন করা হবে। তিনি যদি প্রতিশ্রুত উপহারটা দিয়ে যান—সেই লাল রবার জড়ানো ক্রিকেট ব্যাটটা, তাহলে সেটা যত্ন করে রাখা হবে। তবে ছেলে রাজী হল।

সুতরাং পথ পরিষ্কার। মুন্নার বাপ দিবারাত্র কারখানায়। মুন্না গেছে বেড়াতে। এখন মুন্নার মা শিকল কেটে মুক্ত নীলাকাশে উড়তে পারে বটে। মুন্নারা ফিরে আসার আগেই ব্যাপারটা জানাজানি হয়ে যাবে। সরযূ এসে যা হয় ব্যবস্থা করবে। মুন্নাকে হয়তো নিজের কাছে নিয়ে গিয়ে রাখবে, নয় তো হস্টেলে! নিজের কাছেই রাখবে নিশ্চয়। সেখান থেকে শীলা একদিন এসে ফিরিয়ে নিয়ে যাবে ছেলেকে। বোম্বাই। সিনেমা-স্টারই হ'ক আর যাই হোক, মুন্নাকে ছেড়ে সে থাকতে পারবে না।

ঠিক কোন্ তারিখে গৃহত্যাগ করবে সেটা ঠিক করা বাকি ছিল। সেটা অনেকটা নির্ভর করছিল দস্তরের উপর। দস্তর মোটামুটি প্রস্তুত। তার স্ক্রিপ্ট নাকি লেখা শেষ। দিন দুই-তিনের মধ্যেই 'আপ্যায়ন' ছেড়ে বোম্বাই যাবে। দস্তরের ইচ্ছে ট্রেনে ক'লকাতা এসে সোজা প্লেনে পাড়ি জমানো। সেটাই সময়ের দিক থেকে সংক্ষেপ। তা যার টাকা আছে সে তা খরচ করবে না কেন?

শীলাকে সে বুঝিয়েছে বুকিং-এর ব্যবস্থা করছে। টিকিট হলেই জানাবে। অথবা পণ্ড'র মধ্যে।

হাতে কাজ নেই। মুন্না নেই। যশোবন্ত সন্ধ্যাবেলাতেই অফিস থেকে ফোন করে জানিয়েছে বাড়ি ফিরতে তার রাত হবে। কত রাত? বারোটার আগে নয়—হয়তো সারা রাতই থেকে যেতে হবে কারখানায়। ওর স্পেয়ার-পার্টস্ নাকি এসে পৌঁচেছে। তাই লাগানো হবে সারা রাত ধরে। নির্বান্ধব পুরীতে শীলা আজ একা। অথচ আজ হচ্ছে ক্রিসমাস ঈভ। খ্রীস্টানদের উৎসব—কিন্তু সব ধর্মেরই উচ্চচিত্তের মানুষ এই সন্ধ্যাটাকে একটু বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে দেখে। শীলা ভাবল, একবার দস্তুরকে ফোন করে দেখবে নাকি? ঠিক তখনই বেজে উঠল টেলিফোনটা—

—হ্যালো?

—শীলা?

—হুঁ, ঠিক তোমার কথাই ভাবছিলাম!

—এই শোন শীলা, একটা ব্যাপার হয়েছে। আমাকে এখুনি একবার কলকাতা যেতে হচ্ছে। আমার প্রডিউসার ভদ্রলোক কলকাতায় আসছেন। আমি আজ রাত্রেই মেলেই যাচ্ছি।

—সেকি! এখানে আর ফিরবে না? আমি তাহলে—

—তাই তো বলছি। আমি দিন-তিনেক কলকাতায় থাকব। সেখান থেকে ট্রাঙ্ক কলে তোমাকে জানাব কবে বোম্বাই রওনা হব। তুমি তারপর—

বাধা দিয়ে শীলা বলে, না, তা হবে না। আমিও তাহলে আজ রাতের মেলেই তোমার সঙ্গে কলকাতা যাব। আজ আমার যে সুবিধা আছে, তিনদিন পর···

মোহনও ওকে শেষ করতে দেয়না। বলে, অবুঝ হচ্ছ কেন? শোন না! কলকাতায় আমি গিয়ে উঠব প্রডিউসার-ভদ্রলোকের গেস্ট হয়ে। সেখানে তোমাকে নিয়ে উঠব কোন পরিচয়ে? তাছাড়া আর একটা মিস্টিরিয়াস্ ব্যাপার হয়েছে। সেটার ফয়শালা আগে হওয়া দরকার। মুন্না কি ঘুমোচ্ছে?

—মুন্না? আমার ছেলে? কেন? সে এখানে নেই। দিন-পাঁচেকের জন্য বেড়াতে গেছে।

—আই সি।

—কী মিস্টিরিয়াস ব্যাপার হয়েছে বলছিলে?

—আমি একখানা চিঠি পেয়েছি—ডাকে নয়, হাতে করে কেউ রেখে গেছে এই হোটেলের রিসেপশান কাউন্টারে—চিঠিটা লিখেছে তোমার ছেলে, মুন্না!

boiRboi.net

—কী বকছ পাগলের মত? মুন্না কি তোমাকে চেনে, না সে হোটেল 'আপ্যায়ন' পর্যন্ত একা একা যেতে পারে?

—তাই তো বলছি। ব্যাপারটা ভীষণ মিস্টিরিয়াস্। রহস্যময়। এটার আগে ফয়শালা হওয়া দরকার—

—কী লেখা আছে কাগজটায়?

—'আই নো এভরিথিং! গো অ্যাওয়ে, অর এলস্ আ'য়ল টেল্ ড্যাড। মুন্না।'

শীলার চোয়ালের নিম্নাংশ ঝুলে পড়ে। সে নির্বাক। দম নিয়ে বলে, বাজে কথা বলছ! মিথ্যে ভয় দেখাচ্ছ আমাকে!

—আপন গড্! হাতের লেখা ছবহু বাচ্চা ছেলের মত।

—কাগজখানা আমাকে দেখাতে পার? আমি ওর হাতের লেখা চিনব।

—আমি যাব? লাইন ক্লিয়ার?

—এস। যশ্ আজ রাত্রে ফিরবে না। অন্তত বারোটার আগে নয়। ভাল কথা, তোমার ট্রেন কটায়?

—বারোটা দশ-এ। আমি এখনই আসছি। আধঘণ্টার মধ্যে। ফিরে এসে চেক-আউট করব।

লাইন কেটে দিল দস্তর।

তখনই মনস্থির করল শীলা। নাউ অর নেভার। হয় এখনই, নয় কোনদিনই নয়। এসব কাজ চট-জলদি করতে হয়। রক্ত গরম থাকতে থাকতে। মোহন দস্তরের উষ্ণ সান্নিধ্যটুকু না পেলে একা-একা তিনদিন পরে সে গৃহত্যাগ করতে পারবে না। তাই কখনও হয়? কেউ কখনও শুনেছে প্রেমিক-প্রেমিকা আলাদা আলাদা পালালো? ইচ্ছে করেই মোহনকে কিছু বলল না। ছেলেটা একগুঁয়ে। একবার যখন না বলেছে, তখন কিছুতেই রাজী হবে না। মোহন তার প্রডিউসারের বাড়ি গেস্ট হয়ে উঠতে চায় উঠুক। কলকাতায় কি হোটেলের অভাব? দিন-তিনেকের তো মামলা। শীলা হোটেলেই কাটিয়ে দেবে। নগদ টাকা তার কাছে বেশি নেই—না থাক, গহনা আছে। জড়োয়াগুলো নেবে না, বিক্রি করলে দাম পাওয়া যাবে না। সোনারগুলো নেবে। তা কোন না দশ-বারো হাজার হবে। ছোট একটা স্যুটকেসে মালপত্র সাজিয়ে তোলে। সব কিছুই পড়ে রইল। থাক; যশ্ যদি আবার বিয়ে করে—করবেই—তখন কাজে লাগবে। শীলা ঘড়ি দেখল। আধঘণ্টা অনেকক্ষণ পার হয়ে গেছে। মোহন আসছে না কেন? বোধহয় মত বদলেছে। মালপত্র নিয়ে চেক-আউট করেই আসছে। সেই ভাল। শীলা কোন কথা শুনবে না। স্যুটকেস হাতে চেপে বসবে গাড়িতে।

শীলা চিঠি লেখার প্যাডটা টেনে নেয়। একখানা চিঠি লিখে রেখে যাওয়া উচিত। সদর দরজার চাবিটা নিয়েই যাবে। ডুপ্লিকেট তো যশ-এর কাছে আছেই। কলম বার করে শীলা লিখল :

"যশ! আট বছর তোমার সঙ্গে ঘর করার পর তোমাকে এ চিঠি লিখতে হবে তা আমিও জানতাম না, কিন্তু অনেক ভেবে দেখলাম এ ছাড়া আমাদের মুক্তি নেই। না তোমার, না আমার। ভুল ভুলই—তা যত শীঘ্র স্বীকার করে নেওয়া যায় ততই ভাল। তোমার সঙ্গে আমার চরিত্রগত মিল ছিল না কিছুই। তোমার খেলার জগতে আমি অথবা আমার জগতে তুমি কোনদিন কেউ পদার্পণ করিনি। নির্লজ্জের মত শোনাবে, তবু সব কথা তোমাকে বলে যাব বলেই কলম নিয়ে বসেছি—হ্যাঁ, আমি একজনকে ভালবাসি। আমি যে জগতের মানুষ, সেই জগতের বাসিন্দা। তার সঙ্গেই ঘর ছাড়ছি তুমি ঠিকই আন্দাজ করেছ—আমি ফিল্মে নামতে চাই; সে সুযোগ পেয়েছি তুমি মুক্তি দিলে নূতন করে ঘর বাঁধার স্বপ্নও দেখব। নতুন ডেরায় গিয়ে তোমাকে জানাব—নিজে যদি না যোগাযোগ করি, আমার সলিসিটার এসে তোমার সঙ্গে কথাবার্তা বলবেন। বিবাহ-বিচ্ছেদ না হলে তুমিও বিয়ে করতে পারবে না। বিশ্বাস কর যশ, তোমাকে আঘাত দিতে আমি চাই না; তবু যা করলাম তা না করেও থামতে পারছি না। মুন্নাকে তার পিসির কাছেই রেখ। পরে আমি এসে তাকে আমার কাছে নিয়ে যাব। টাকা-পয়সা কিছু নিলাম না—বাপের বাড়ি থেকে পাওয়া গহনা কিছু নিয়ে গেলাম—দুঃসময়ের কথা ভেবে। জয়েন্ট অ্যাকাউন্টের চেক বইটা আলমারিতে রইল। আশা করি আমাকে ক্ষমা করতে পারলে। তোমাকে শুধু একটি অনুরোধ করে যাব—আমার উপর রাগ করে মুন্নার সঙ্গে দুর্ব্যবহার ক'র না যেন। তুমি সুখী হও। ইতি শীলা।"

চিঠিটা আবার পড়ে মনে হল—না, কাজের কথা কিছু বাদ যায়নি।

ঠিক সেই সময়েই কলিং বেলটা বেজে উঠল। শীলা গিয়ে দরজা খুলে দিতেই প্রবেশ করল দস্তুর। শীলা প্রথমেই তার রঙের টেক্কা পেড়ে লীড দিল—শোন, আমিও তোমার সঙ্গে যাচ্ছি। না না, কলকাতায় আমি হোটেলে উঠব।

দস্তুর বললে, সেসব কথা পরে, আগে দেখ তো এই কাগজখানা?

শীলা ওর হাত থেকে কাগজখানা নিয়ে দেখল। অবাক কাণ্ড! এতো মুন্নার হাতের লেখা। মোহনের পীড়াপীড়িতে মুন্নার পড়ার ব্যাগটা বার করতে হল।

BanglaInternet

ক্রাইম-ছবির হবু-ডাইরেক্টর বহুক্ষণ ধরে ওর হাতের লেখা খুঁটিয়ে দেখল। তারপর শীলার দিকে তাকিয়ে বললে, আমি নিঃসন্দেহ এ লেখা মুন্নার।

—কিন্তু সে কেন লিখবে? আর লিখবেই যদি তবে এই সাদা খামটা সে পাবে কোথায়? আর কেমন করে সেই মাইলখানেক দূরে আপ্যায়নের হোটেলে তোমার পিজিয়ন-হোলে সেটা রেখে আসবে?

দস্তর বললে, আমার মনে হচ্ছে এটা তোমার স্বামীর কীর্তি। কোন সূত্রে সে টের পেয়েছে। মুন্নাকে দিয়ে লিখিয়ে—

শীলা বললে, তুমি যশকে চেন না। সে ও-রকম মানুষই নয়। সে টের পেলে তার ক্রিকেট ব্যাট দিয়ে আগে তোমাকে 'হুক' করত, তারপর আমাকে 'পুল' করত।

—'হুক' আর 'পুল'! তার মানে?

—ঐ হচ্ছে ওদের বাপ-বেটার বাঁধা লবজ! এসব চিঠি লিখে তোমাকে ভয় দেখাবার পাত্রই সে নয়।

দস্তর ভুরু কুঁচকে অনেকক্ষণ বসে রইল চুপ করে। শেষে বললে, অত্যন্ত রহস্যজনক! কোন কিছু আন্দাজই করতে পারছি না।

শীলাও ভাবছিল একমনে। হঠাৎ বলে ওঠে, আমার মাথায় একটা আইডিয়া এসেছে। বোধহয় বুঝতে পেরেছি, এটা কার কাজ!

দস্তর ঝুঁকে পড়ে সামনের দিকে: কে বলতো?

—সান্টাক্লস! আজ চব্বিশে ডিসেম্বর!

দস্তর উঠে দাঁড়ায়। বলে, এই কি তোমার রসিকতা করার সময়?

—রসিকতা নয়। সত্যি সত্যি বলছি। শোন বলি—

মুন্নার বায়নার কথা সব খুলে বলে। পার্কে তার সঙ্গে নাকি সান্টাক্লসের দেখা হয়েছিল। সে অনেক কথা জিজ্ঞাসা করেছে মুন্নাকে। কে সেই সান্টাক্লস?

দস্তর দস্তরমত ঘাবড়ে যায়। বলে, শীলা—সব দিক বিবেচনা করে একটি মাত্র সমাধানেই আসতে পারছি আমি। লোকটা একটা প্রাইভেট ডিটেক্‌টিভ। সে মুন্নার সঙ্গে ভাব জমাচ্ছে—আমাকে চিঠি লিখে ভয় দেখাচ্ছে। কে জানে, হয়তো এখন, এই মুহূর্তে তোমার বাড়ির ওপর নজর রাখছে।

—পয়সা খরচ করে প্রাইভেট গোয়েন্দা কে লাগাবে?

—তার একটি মাত্র সম্ভাব্য জবাব! স্বার্থটা কার হতে পারে? আমার স্ত্রী থাকলে, তার হতে পারত; কিন্তু আমি ব্যাচিলর। সুতরাং তোমার স্বামী।

boiRboi.net

তুমি মিস্টার কাপুরকে যতটা সিধেসাধা মানুষ ভাবছ আসলে সে তা নয়। নীরবে এভিডেন্স সংগ্রহ করে চলেছে।

শীলা চিন্তা করে বলল, এখনও সেই সান্টাক্লস আমাদের নজরে নজরে রেখেছে ?

—কী আশ্চর্য ! রেখেছে কিনা তার আমি কী জানি। আমি বরং যাই এবার।

শীলা ওর হাতখানা চেপে ধরে বলে, অত ভয় পাচ্ছ কেন গো ? বাড়িটা তো আমার ! আমি তোমাকে ঢুকতে দিয়েছি বলেই না তুমি ঢুকেছ ! ভয় কী ?

—না, না ভয় পাব কেন ?

—খাবে কিছু ? খাবার, চা কিংবা কফি ? 'রাম' খাবে ? ও এনেছে—

—না শীলা—আজ কিছু খাব না। আমাকে ট্রেন ধরতে হবে। আমার একটু তাড়া আছে আজ।

—ট্রেন তো আমাকে ধরতে হবে। একই ট্রেনে তো যাচ্ছি আমরা—

মোহন দস্তুর জবাব দিতে গিয়েও চেপে গেল। সে বুঝতে পারে—সে যতই আপত্তি করবে, শীলার ততই জিদ বাড়বে। সে রীতিমত ঘাবড়ে গেছে। বেশ ফুর্তিফার্তা করছিল লালগড়ে এসে—একাধিক সুন্দরীকে নিয়ে পর্যায়ক্রম রাসলীলা। সকলকেই সে লোভ দেখিয়েছে—সিনেমা-স্টার বানিয়ে দেবে। মেয়েগুলো খায়-দায় ভাল—শাড়ি-গহনা-স্বামী-পুত্র নিয়ে কোথায় সুখে থাকবি, তা নয় ভূতের কিল খাবার জন্য পিঠ শুড়শুড় করে। কী—না সিনেমা-স্টার হব ! মর হারামজাদীরা ! কিন্তু ব্যাপার ক্রমশ গুরুতর হয়ে উঠছে। রমলা বলছে আত্মহত্যা করবে, সরমা নাকি দস্তুরকে দস্তুরমত খুন করতে চায়, কেটি তো ব্যাগ নিয়ে গৃহত্যাগ করেই বসেছিল প্রায়। আর এই শীলা কাপুর। যশকামিনী ! দুই অর্থেই ! একে কায়দা করে পাশ কাটাতে হবে। স্থির করল ওকে বলবে প্রস্তুত থাকতে—ট্রেন ছাড়ার আধঘণ্টা আগে ওকে পিক্‌আপ করবে। তারপর শীলা বসেই থাকবে—'সেজে-গুজে রইল বসে, নিয়ে গেল না চোপার দোষে !'

শীলা বলে, শোন, আমি তৈরীই। এখনই তোমার সঙ্গে যাব। মায় যশ্‌কে শেষ প্রেমপত্রখানা পর্যন্ত লিখে রেখেছি।

দস্তুর বলে, ভেরি গুড ! শোন। সেটা সম্ভব নয়।···না, না, আমাকে সবটা বলতে দাও। আমি তোমার এখানে এসেছি হোটেলের গাড়িতে। ঘণ্টা হিসাবে ভাড়া করা। এখান থেকে আমি হোটেলে ফিরব। টাকা-পয়সা মিটিয়ে ঠিক এগারোটায় চেক-আউট করব। তারপর ট্যাক্সি নিয়ে আসব তোমাকে

boiRboi.net

তুলে নিতে। বুঝছ না—খামকা এভিডেন্স পিছনে রেখে গিয়ে কী লাভ? হোটেলের গাড়িটা তোমার বাড়ি পর্যন্ত আনিনি, বুঝলে? রাস্তার মোড়ে সেটা পার্ক করে হেঁটে এসেছি। যাতে ড্রাইভার-বেটা না জানতে পারে আমি কোথায় এসেছি।

শীলা বললে, ঠিক আছে। এগারটার সময়···

—এগারোটা নয়—সাড়ে এগারোটা। আমাদের ট্রেন বারোটা দশে।

শীলা ঘাড় নেড়ে সায় দেয়। দস্তর বলে, এবার তাহলে চলি?

শীলা ওর হাতখানা চেপে ধরে বলে, একেবারে বাসি মুখে?

—বললাম না—আমার খিদে নেই?

—কিন্তু আমার যে আছে!

—ও! য়ু মীন···

শীলা ওর হাতখানা ধরে টানে। ওরা ড্রইংরুম থেকে বেড-রুমে চলে আসে। ড্রইংরুমের আলোটা নিভে যায়, শয়নকক্ষের নীল আলোটা জ্বলে ওঠে। ওরা জানতেও পারেনি··· এই বাতি জ্বলা-নেভাটা পর্যন্ত লক্ষ্য করছে একজোড়া নিষ্পলক চোখ। শয়নকক্ষের পুঞ্জীভূত অন্ধকার নীলাভ হয়ে ওঠার পর সেই চোখ জোড়ারও স্থান বদল হল। সন্তর্পণে বাড়ির সামনের দিক থেকে পাশের গলি দিয়ে, সেপ্‌টিক ট্যাঙ্কের উপর দিয়ে, স্যানিটারী পাইপে ঠোক্কর খেতে খেতে চোখজোড়া পৌঁছালো বাড়ির পিছন দিকে, দক্ষিণ দিকে। সন্তর্পণে সে উঁকি দিল জানালা দিয়ে।

আধঘণ্টা পরে মোহন বেরিয়ে এল ড্রইংরুমে। একাই। কোটটা মুখ গুঁজে পড়েছিল সোফার উপর। তুলে গায়ে দিল। মোজা-জুতো পড়েছিল ছড়িয়ে ছিটিয়ে। পায়ে দিল এবার। সামনে আয়নায় নজর হল চুলগুলো অবিন্যস্ত হয়ে গেছে। কোটের পকেট থেকে বার করল একটা ছোট চিরুনি। চুলগুলো শাসনে আনল। একটা সিগারেট বার করে ধরালো। দেখল সেটা প্যাকেটের শেষ সিগারেট। খালি প্যাকেটটা ফের পকেটেই রাখল। কী দরকার একটা এভিডেন্স রেখে যাবার? মনে পড়ল—ওর জীবনে শীলার লীলা এখানেই খতম! আর সম্ভবত কোনদিন দুজনের দেখা হবে না। মেয়েটার যৌবন আছে বটে। দস্তর আবার শয়নকক্ষের দরজার কাছে এগিয়ে এল। মুখ বার করে বললে, শীলা, এবার আমি যাচ্ছি। সদর দরজাটা বন্ধ করে দাও।

শীলা চিৎ হয়ে শুয়ে আছে। গায়ের উপর টেনে নিয়েছে ইটালিয়ান কম্বলটা। ওর শাড়ি ব্লাউজ কুকুর-কুণ্ডলী হয়ে মুখ গুঁজড়ে পড়ে আছে পাশের খাটে—যশোবন্তের খাটে। শীলার চোখ দুটি বোঁজা। বললে—উঁ?

murchol.net

—ঘুমিয়ে পড়লে নাকি ? ওঠ। দরজাটা বন্ধ করে দাও—

শীলা পাশবালিশটা আঁকড়ে ধরে পাশ ফেরে। বলে—ইয়েল-লক আছে সদর দরজায়। তুমি টেনে দিয়ে চলে যাও—

অগত্যা। ডন্-জুয়ানি ভঙ্গিতে মোহন দত্তর দূর থেকেই বিদায় সম্ভাষণভঙ্গি করে। বড় হল-কামরাটা পার হয়ে আসে বড় বড় পা ফেলে। আয়নার সামনে আর একবার দাঁড়ায়। টাইটা ঠিক করে নেয়। ঘড়িটা দেখে। রাত দশটা পাঁচ। তারপর এগিয়ে যায় সদর দরজার কাছে। দরজাটা খোলে একটানে। আর তৎক্ষণাৎ সে বজ্রাহতের মত দাঁড়িয়ে পড়ে!

বাইরেটা আলো-আঁধারি। ডিসেম্বরের শীতের হিমেল হাওয়া এসে ঝাপটা মারে মোহনের মুখে। কিন্তু ও কী! ও কে ?

মোহনের মনে হল খোলা দরজার ফ্রেমে আটকানো প্রকাণ্ড বড় একটা ব্যঙ্গচিত্র—ডব্লু. জি. গ্রেস-এর! বিশ্ব-ক্রিকেট ইতিহাসের সেই আদি পুরুষটির একটি ক্যারিকেচার! সেই আবক্ষ দাড়ি, সেই হাসি-হাসি মুখ, ব্যাটটা ওঁর দেহের অনুপাতে অত্যন্ত ছোট—কার্টুন-চিত্রে যেমন হয়। বোলারকে ফেস্ করবার সেই অপরূপ 'স্টান্স'—ভঙ্গি!

মোহনের কণ্ঠনালী থেকে যে স্বরটা বের হল তা স্বরভঙ্গ-রুগীর কে! কে তুমি ?

লোকটা শুধু বললে, হুক না পুল ? কোন্‌টা তোমার পছন্দ ?

মোহন সভয়ে এক পা পিছিয়ে এল—ফলে ব্যাটস্‌ম্যান ক্রিজ ছেড়ে এগিয়ে এল ফরোয়ার্ড ড্রাইভের ভঙ্গিতে। মোহন আর্তনাদ করতে গেল—কিন্তু তার স্বরভঙ্গ পৌঁচেছে চরম পর্যায়ে। দু-হাড়ে মাথা ঢেকে বসে পড়ে লোকটা। ডবলু. জি. গ্রেস নিশ্চয় নয়···কারণ পাঁচ সাত দশ বাড়ি যা পড়ল তা সবই ক্রস-ব্যাটে!

মোহন খোঁড়াতে খোঁড়াতে এবং কিছুটা হামাগুড়ি দিয়ে পাঁছালো দরজা পর্যন্ত। সেখানে পৌঁছেই সে উঠে দাঁড়ালো। তারপর ডীপ-থার্ড-ম্যান যে ভঙ্গিতে বাউণ্ডারী বাঁচাবার চেষ্টা করে সেই ভঙ্গিতে দৌড়ালো গেটের দিকে।

লোকটা ঘুরে দাঁড়ায়। দেখতে পায় শীলাকে। ভয়ে সে নীল হয়ে গেছে না ঘরের নীল আলোয় ওকে অমন দেখাচ্ছে ? উঠে দাঁড়িয়েছে সে। নিম্নাঙ্গে শায়া, ঊর্ধ্বাঙ্গে কিছু নেই···রিফ্লেক্স অ্যাকশান হিসাবে—না ভেবে-চিন্তেই তুলে নিয়েছে একটা বালিশ ঢাকা। দু-হাতে তাই চেপে ধরেছে বুকে। খোঁপা ভেঙে পড়েছে ঘাড়ের উপর, টিপটা গেছে ধেবড়ে আর ভাঙা-খোঁপার প্রান্তে কোনক্রমে ঝুলছে পতনোন্মুখ একটা নিষ্পেষিত চন্দ্রমল্লিকা।

boiRboi.net

লোকটা ড্রইংরুম থেকে এক-পা এগিয়ে এল বেডরুমের দিকে। শীলা আর্তনাদ করে উঠতে চাইল; কিন্তু তার কণ্ঠেও স্বর ফুটল না। একপা পিছিয়ে গেল সে ঘরের ভিতর। আত্মরক্ষার তাগিদে কাজ। দু-হাত বাড়িয়ে দরজাটা বন্ধ করতে গেল শীলা। খসে পড়ল বালিশ ঢাকাটা।

লোকটা এক ধাক্কায় জোর করে খুলে ফেলল দরজাটা।

পারল না। শীলা পারল না ওর সঙ্গে দৈহিক ক্ষমতায়। এতক্ষণে ককিয়ে উঠল সে। বসে পড়ল যশোবন্তের খাটে। জড়ো হয়ে থাকা শাড়িটা বুকের উপর জড়ো করে বললে—কে তুমি? কী চাও? জোর করে এ ঘরে ঢুকেছ কেন?

লোকটা দাঁতে দাঁত চেপে বললে, তোমার সব কথা আমি জানি! সব কথা তুমি স্বীকার করেছ আমার কাছে—স্বামীকে লুকিয়ে তুমি সাত বছর পিল খেয়ে যাচ্ছ; তোমার সব চাহিদা মিটিয়ে দিচ্ছে তোমার স্বামী. ঘরে তোমার সাত বছরের মুন্না তবু তুমি ব্যভিচারিণী—

শীলা আমতা আমতা করে বললে, আপনি···আপনিই আমার ইন্টারভিয়ু নিয়েছিলেন—

—ঠিক ধরেছ তুমি! তাই তোমার সব কথা জেনে ফেলেছি আমি—

শীলা বলতে গেল—এমন তো কথা ছিল না! বৈজ্ঞানিক সমীক্ষার খবর সংগ্রহ করার পর এভাবে বাড়ি চড়াও হয়ে কৈফিয়ৎ তলব করার কোন কথা তো ছিল না! সে কথা কিন্তু বলল না শীলা. কারণ উৎকট মদের গন্ধে সে বুঝে নিয়েছে আগন্তুক মদে চুর হয়ে আছে! যুক্তিতর্কের বাইরে সে এখন। তাই বললে, সবই যখন জানেন তখন—

—না, সবটা জানি না। সব কথা স্বীকার করনি তুমি। এবার আমাকে বোঝাও—কেন? কেন?

—কী কেন?

—কেন তোমার এ বেশ্যাবৃত্তি? কেন মুন্নার মা আর পাঁচটা মেয়ের মত 'মা' হয়েই থাকল না?

লোকটাকে শান্ত করতে হবে। কথায় ভুলিয়ে। চিৎকার করলে, প্রতিবাদ করলে সে ঐ ব্যাট দিয়ে এলোপাতাড়ি ঠেঙাতে শুরু করবে—মিনিট তিনেক আগে যেভাবে সে দস্তরকে তুলোধোনা ধুনেছিল। তাই নিজের বাড়িতে ঐ অচেনা লোকটার চরমতম গালাগাল শুনেও শীলা আত্মসম্বরণ করল। বললে, সেটা এক কথায় বোঝানো যায় না।

boiRboi.net

—মানলাম। আমার অসীম ধৈর্য। বুঝিয়ে বল আমায়। সারা জীবন অপেক্ষা করেছি, দরকার হলে সারারাত ধরে শুনব। আমার বুঝে নেওয়া একান্ত দরকার—কিন্তু···কিন্তু, তার আগে তুমি জামাটা গায়ে দাও। তোমার দিকে চোখ তুলে চাইতে পারছি না আমি—

শীলা বসেছিল যশোবন্তের খাটের উপর। পরনে তার শুধু একটা শায়া। ঊর্ধ্বাঙ্গ অনাবৃত। শাড়ি-ব্লাউস-ব্রার পিণ্ডটাকেই বাঁ-হাত দিয়ে বুকে চেপে ধরে বসে আছে। এতক্ষণে একটু একটু করে সাহস ফিরে আসছে তার। লোকটা তাহলে অমানুষ নয়—মদ্যপ হতে পারে, কিন্তু ব্যভিচারী নয়···নাহলে এমন বিবস্ত্রা নারীমূর্তির সামনে সে অমন সঙ্কুচিত হয়ে পড়বে কেন? মাতাল বদমায়েশ হলে এ নির্জন ঘরে এমন অসহায়া একটি বিবস্ত্রা রমণীকে সে ছেড়ে দিত না। তাই শীলা সাহস করে বললে, আপনি ও-ঘরে যান, আমি কাপড়টা পরি।

না! আমি ও-ঘরে গেলে তুমি দরজা বন্ধ করে দেবে!

শেয়ানা পাগল! লোকটা হাতের ব্যাটটা ফেলে দিল খাটের উপর। পিছন ফিরে দাঁড়ালো। বললে, জামা-কাপড় পরে নাও!

পকেট হাৎড়ে সিগারেট দেশলাই বার করল সে। ওর হাতটা কাঁপছে। উত্তেজনায় না মদের প্রভাব? দেশলাই কাঠিটা বারে বারে নিভে যাচ্ছে। লোকটা অন্যমনস্ক হয়েছে। এই সুযোগ! এমন সুযোগ শীলা দ্বিতীয়বার পাবে না। দুর্জয় সাহসে বুক বেঁধে সে তুলে নেয় খাটের উপরে পড়ে থাকা ঐ ক্রিকেট ব্যাটটা। বুকের উপর থেকে কাপড়ের পুঁটলিটা খসে পড়ল। ভ্রূক্ষেপ নেই শীলার। বিবসনা কালীর মতই ব্যাটটা সে তুলল মাথার উপর! সজোরে খাঁড়াটা নেমে এল শর্মার মাথা লক্ষ্য করে।

সামনে আয়নার মধ্যে নজর পড়েছিল শর্মার। মুহূর্তে পিছন ফিরল সে। খাঁড়ার আঘাতটা ঠেকাতে চাইল হাত তুলে। সঙ্গে সঙ্গে সরে গেল এক পাশে। অপ্রতিরোধ্য আঘাতটা নেমে এল ঠিকই, তবে লক্ষ্যভ্রষ্ট হল। সজোরে আঘাত করল ওর কাঁধে। যন্ত্রণায় আর্তনাদ করে উঠল শর্মা। মুহূর্তে ক্ষেপে গেল যেন। লাফ দিয়ে পড়ল শীলার উপর। বজ্রমুষ্টিতে চেপে ধরল ওর কণ্ঠনালী!

—বেশ্যা মাগী! তোর লজ্জা নেই? সরম নেই! কুত্তি! কুত্তি কাঁহাকা!

সময়ের কোন মাপ নেই! অসীম যন্ত্রণায় সমস্ত রক্ত উঠে এসেছিল ওর মাথায়। স্থান-কাল-পাত্র সব হারিয়ে গিয়েছিল। পরিপূর্ণ অন্ধকার। ধীরে ধীরে সম্বিত ফিরে পেল। চোখের সামনে আবার ফুটে উঠল ঘরের দৃশ্যটা। কে একটা অচেনা

boiRboi.net

মেয়ে পড়ে আছে তার সামনে। চোখ দুটো তার ঠিকরে বের হয়ে এসেছে। খাটের উপর চিৎ হয়ে আছে। কে ও? শর্মা কেন তার বুকের উপর এভাবে চেপে বসেছে? হঠাৎ চিনতে পারল মাতালটা···ওর মা! মায়ের মৃত্যু সংবাদের টেলিগ্রাম পেয়ে সে ছুটে এসেছে। ওর মা মরে গেছে। ঐ তো মায়ের দুটি স্তন! ঐ স্তন্যরসেই যে সে পুষ্ট!

লুটিয়ে পড়ল শর্মা মায়ের সেই নগ্ন বুকের উপর। ওর মরা বুকে মুখ ঘষতে ঘষতে বললে, মা, মাগো! এই তুই কী করলি মা! তুই নিজেও মরলি, আমাকেও মেরে গেলি!

তারপর হঠাৎ ওর মনে হল হলঘর-ভর্তি আত্মীয়স্বজন বুঝি ওর মায়ের মৃতদেহ ঘিরে দাঁড়িয়ে আছে। শর্মা সম্বিত ফিরে পায়। সাদা বিছানার চাদরখানা টেনে নির্জন ঘরে ঢেকে দেয় ওর হতভাগ্য নগ্নিকা জননীর মৃতদেহটা!

ক্রিসমাস-ঈভ। উৎসবসাজে সেজেছে চীনা-রেস্তোরাঁটা। বাইরে এক ঝাঁক টুনি-বাল্ব। একপাশে সান্টাক্লসের মূর্তি—পিসবোর্ডের। দাড়িতে তুলোর বোঝা। ভিতরটা শীতাতপনিয়ন্ত্রিত—অপেক্ষাকৃত গরম। গ্লাস-ডোর ঠেলে ভিতরে ঢুকে অলকের মনে হল ভিতরটা রীতিমত আলো-আঁধারি। এ-প্রান্তে ও-প্রান্তে চীনা-লণ্ঠন ঝুলছে। আটকানো আধুনিক চীনা-লণ্ঠন—বৈদ্যুতিক আলো। ধীরে ধীরে পাক খাচ্ছে। নানান ছবি ফুটে উঠছে আটটি কাচে। ঘরের ও-প্রান্তে সুঙ-যুগের বিখ্যাত চীনা চিত্রকর লি লুং সিয়েন-এর একটি ছবির অনুলিপি। একটা পাগলা ঘোড়া। কাঠ-কয়লার আঁচড়-টেনে আঁকা। ঘরের এখানে-ওখানে বসেছে কেউ-কেউ, অধিকাংশই জোড়ায়-জোড়ায়। একেবারে শেষপ্রান্তে, লক্ষ্য হল অলকের, চুপচাপ বসে আছে করবী। তার পরনে হালকা নীল রঙের একটা মুর্শিদাবাদী, গায়ে গরম কোট।

boiRboi.net

ওর কাছাকাছি এসে অলকের মনে হল আজ করবী কিন্তু প্রসাধন করেছে। সদ্যফোটা একগুচ্ছ রজনীগন্ধার মত একটা স্নিগ্ধ সৌরভ। অলক ঝুপ করে বসে পড়ে ওর সামনে। করবী ঘড়ি দেখে বললে, আপনি বারো মিনিট দেরী করেছেন।

অলক মাথাটা নিচু করে বললে, অপরাধ স্বীকার করছি। শাস্তি দিন।

—একটি মহিলাকে ডিনারে নিমন্ত্রণ করে নিজে দেরী করে আসা অমার্জনীয় অপরাধ। শাস্তি তো দেবই। আগে আপনার কৈফিয়ৎটা শুনি?

—কৈফিয়ৎ শুনলে কিন্তু আর শাস্তি দিতে মন সরবে না। আপনি বিশ্বাস করতে পারেন—আমার দেরি হবার কারণ আমি এতক্ষণ একটি অত্যন্ত পুণ্যকার্য করছিলাম!

—সেটা কী তাই আগে শুনি—

—একটি মেয়ে আর একটি ছেলে পরস্পরকে ভালবেসেছিল—প্রথম যৌবনে। তারপর দৈব-দুর্ঘটনায় তাদের ছাড়াছাড়ি হয়ে যায়। ষোলো বছর ধরে তারা একে অপরকে খুঁজছে—সন্ধান পায়নি। এই মাত্র তাদের খুঁজে বার করেছি! ছেলেটিকে মিনিট পনের আগে সন্ধান দিয়েছি সেই মেয়েটির। সন্ধান নয়, পরিচয়—

—আপনার সাত খুন মাপ। ছেলেটি বা মেয়েটি কি লালগড়ের?

—হ্যাঁ মেয়েটি। তাঁর ইন্টারভিয়ু আমিই নিয়েছিলাম। তা থেকে জানতে পারি তিনি সারাজীবন ধরে খুঁজে বেড়াচ্ছেন তাঁর প্রথম প্রেমকে—ঘটনাচক্রে আমি সেই ছেলেটিকে চিনি—

—কে বলুন তো? মহিলা-সমিতির যত মেয়ে ইন্টারভিয়ু দিয়েছে তাদের সকলকেই তো আমি চিনি।

—অলক হেসে বললে, সেটা কি উচিত হবে? ভদ্রমহিলার জীবনকথা গোপন রাখতে আমরা প্রতিশ্রুত।

—ও! আয়াম সরি!

একটু ভেবে নিয়ে অলক বললে, না। নামটা আপনাকে বলতে হবে। কারণ মেয়েটির নামটাই আমি সংগ্রহ করেছি। তাঁর ঠিকানাটা জানি না। একজনের সাহায্য আমাকে নিতেই হবে। আপনাকেই বলি—

অর্ডার-বই নিয়ে একটি ছোকরা এসে দাঁড়ায়। অলক বলে, আপনি অর্ডার দিন—

অর্ডার নিয়ে ছেলেটি চলে যেতে করবী বললে, অলকবাবু, আমার মেড-

boiRboi.net

সার্ভেন্টের সামনে আলোচনাটা করতে আপনি আপত্তি করেছিলেন—কিন্তু এ-ঘরে এখন যাঁরা খাচ্ছেন তাঁদের বারো-আনাই আমার পরিচিত।

অলক বললে, সরি। আমি অবশ্য একজনকেও চিনি না—কিন্তু বোধকরি এমন অনেকে আছেন যাঁদের গোপনতম প্রেমের কাহিনীও আমার জানা।

করবী বলে, ঘাড় ঘোরাবেন না। আগে শুনে নিন—আমার বাঁ-দিকে শেষ প্রান্তে সবুজ-রঙের ক্রেপ-সিল্ক পরে যে মেয়েটি খাচ্ছে তার স্বামীর সঙ্গে, সে হচ্ছে আমাদের জি এম. এর মেয়ে শ্যামলী চ্যাটার্জি। আপনার ঠিক পিছনে সপরিবারে বসেছেন মিস্টার গুরুবক্সানি, আর ঐ দূরে আমাদের ডানদিকের মেম-সাহেবটি হচ্ছেন হাসপাতালের চীফ মেট্রন মিসেস স্মিথ—

—নোয়ামি? করবীর নিষেধ সত্ত্বেও অলক ঘুরে বসল। বললে, ওঁর সঙ্গে কে?

—আপনি মিসেস স্মিথের নাম জানলেন কেমন করে?

—ঘটনাচক্রে। সঙ্গে ঐ ভদ্রলোকটি কে?

—ওঁর পাশের ফ্ল্যাটে থাকেন। মিস্টার রঙ্গচারী।

—বিবাহিত?

—কে? মিসেস স্মিথ? সে-তো নামেই পরিচয়—

—না না, মিস্টার রঙ্গচারী?

—বিপত্নীক।

অলক অন্যমনস্ক হয়ে যায়। তার হঠাৎ মনে হয়, তবে হয়তো ডক্টর আয়াঙ্গারের পথটা একেবারে কুসুমাকীর্ণ হবে না। কিন্তু সেদিন মিসেস স্মিথের জবানবন্দিতে রঙ্গচারীর তো কোন ভূমিকা ছিল না? তবে কি—

খাবার এসে যায়। করবী সার্ভ করতে শুরু করে।

এরপর কিছুটা নীরব ভোজন-পর্ব। করবী বার বার ওর দিকে চকিতে চোখ তুলে তাকাচ্ছে, এক নজর হল অলকের। সে যেন কী একটা কথা বলতে চায়, অথচ বলতে পারছে না। অলক অপেক্ষা করে। নির্বিকারভাবে চাওমিন্-এর প্লেটটা শেষ করতে থাকে। যা ভেবেছিল তাই হল—শেষমেশ করবী বলেই ফেলল, আপনাকে সেদিন যা বলেছিলাম তা সব মিথ্যা।

—সব নয়। কিছুটা মিথ্যার মিশাল যে আছে তাতো আমি জানিই—

—কোনটে সত্যি, কোনটা মিথ্যা বলুন তো?

—আপনার প্রাক্-বিবাহ জীবনের সমস্ত তথ্য আদ্যন্ত সত্য। বিবাহিত জীবনের মধ্যে কিছুটা মিথ্যার বেসাতি করেছেন—

boiRboi.net

—আর গত এক বছরের ঘটনায় ?

—সবই সত্য।

—না!

করবী এত জোরে প্রতিবাদটা করে উঠেছে অনেকেই এদিকে ফিরে তাকায়। অলক নিম্নকণ্ঠে বলে, এর চেয়ে আপনার মেড-সার্ভেন্টের সামনে আলোচনা হওয়াটাই বরং বাঞ্ছনীয় ছিল।

করবী অত্যন্ত সঙ্কুচিত হয়ে বলে, আ'য়াম সরি!

আবার দুজনে কিছুক্ষণ নীরবে আহার সারে। কিন্তু করবীকে যেন কিসে খোঁচাচ্ছে। আবার একই প্রসঙ্গের অবতারণা করে সে। বলে, আপনি কী আন্দাজ করেছেন বলুন তো?

অলক বলে, আন্তন্ত সত্যি কথাটা যেমন বলতে পারেন না আপনি, তেমনি আমি কী আন্দাজ করেছি তাও আমার পক্ষে বলাটা শোভন নয়। কী দরকার করবী দেবী; থাক না এ আলোচনা। আমার কৌতূহল চরিতার্থ করতেই হবে এমন কী কথা?

করবী তবু বলে, বেশ, চরিতার্থ নাই করি, কৌতূহলটা কী, তা জানতে কী দোষ?

—এক নম্বর আপনি ক্যাপ্টেন বসাককে কেন বিবাহ করলেন না, দু-নম্বর কেন এক ঝুড়ি মিথ্যে কথা বললেন—

—আমি আপনাকে বলেছিলাম, আমি কোনদিন কোনও কন্ট্রাসেপ্‌টিভ ব্যবহার করিনি—এটা সত্য বলেছি না মিথ্যা?

—কী জানি, ভেবে দেখিনি। সত্যও হতে পারে মিথ্যাও হতে পারে—

—সত্য হলে আমি···আমি এতদিনে মা হলাম না কেন?

—তার অনেক কারণ থাকতে পারে, শারীরিক ত্রুটি—আপনার অথবা জিতেন্দ্রনাথের! একটু ভেবে নিয়ে পুনরায় বলে, খুব সম্ভবত আপনারই, না হলে ক্যাপ্টেন বসাকের—

—স্টপ ইট! আপনি···আপনি ইতর!

এবার চাপা গলায় ধমকটা দিয়েছে। অলক তবু সতর্ক হয়। গম্ভীরভাবে বলে, করবী দেবী, আপনি চাইলেও আমি আর এ-প্রসঙ্গ নিয়ে কোন কথা বলব না।

করবী ছুরিটা নামিয়ে রেখে অলকের হাতটা চেপে ধরে। বলে, আমি··· আমি ক্ষমা চাইছি···

boiRboi.net

—ক্ষমা চাইবার কিছু নেই মিসেস বাসু। তবে বিষয়টা আপনার পক্ষে এতই সংবেদনশীল যে এভাবে বারে বারে আপনি সংযম হারাবেন। কী দরকার? এ পর্যন্ত পাঁচশ' মহিলার গোপন-কথা শুনেছি। অনেক কিছুই বুঝিনি। তাতে ক্ষতি তো কিছু হয়নি। আপনার কথাও সম্পূর্ণ না জানলে—

করবী রীতিমত অভিমানক্ষুব্ধকণ্ঠে বললে—তা ঠিক। যাঁহা পাঁচশ', তাঁহা পাঁচশ-এক!

অলক দৃঢ় প্রতিবাদ করে। বলে, না আপনি পাঁচশ-এক নন, আপনি বিশেষ! আর তার কারণ এ নয় যে, আপনি জিতেন্দ্রনাথের স্ত্রী। আপনি স্বমহিমাতেই বিশেষ—না হলে পাঁচশ মহিলার ক্ষেত্রে যা করেছি, আপনার বেলাতেও আমি তাই করতাম—এভাবে পরিচয় লুকিয়ে আপনার সঙ্গে দেখা করতাম না।

কম্‌প্লিমেন্টস্। উপভোগ করল করবী। সব মেয়েই করে। বললে, কিন্তু আপনি যেদিন পরিচয় লুকিয়ে আমার সঙ্গে দেখা করতে আসেন তার আগে তো আপনি আমাকে দেখেননি—

—আমি তো বলিনি করবী দেবী, আপনার রূপের জন্যই আপনি বিশেষ! আপনার কথায়-বার্তায়, কণ্ঠস্বরে, আপনার কাহিনীতে আমি আকৃষ্ট হয়েছিলাম—অস্বীকার করব না। আপনার সৌন্দর্যটা হচ্ছে আমার তরফে 'কনসিউমার্স সার্প্লাস' —আশাতিরিক্ত প্রাপ্তি!

ওদের আহারাদি শেষ হয়ে এল। রাত বেড়েছে। ঘর প্রায় ফাঁকা। শ্যামলীরা চলে গেছে, তার আগে উঠেছেন মিসেস্ স্মিথ আর রঙ্গচারী।

করবী জানতে চায়, আর কতদিন থাকবেন এখানে?

—দিন তিন-চার।

—কাজ কেমন হল?

—ডঃ ত্রিবেদীর মতে আশাতিরিক্ত।

—আর আপনার মতে?

একটু ভেবে নিল অলক। তারপর স্বীকার করল অকুণ্ঠভাবে—এ পরিকল্পনার উপর সে দিন-দিন আস্থা হারাচ্ছে। করবী জানতে চায় হেতুটা। অলক বুঝিয়ে বলতে থাকে—সেই যেসব কথা বলেছিলেন ডঃ অবনী মজুমদার। যেসব প্রশ্ন তার নিজের মনে জেগেছে। কথা বলতে বলতে দুজনেরই খেয়াল নেই যে, রাত গভীরতর হয়েছে। ভোজনালয়ে তারাই শুধু বসে আছে তখনও। খেয়াল হল যখন হোটেল ম্যানেজার এসে জানালো—এবার দোকান বন্ধ করবে।

দুজনে বেরিয়ে এল বাইরে। করবী বললে, এটা কিন্তু আপনার অন্যায় হল—

—কোনটা ?

—বিলটা মেটানো। খাওয়ানোর কথা ছিল আমার। কাল আপনি অভুক্ত ফিরে এসেছেন।

অলক হেসে বললে, গতকালের ত্রুটি আগামীকাল শোধরাতে পারেন। এখন আর আপনার মেড-সার্ভেন্টকে ভয় করি না আমি। আপনি কি হেঁটে ফিরবেন, না ট্যাক্সি ধরে দেব ?

করবী বললে, বিলাতী কায়দায় কিন্তু ডেটিং করলে নিয়ম হচ্ছে মহিলাটিকে বাড়ি পর্যন্ত পৌঁছে দেওয়া—

—দেব না বলেছি আমি ? প্রশ্ন করেছি হেঁটে যাবেন, না ট্যাক্সিতে ?

—এইটুকু তো দূরত্ব। শীতের রাত—চাঁদও আছে আকাশে। চলুন হেঁটেই পাড়ি দিই।

—চলুন।

পথ নির্জন। কিছু দূরে দূরে সারবন্দী এক-পায়ে খাড়া বিজলীবাতির ঘোলাটে চোখ। ওদের দুজনের ছায়া সামনের দিকে লুটিয়ে পড়ে, ঘন হয়ে আসে তারপর পিছিয়ে পড়ে। কথা বোধহয় ফুরিয়ে গেছে ওদের। কেউ কোন শব্দ করছে না। জ্যোৎস্নালোকিত রাজপথে শুধু একজোড়া জুতোর আওয়াজ। হাঁটতে ভালই লাগছে। ইংরাজি-সাহিত্যের ছাত্রটির মনে পড়ল—'লাস্ট রাইড টোগেদার'। প্রভেদ যথেষ্ট, সাদৃশ্যও আছে। কিছুই বলল না সে কিন্তু। বোধ করি নীরবেই ওরা উপভোগ করতে চায় এই নৈশবিহার।

অবশেষে শেষ হল পদযাত্রা। করবীর পাশের বাড়ির কুকুরটা ডেকে উঠল। চারদিক নিঝুম নিশুতি! ভ্যানিটি ব্যাগ খুলে চাবির গোছা বার করল করবী। সদর দরজার চাবি খুলল। খুলে গেল দরজা। আলোর সুইচে হাত দিল না কিন্তু। ঘুরে দাঁড়িয়ে বললে, এবার তাহলে আসুন। শুভরাত্রি!

একটু নীরবতা। শেষে মরিয়া হয়ে অলক বলে বসে, করবী! একটু আগে তুমি বলেছিলে বিলাতী কায়দায় ডেটিং করলে ছেলেটির কী শেষ কর্তব্য! কিন্তু মেয়েটির ? দরজা পর্যন্ত পৌঁছে দেওয়ার মুহূর্তে ?

একটি হাত ডোর-নবে। করবী ঘুরে দাঁড়াল। হাসল। বললে, তোমারই জিত হল! নাও! পাওনা আদায় করে নাও। কড়ায়-গণ্ডায়!

অলক ওকে টেনে নিল বুকে। নত হয়ে এল ওর মুখ। করবীর হাতটা সরে এল দরজার হাতল থেকে। আলতো করে পড়ল অলকের পিঠে। তারপর সে

boiRboi.net

হাত শক্ত হল—নিবিড় হল আলিঙ্গনপাশ। যে কথা মুখ ফুটে ওরা বলেনি তাই বলল ওদের অধরোষ্ঠ—বাণীহীন ভাষায়!

যুগ-যুগান্তর সত্যই পার হয়ে যায়নি—যদিও তাই মনে হচ্ছিল করবীর। সম্বিত ফিরে এল ঘরের ভিতর টেলিফোনটা বেজে ওঠায়। আলিঙ্গনপাশ শিথিল হল। করবী লুটিয়ে-পড়া আঁচলটা টেনে নেয়। আলোটা জ্বালে। এগিয়ে যায় টেবিলটার কাছে। অলক তখনও খোলা দরজায় দাঁড়িয়ে।

—হ্যালো!···কে? ও কেটি!···বল! কী! কী হয়েছে? সে কী! কতক্ষণ? কোন্ ডাক্তার ডেকেছ?···ও আচ্ছা! নিশ্চয়! আমি এক্ষুনি যাচ্ছি!

টেলিফোনটা নামিয়ে রেখে করবী ঘুরে দাঁড়ায়।

অলক প্রশ্ন করে, কোন দুর্ঘটনা?

—হ্যাঁ! আমার একজন প্রতিবেশিনীর। কেটির মা—ও, তুমি তো তাকে চেনই! মিসেস নোয়ামি স্মিথ।

—কী হয়েছে তাঁর?

—সুইসাইড করেছেন!

—নোয়ামি?

—তুমি যাবে আমার সঙ্গে? এতরাত্রে একা একা—

—অফ কোর্স! কিন্তু তার আগে একটা কাজ আছে। একটা টেলিফোন করতে হবে একজনকে—

—কাকে?

—আমার এক ডাক্তার বন্ধুকে—

অলক টেলিফোনটা তুলে নিয়ে ডায়াল করল। আপ্যায়ন। আয়াঙ্গারের ঘর। নো রিপ্লাই। কী আশ্চর্য! এত রাত্রি পর্যন্ত আয়াঙ্গার হতভাগা কোথায় আছে? টেলিফোনটার কথা-মুখে হাত চাপা দিয়ে করবীকে প্রশ্ন করে নোয়ামির নম্বরটা কত। শুনে নিয়ে হোটেল আপ্যায়ন-এর রিসেপশনকে বলে আয়াঙ্গার ফিরেই যেন ঐ নম্বরে ফোন করে এবং তাকে খোঁজ করে।

ঘরে তালা দিয়ে ওরা দুজন আবার পথে নামে।

boiRboi.net

মোহন দস্তুরের কাছে কশাহত হয়ে কেটি কোনক্রমে সিঁড়ি দিয়ে নেমে এসেছিল আপ্যায়ন হোটেল থেকে। উদ্‌গত অশ্রু গোপন করে, দাঁতে দাঁত চেপে। আলোকোজ্জ্বল গেটটা পার হয়ে জনবিরল পীচমোড়া রাজপথে পৌঁছে আর সে নিজেকে শান্ত রাখতে পারল না। বসে পড়ল পথের ধারে একটা কালভার্টের প্যারাপেটে। ঝরঝরিয়ে কেঁদে ফেলল বেচারি। এখন সে কী করবে? সুবুদ্ধি বলছে—দস্তুরের পরামর্শ টাই ঠিক। দ্রুতগতিতে বাড়ি ফিরে যেতে হবে, মা ফিরে আসার আগে। তা না হয় ফিরল। তারপর? তারপর তার সামনে দুটি পথ খোলা। এক নম্বর—ঐ বাস্টার্ড পরিচয় বহন করে সারাটা জীবন কাটিয়ে দেওয়া; রঙ্গচারী আর তার মায়ের মাঝখানে কাঁটা হয়ে বেঁচে থাকা। আর দ্বিতীয় পথটা হচ্ছে—মায়ের কাবার্ড থেকে একমুঠো ঘুমের বড়ি খেয়ে শুয়ে পড়া!

কিন্তু মরতে যে চায় না কেটি! মরবার সঙ্কল্প তো সে করেনি কোনদিন। মাত্র ষোলোটি বছর কেটেছে তার জীবনে—কৈশোরকে বিদায় দিয়েছে, যৌবনকে পুরোপুরি পায়নি। এই দুনিয়ার রূপ-রস-শব্দ-গন্ধ-স্পর্শ যে নিরন্তর তাকে হাতছানি দেয়। রহস্যময় একটা জগতের সিংহদ্বার যে সবে খুলতে শুরু করেছে তার সামনে। কানীন-কন্যা তো কতই আছেন দুনিয়ায়—ফ্লোরেন্স নাইটেঙ্গল, জোন-অফ-আর্ক। না না, সব ভুল হয়ে যাচ্ছে কেটির! ওঁরা নয়, আর যেন কারা আছেন যাঁদের জন্মপত্রিকা ছিল না! নামগুলো মনে আসছে না। না আসুক, তাঁরা সার্থক জীবন যাপন করে গেছেন। বিবাহ কী? একটা সামাজিক স্বীকৃতি। কী দরকার তার পরিচয়ে? এ পৃথিবী ঊনবিংশ শতাব্দীতে আটকে থাকেনি। ওর পরিচয় জেনেও হয়তো কোন অচিনপুরীর রাজপুত্র ওকে তুলে নেবে তার ঘোড়ার পিঠে। কেন নেবে না? কী ওর অভাব? ও কি বোঝেনি ওর নিজের মূল্য—মুগ্ধ বয়ফ্রেণ্ডদের আবিল দৃষ্টিতে। এক মুহূর্তে সেসব বাতিল হয়ে যাবে—এজন্য যে, তার মা আর সেই ডাক্তার ভদ্রলোক—না, ডক্টর স্মিথ নন, তিনি অলীক—কী যেন নাম ওর বাবার? ভুলে গেছে। বাপের নামটাই ভুলে গেছে। বাঃ!

একটা ট্যাক্সি চলে গেল। না খালি নয়। যাত্রী আছে।

কেটি উঠে দাঁড়ায়। বাস স্ট্যাণ্ডে গিয়ে দাঁড়ায়। হাতঘড়িটা দেখে। নাঃ! রাত সাড়ে দশটা বেজে গেছে। বাস বন্ধ হয়ে গেছে। এখন ট্যাক্সি ছাড়া উপায় নেই। কিন্তু এতরাত্রে একা ট্যাক্সিতে! তাতেই বা কী? বাড়ি গিয়ে কেটি তো একমুঠো ঘুমের ট্যাবলেট খাবে। তার আগে যদি ট্যাক্সি ড্রাইভার ওকে

boiRboi.net

নিয়ে···কী ক্ষতি বৃদ্ধি হবে তাতে? কিন্তু না! ও যে ঘুমের ট্যাবলেট খাবেই এমন কোন সিদ্ধান্ত এখনও তো সে নেয়নি?

লক্ষ্য হল রাস্তার ওধারে আরও একজন বৃদ্ধ ভদ্রলোক দাঁড়িয়ে আছেন। একা। স্যুট পরা মানুষটিকে বেশ অন্যমনস্ক মনে হল। ওর দিকে চোখ তুলে দেখছেনও না। উনি ওখানে ওভাবে দাঁড়িয়ে আছেন কেন?

চিন্তা করতে করতেই একটা ট্যাক্সি এগিয়ে গেল। ঐ ভদ্রলোকের ইঙ্গিতে থেমে পড়ল ওঁর সামনে। কেটি ছুটে আসছিল, তার আগেই ভদ্রলোক দরজাটা খুলে ফেললেন। দাঁড়িয়ে পড়ল কেটি। ভদ্রলোক ট্যাক্সিতে উঠলেন না কিন্তু। ওকে ইংরাজিতে প্রশ্ন করলেন, ইয়াং লেডি, তুমি কোনদিকে যেতে চাও বলতো?

—থার্ড অ্যাভিন্যু!

—দ্যাটস্ ও. কে.। উঠে এস। আমিও ঐ দিকেই যাব। এতরাত্রে ট্যাক্সি বেশি আসবে না।

—থ্যাঙ্কু সো মাচ্।—কেটি উঠে বসল ওঁর পাশে। ট্যাক্সি ছাড়ল।

ভদ্রলোক অযাচিতভাবে বললেন, এতরাত্রে একা-একা এরকম বেরিও না।

কেটি ওঁর মাতব্বরিতে কোনও আপত্তি করল না। এতরাত্রে সত্যই সে একা-একা ট্যাক্সি করে ঘোরে না। আরও কিছুক্ষণ পর ট্যাক্সিচালক বললে—ইয়ে হ্যায় থার্ড অ্যাভিন্যু। সিধা যাঁউ?

কেটি বললে, আপনি কতদূর যাবেন?

উনি বললেন, ঠিক জানি না। আমি একটা ঠিকানা খুঁজছি।

—থার্ড অ্যাভিন্যুতে? কত নম্বর?

—সাতচল্লিশ নম্বর।

—মিস্টার রঙ্গচারীকে খুঁজছেন?

—না। মিসেস স্মিথ।

সাতচল্লিশ নম্বর শুনে কেটি বুঝেছিল—সম্ভাবনা দুটি। যেহেতু ভদ্রলোককে সে কখনও দেখেনি, তাই ভেবেছিল ওদের প্রতিবেশী রঙ্গচারীর খোঁজ করতে বেরিয়েছেন বুঝি। এখন শুনল—ওর মাকেই খুঁজছেন ভদ্রলোক। এ আবার কী ফ্যাচাং। কেটির এখন জীবন-মরণ সমস্যা। মা যদি আগে বাড়ি পৌঁছে ওর চিঠিখানা পড়ে থাকে তাহলে ওদের বাড়িতে একটা প্রচণ্ড বিস্ফোরণ অনিবার্য। আর মায়ের আগে যদি ও পৌঁছায়, তাহলেও—

—তুমি কত নম্বরে নামবে?

ঈশ্বর কেটিকে ক্ষমা করুন। অন্তত দশটা মিনিট সময় তার নিতান্ত দরকার। বললে, আমি নামব ঐ ইলেকট্রিক পোস্টটার কাছে।

—আই সি। তোমাদের বাড়ির নম্বর কত?

মরিয়া হয়ে কেটি বললে, সাতচল্লিশ নম্বর আরও এক ফার্লং।

—এই রোখ্‌কে!—প্রৌঢ় ভদ্রলোকটির সঙ্কেতে ট্যাক্সি দাঁড়িয়ে পড়ল চিহ্নিত লাইটপোস্টের পাশে। কেটি নামল। ভ্যানিটি ব্যাগে হাত দিতেই ভদ্রলোক ওর হাতটা চেপে ধরলেন, নো, ইয়াং লেডি! আমি তোমাকে লিফ্‌ট দিয়েছি মাত্র!

মরমে মরে গেল কেটি। সজ্ঞানে সে ভদ্রলোককে বিপথে চালিত করল। মিনিট পনেরর মধ্যেই নম্বর খুঁজে খুঁজে উনি এসে পড়বেন। তখন কিছুতেই কেটি ওঁর সামনে এসে দাঁড়াবে না। তার মাথা ধরবে। সে শুয়ে পড়বে। না হলে বাথরুমে গিয়ে খিল দেবে!

ট্যাক্সিটা চলে গেল। কেটি এগিয়ে এল সদর দরজার কাছে। দরজা যথারীতি তালাবন্ধ। ভিতরে কিন্তু আলো জ্বলছে। কেটি কি যাবার সময় আলোটা নিবিয়ে যায়নি? না! যতদূর মনে হচ্ছে···তবে কি মা ওর আগেই ফিরেছে?··· হয়তো এখনও চিঠিখানা পড়েনি! ইস্! এতক্ষণ দেরি না করলেই বুদ্ধিমানের কাজ হত। ক্লিক করে শব্দ হল। তালা খুলে ড্রয়িংরুমে ঢুকল কেটি। প্রথমেই ছুটে গেল টেবিলটার কাছে; যেখানে সে রেখে গেছে চিঠিখানা। না। সেখানা সেখানে নেই। তার মানে···

কেটি বাথরুমের দরজাটা ঠেলে দেখে। সেটা খুলে যায়। কিচেনে উঁকি দেয়। সেটা ফাঁকা। এবার সে ঢোকে বেডরুমে। মা আর মেয়ে পাশাপাশি খাটে শোয়, একই ঘরে! ঐ তো মা! এ কী! ঘুমাচ্ছে? এমনভাবে!

—মা! মা গো। আমি এসেছি!

সাড়া নেই মায়ের!

বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মত লাফিয়ে উঠে কেটি! তাহলে সর্বনাশ হয়ে গেছে। ঐ তো টেবিলের উপর মায়ের বাক্সটা। ঘুমের ওষুধের বাক্সটা! তার মানে···

চীৎকার করে উঠল কেটি।

শীতের রাত্রে তার সে চীৎকার খান্‌খান্ হয়ে গেল। কোথাও কোনও সাড়া জাগল না। কী করবে সে এখন? ফার্স্ট-এড? ফোন? ডাক্তার? নাকি রঙ্গচারীকে ডেকে তুলবে? ছুটে বেরিয়ে যেতে চায় সদর দরজা খুলে। সেখানে অন্ধকারে কেউ দাঁড়িয়ে ছিল। হুমড়ি খেয়ে পড়ল তার ঘাড়ে। ওকে কাঁধ ধরে

boiRboi.net

তুললেন তিনি। কিছু একটা কথা বলতে গেলেন। তার আগেই কেটি বলল: মা···বিষ খেয়েছে!

—কে? নোয়ামি?

—হ্যাঁ। ডাক্তার! একজন ডাক্তার! ট্যাক্সিটা আছে এখনও?

ভদ্রলোক ওকে ঠেলে দিলেন ঘরের ভিতর। বললেন, মাথা ঠাণ্ডা রাখ। পাগলামি কর না। আমি নিজেই ডাক্তার। চল ভিতরে। কোথায় তোমার মা?

কোটটা একটানে খুলে ফেললেন গা থেকে। ছুঁড়ে দিলেন কেটির খাটে। বসলেন হাঁটু গেড়ে নোয়ামির অচেতন দেহটির পাশে। নাড়ি দেখলেন, জিভ-চোখ দেখলেন। তারপর কেটিকে বললেন, কী বিষ খেয়েছে আন্দাজ করতে পার?

কেটি নিঃশব্দে তুলে দেখালো ঘুমের ওষুধটা।

—নোয়ামি ইজ এ নার্স! ওর ফার্স্ট-এড কিটস্ আছে? ওষুধের কোন আলমারি আছে?

কেটি ভদ্রলোককে নিয়ে এল ডাইনিং স্পেস্-এ। একটা গা-আলমারিতে নোয়ামি হরেক রকম স্যাম্পল ওষুধ রাখত। খুলে দেখালো কাবার্ডটা।

উনি অত্যন্ত দ্রুত চোখ বুলাতে বুলাতে বললেন, থ্যাঙ্ক গড। যে অ্যান্টিডোট চাইছি তা পেয়েছি। শোন! সবার আগে ওকে বমি করাতে হবে। একটু গরম জল বসিয়ে দাও! কুইক! তারপর হাসপাতালে একটা ফোন করে দাও। অ্যাম্বুলেন্স চাই। ওরা যেন স্টম্যাক-ওয়াশের অ্যারেঞ্জমেণ্ট নিয়েই আসে। বলে দিও কেসটা কী। থার্ডলি, কোন নির্ভরযোগ্য মহিলা প্রতিবেশী থাকলে তাঁকে ফোন করে দাও—

করবী আর অলক যখন এসে পৌঁছালো তৎক্ষণে ডক্টর আয়াঙ্গার রোগীকে প্রায় ধাতস্থ করে এনেছেন। ওর পাকস্থলী পরিপূর্ণ ছিল, ফলে বিবমিষার বেগ অল্প-আয়াসেই এল। অ্যাম্বুলেন্স করে ওকে হাসপাতালে পাঠানোর প্রয়োজন হয়নি। ডাক্তার আয়াঙ্গার বললেন, মৃত্যুভয় আর নেই। তবে দীর্ঘ সময় রোগী পড়ে পড়ে ঘুমাবে।

করবী আর কেটি বসল রোগীর শিয়রে। অলক আর আয়াঙ্গার বাইরের ঘরে এসে বসলেন। ভয়ের কারণ আর নেই শুনে রঙ্গচারী নিজের ফ্ল্যাটে চলে গেলেন। অলক বললে, তুমি কেমন করে এখানে এসে জুটলে ডক্টর?

আয়াঙ্গার পকেট থেকে সিগার বার করে ধরালেন। কোটটা গায়ে চড়িয়েছেন

boiRboi.net

ইতিমধ্যে। বললেন, নিতান্ত ঘটনাচক্রে। নোয়ামির মৃত্যুযোগ ছিল না—এটাই বোধ করি একমাত্র কারণ।

অলক বললে, তুমি একদিন ওঁকে হত্যা করেছিলে। আজ আবার প্রাণ দিলে।

আয়াঙ্গার একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে বললেন, তোমার কৃতিত্ব কম নয়। তুমিই ওকে খুঁজে বার করেছিলে—

—কেটি কি তোমার পরিচয় জানে?

—না! এখন প্রশ্ন হচ্ছে—কেন নোয়ামি এই সিদ্ধান্ত নিল হঠাৎ? এতদিন বাদে? তোমার কী মনে হয়? তোমার কাছে কনফেশন করার ফলে?

—আমার তা আদৌ মনে হয় না। উনি খুব স্বাভাবিকভাবেই কথাবার্তা বলেছিলেন।

এই সময় উঠে এল কেটি। আয়াঙ্গারকে বললে, আপনার সঙ্গে একটা কথা ছিল—

—ইয়েস, ইয়াং লেডি। বল?

—আপনি একটু এ-ঘরে উঠে আসুন।

আয়াঙ্গার উঠে এল কেটির পিছু পিছু। কিচেনে। শোবার ঘরে করবী, বসার ঘরে অলক—কেটি বেচারি জনান্তিকে ক্ষমা চেয়ে নেবার সুযোগ আর পাবে কোথায়? রান্নাঘরে এসে কেটি বললে, কফি খাবেন?

আয়াঙ্গার জবাব দেয় না। মিটিমিটি হাসে। কেটি নয়ন নত করে। আয়াঙ্গার একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে বলে, সেই প্রশ্নটা করতেই কি নির্জনে ডেকে নিয়ে এলে?

—না আপনি কে তা আমি জানি না। কেন আমার মাকে খুঁজছেন তাও জানি না—কিন্তু আমি আপনার প্রতি অত্যন্ত অন্যায় ব্যবহার করেছি। আমি ক্ষমা চাইবার জন্যই আপনাকে ডেকেছি।

আয়াঙ্গারের চোখ দুটি অশ্রুসজল হয়ে ওঠে। ওর হাতখানা টেনে নিয়ে বলে, আই নো, পুয়োর চাইল্ড! কেন তুমি আমাকে মিথ্যা কথা বলেছিলে—

—জানেন? কী জানেন? কেমন করে জানেন?

—সবটা জানি না। কিছুটা আন্দাজ করতে পারি ফলাফলটা দেখে। মায়ের সঙ্গে তোমার একটা বিশ্রী রকম ঝগড়া হয়েছিল বোধহয়—সেজন্য সে এমন কাণ্ডটা করেছে। তাই তুমি আমাকে সঙ্গে নিয়ে বাড়ি ফিরতে চাওনি। অ্যাম আই কারেক্ট?

boiRboi.net

সোনালী চুলে ভরা মাথাটা ঝাঁকিয়ে কেটি বললে, মোটেই তা নয়। মায়ের সঙ্গে আমার একটুও ঝগড়া হয়নি—

—তাহলে তোমার মা এমন কাণ্ডটা কেন করেছে তা তুমি জান না বলতে চাও?

কেটি ইতস্তত করল। তারপর বললে, তাও ঠিক নয়। সেটা আমি জানি—

—সেটা কী? আমাকে বল—

—কিন্তু আপনি কে তাই তো জানি না আমি।

—জান না মানে? আয়াম দ্য ফিজিশিয়ান। আমি ডাক্তার। তোমার মায়ের চিকিৎসা করছি। সবটা না জানলে চিকিৎসা করব কেমন করে? ডাক্তারকে সব কথা বলতে হয়—তুমি শোননি একথা?

কেটি তবু ইতস্তত করে বললে, মা তো ভাল হয়ে যাবে বলছেন। যা বলার মাই বলবে। আমি আপনাকে চিনিই না—

—আমিও তো তোমাকে চিনি না কেটি—

—বাঃ! আমি তো আমার মায়ের মেয়ে—আমাকে চেনেন না মানে? মাকে চেনেন—

—তোমার মাকে আমি চিনতাম ষোলো বছর আগে। তখনও তোমার জন্ম হয়নি। তখনও তোমার মায়ের বিবাহ হয়নি—

কেটি অবাক বিস্ময়ে ওঁর দিকে তাকিয়ে থাকে। অস্ফুটে বলে, ষোলো বছর আগে?···আপনি ডাক্তার!···আপনি কি···আপনার নামটা কি···

আয়াঙ্গারের দু-চোখের পাতা জলে ভরে ওঠে, ইয়েস মাই পুয়োর চাইল্ড। আমার পুরো নাম ডক্টর এ. এম. আয়াঙ্গার! আয়াম, ওয়েল···আয়াম য়োর···

কেটির দু-চোখও জলে ভরে ওঠে। অদ্ভুত একটা অভিব্যক্তি···বিস্ময়··· প্রত্যাশা···অভিমান···অশ্রুজল।

হঠাৎ দু-হাতে আয়াঙ্গারকে জড়িয়ে ধরে বললে, ড্যাড! ও মাই···

আয়াঙ্গার নিবিড় করে জড়িয়ে ধরে তার অচেনা মেয়েকে—

ওরা খেয়াল করে দেখে না অলক কখন উঠে এসে দাঁড়িয়েছে ওদের পিছনে। নিঃশব্দে।

BanglaBook.org

আয়াঙ্গার সে-রাত্রে হোটেলে ফিরল না। কেটি ফিরতে দিল না। নোয়ামির তখনও ঘুম ভাঙেনি। আয়াঙ্গারের হিসাব মতো হয়তো আগামীকালও সে সারাদিন ঘুমাবে। 'আগামীকাল' কথাটা অবশ্য ব্যাকরণসম্মত নয়—রাত এখন একটা। বড়দিন। এমন একটি দিনে নাজারেথের আস্তাবলে জন্ম নিয়েছিলেন মানবত্রাতা—এমন দিনেই আয়াঙ্গার জীবন দিল তার জীবনসঙ্গিনীর। কেটির ব্যবস্থাপনায় আয়াঙ্গারকে আশ্রয় নিতে হল ড্রইংরুমের সোফা-কাম-বেড-এ। অলক বুঝতে পারে এখন তারা বাহুল্য। বিপদের আশঙ্কা আর নেই। আজ হোক, কাল হোক নোয়ামির দীর্ঘদিনের একাকীত্বের ঘুম ভাঙবে। সেই পরমলগ্নে চোখ মেলে সে যাদের দেখলে খুশি হবে সেখানে প্রতিবেশিনা করবী, কিংবা অপরিচিত অলকের কোন ভূমিকা নেই। তাই সে বিদায় চাইল ডাক্তারের কাছে, ডক্টর! এবার আমাদের ছুটি? মিসেস বাসুকে তাঁর বাড়ি পৌঁছে দিয়ে আমি এবার হোটেলে ফিরে যাই?

আয়াঙ্গার কুণ্ঠিত হয়ে বললে, অফ কোর্স। না, ভয়ের আর কিছু নেই—

বিদায় নিয়ে ওরা আবার পথে নামল। কন্‌কনে ঠাণ্ডা। অলক বললে, আমার মাফলারটা তুমি নাও।

—না, না, তার কোন দরকার নেই—

অলক শুনল না। জোর করে গলাবন্ধটা জড়িয়ে দিল করবীর গলায়। এবার আর আপত্তি করল না করবী। চলতে চলতে বললে, আমি কিন্তু ব্যাপারটা ঠিক বুঝতে পারলাম না। কে ঐ ভদ্রলোক? ঐ ডক্টর আয়াঙ্গার উনিই ডক্টর স্মিথ?

অলক চলতে চলতেই জবাব দেয়, সে গল্প শুরু করলে রাত ভোর হয়ে যাবে।

—যাক না। এমন একটা অবাক-রাত্রি না হয় জেগেই কাটালুম দুজনে। তুমি কি ভেবেছ তোমাকে হোটেলে ফিরতে দেব এত রাত্রে?

দাঁড়িয়ে পড়ে অলক, মানে? আমি কি তোমার ঘরে রাত্রিবাস করব না কি?

—ঘরে নয়, বাড়িতে। আমার গেস্টরুমে—

—সেই যেখানে ক্যাপ্টেন বসাক তিন মাস ধরে—

—হ্যাঁ, কিন্তু আবার তুমি ভুল করছ অলক। তোমাকে আমি যা বলেছি তা সত্যি নয়। আমি···

অলক বললে, কিন্তু কথা হয়েছিল ও-বিষয়ে আমরা আলোচনা করব না আর।

করবী তৎক্ষণাৎ সায় দেয়, ঠিক কথা। আজ আমার কথা নয়, আজ শুনব

boiRboi.net

নোয়ামির গল্প। আমার মনে হচ্ছে, তখন যে তুমি বলছিলে দুটি ছেলেমেয়ে পরস্পরকে খুঁজছে, তারা কি নোয়ামি আর আয়াঙ্গার ?

—'বুল্‌স্ আই' হিট করেছ তুমি।

দ্বিতীয়বার চাবি খুলে নিজের ঘরে ঢুকল করবী। হীটারে বসিয়ে দিল কফির দুধ। বললে, বাইরের ঘরে নয়, তুমি ইজিচেয়ারটা টেনে নিয়ে এস, কিচেনের সামনে বসে শুরু কর নোয়ামির গল্প—

—কিন্তু আমি যে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ করবী—

—সে প্রতিশ্রুতি তুমি একাধিকবার ভেঙেছ অলক···আমার সঙ্গে এসে দেখা করেছ, আয়াঙ্গারকে নোয়ামির পরিচয় দিয়েছ, এখনই বা আমাকে সব কথা খুলে বলতে পারবে না কেন ? হয়তো মিসেস স্মিথ···

বাধা দিয়ে অলক বলে ওঠে, মিসেস স্মিথ বলে কেউ নেই, স্মিথ্ ইজ এ মিথ্!

—তার মানে ?

দীর্ঘ কাহিনী যখন শেষ হল তখন রাত আড়াইটে। অলক বললে, এবার শোয়া যাক। আমার ঘরে একটা বালিশ, আর কম্বল···

—চল বিছানা করে দিচ্ছি—

বাইরের ঘরে অলকের বিছানাটা পেতে দিল করবী। হাতে হাতে সাহায্য করল অলক। পাতা বিছানায় বসে বললে, গুডনাইট। এবার শুয়ে পড়গে যাও।

করবীর কিন্তু যাবার লক্ষণ নেই। সে বসে পড়ে সামনের সোফাটায়। বলে, তোমার ঘুম পাচ্ছে ?

—আদৌ নয়। কফি খেয়ে ঘুম ছুটে গেছে—

—এস, তবে গল্প করেই কাটিয়ে দিই বাকি রাতটা।

—আমার আপত্তি নেই। এবার কী নিয়ে গল্প হবে ? আর একটা কেস-হিস্ট্রি শুনবে ?

—না। এবার আমি বলব। তুমি শুনবে।

—তুমি বলবে, আমি শুনব ? কী শোনাবে তুমি ?

—আর একটা কেস-হিস্ট্রি।

অলক আবার একটা সিগারেট ধরায়। বলে, ইন্টারেস্টিং। শোনাও। কার কথা ?

—মিসেস টু-জিরো-টু-নাইন। নতুন করে। এবার পর্দার আড়ালের দরকার নেই। তোমার চোখে চোখ রেখে বলব—দেখি কতটা বলতে পারি···

—ত হয় না করবী! ওভাবে তোমার গোপন কথা কেন শুনব আমি ?

BoiRboi.net

—শুনবে আমাকে বাঁচাবার জন্য! যেভাবে নোয়ামিকে বাঁচিয়েছ তুমি সেই-ভাবে আমাকেও বাঁচানো যায় কি না, একবার চেষ্টা করে দেখ না? আমি··· আমি পারব···দেখ তুমি···ঠিক পারব।

অলক তবু ইতস্তত করে।

করবী ওর হাতটা টেনে নিয়ে বলে, কেন বুঝতে পারছ না তুমি? আমি ·· আমি একটা নিদারুণ যন্ত্রণায় ভুগছি। সব কথা বলে মনটা হাল্‌কা করে ফেলতে চাই। জানি না, সব কথা বলতে পারব কি না···তবে পারলে আজই পারব। আমি তোমার পরামর্শ চাই অলক। প্লীজ হেল্‌প্‌ মী···

অলক বলতে গেল যে, সে সাইকিয়াট্রিস্ট নয়, করবীর উচিত হবে কোন মনস্তত্ত্ববিদের শরণাপন্ন হওয়া; কিন্তু চোখ তুলে দেখল করবীর চোখ দুটো প্রত্যাশায় কাঁপছে। হয়তো ঠিকই বলেছে সে, আজকে ওর মনের দরজাটা হঠাৎ দমকা হাওয়ায় খুলে গেছে। পারলে আজই পারবে সে সব কথা খুলে বলতে। চরম লগ্নটা আজ অবহেলায় অতিক্রান্ত হলে পরমকল্যাণকে হয়তো আর কোনদিনই নাগালের মধ্যে পাওয়া যাবে না।

—তুমি একে একে প্রশ্ন করে যাও, অলক!

তৎক্ষণাৎ মনস্থির করে অলক। প্রশ্নাবলী তার কণ্ঠস্থ। সে জানে কোন্ প্রশ্নগুলো বাহুল্য। তাই ডিঙিয়ে ডিঙিয়ে চলে সে···

—সাত বৎসরের বিবাহিত জীবনে কোনদিন গর্ভে সন্তান এসেছিল?

—না।

—প্রথম থেকেই জন্ম-নিয়ন্ত্রণ করে এসেছেন?

—না। কোনদিনই করিনি···

—কেন সন্তান হচ্ছে না জানবার জন্যে কখনও নিজেকে অথবা আপনার স্বামীকে পরীক্ষা করিয়েছিলেন?

—না?

—কেন সন্তান হচ্ছে না, জানবার কৌতূহল হয়নি?

—না!

—আপনি ইতিপূর্বেই বলেছিলেন, প্রতিবারই আপনি 'চরম পুলক' লাভ করেছেন। সে কথা সত্য?

করবীর দৃষ্টি নত হয়। দাঁত দিয়ে ঠোঁটটা কামড়ে ধরে। চোখ মুখ লাল হয়ে ওঠে তার। প্রবলভাবে মাথাটা নাড়ে—'না'-য়ের ভঙ্গিতে। অলকের করুণা হল। মেয়েটি অনুমতি দিয়েছে বলেই কি এসব প্রশ্ন কোন মহিলাকে করা চলে—

BanglaBook.net

মুখোমুখি বসে? প্রসঙ্গান্তরে চলে আসে তৎক্ষণাৎ। এ-প্রশ্নটাও মোক্ষম; কিন্তু এটিকে এড়িয়ে যাবে সে কেমন করে?

—প্রাকবিবাহ অথবা বিবাহোত্তর জীবনে স্বামী ভিন্ন···

প্রশ্নটা শেষ হয় না। তার আগেই করবী বলে ওঠে—না!

—তার মানে ক্যাপ্টেন বসাকের সঙ্গে···

—না, না, না। কোনদিনও নয়!

—আশ্চর্য! তাহলে সেদিন অমন মিথ্যা কথা কেন বললে করবী?

করবী চোখ তুলল। অলক দেখে দু-চোখের জলে তার গাল ভেসে যাচ্ছে। দু-হাত দিয়ে অলক ওর অশ্রুধৌত মুখখানা তুলে ধরে। আত্মসম্বরণ করতে পারে না। অশ্রু-আর্দ্র ওর ওষ্ঠাধরে চুম্বন-চিহ্ন এঁকে দিয়ে বলে, করবী, আমি জানি না, কেমনভাবে আসল কথাটা জেনে নেব। তুমি নিজেই বল···

এবারকার চুম্বনে করবীর কোন ভূমিকা ছিল না কিন্তু। আবেশে তার চোখ দুটি মুদে এসেছিল শুধু। আবার সে চোখ মেলে তাকালো। বললে, তুমি জিজ্ঞাসা করতে পারছ না, আর আমি নিজে থেকে বলতে পারব?

অলক উত্তেজনায় উঠে দাঁড়ায়। বলে, কী জিজ্ঞাসা করব? প্রশ্নের তো পাহাড় জমে আছে আমার অন্তরে! জিতেন্দ্রনাথকে ভালবাসতে পেরেছিলে? তুমি কী করে জানলে তুমি বন্ধ্যা? কেন সেদিন একবুড়ি মিথ্যা কথা বলেছিলে আমায়? কেন বলেছিলে ক্যাপ্টেন বসাকের সঙ্গে একদিন নয়, দুদিন নয়, রাতের পর রাত···বল, বল···চুপ করে আছ কেন? প্রশ্ন তো করছি···

ওর দুটো কাঁধ ধরে ঝাঁকানি দিতে দিতে অলক প্রশ্ন করে চলে।

করবী নির্বাক। নিশ্চুপ। ওর দুটি চোখ আবার নিমীলিত। সে জেগে আছে না ঘুমাচ্ছে, বোঝা যায় না। দাঁত দিয়ে ঠোঁটটা কামড়ে ধরে আছে।

অলক ঝাঁকানি বন্ধ করে। কাঁধ ছেড়ে ওর বাহুমূল চেপে ধরে। দৃঢ়মুষ্টিতে। বলে ওঠে, করবী! তোমাকে কোনও কথা বলতে হবে না। আমি বুঝতে পারছি যে, সেটা এমন একটা কথা যা মুখে বলা যায় না—তা তোমার নারীত্বের অপমান—সেটা তোমার মৃত্যুর বাড়া? তাই নয়?

চোখ দুটি খুলল না। উপরে নিচে ঘাড় নেড়ে স্বীকার করল করবী।

—আমি তা বুঝতে পারছি। কিন্তু আমিও যে প্রতিজ্ঞা করে বসে আছি করবী, তোমাকে এভাবে মরতে দেব না। নোয়ামিকে যেভাবে বাঁচিয়েছি, তুমিও যে সেইভাবে বাঁচতে চেয়েছ—ডাক দিয়েছ আমাকে; তোমাকে বাঁচিয়ে তুলতে।

boiRboi.net

সোয়ামিও মরতে চেয়েছিল—আমরা তাকে জোর করে বাঁচিয়েছি। তুমি মরতে চাইলেই বা আমি শুনব কেন?

এবার চোখ মেলে তাকালো করবী। বললে, কেমন করে বাঁচাবে?

—যে কথা বন্ধুকে বলা যায় না, সে-কথা জীবনসঙ্গীকে বলা যায়! তুমি তোমার সমস্ত দায়িত্বটা আমাকে দেবে করবী? আমি বিবাহের কথা বলছি!

এক ঝটকায় নিজেকে মুক্ত করে নিল করবী। উদ্‌গত অশ্রু গোপন করে ছুটে বেরিয়ে গেল ঘর ছেড়ে। যাবার সময় সশব্দে বন্ধ করে গেল দরজাটা।

গেস্ট-রুমের ভিতর দিকের দরজাটাও ইয়েল-লক। চাবি ছাড়া আর তা খোলা যাবে না।

ঘুম ভাঙল ঠেলাঠেলিতে। চোখের পাতা ভারি। শরীরের গ্লানি এখনও কাটেনি। তবু ঠেলাঠেলিতে উঠে বসল অলক। করবী তাকে ডাকছে। মনে হল করবী সদ্য ঘুম থেকে উঠে এসে ওকে ডেকে তুলেছে। তার মুখচোখে জল দেওয়াও হয়নি। কাচের জানলা ভেদ করে একমুঠো শীতের রোদ এসে পড়েছে মেঝেতে। করবীকে দেখে মনে পড়ল একটা পুরাতন উপমা—বাসিফুলের মালা। কিন্তু কাব্য করা হল না; তার আগেই করবী বলে ওঠে, অলক, ওঠ, আমাকে এক্ষুনি বের হতে হবে। এইমাত্র টেলিফোনে একটা দুঃসংবাদ পেলাম।

আজ পঁচিশে ডিসেম্বর। ঘুম ভেঙে উঠেই দুঃসংবাদ! মেজাজটা খিঁচড়ে গেল। খাট থেকে নেমে পড়তে হল! ভদ্রতার দায়ে বলতে হল, দুঃসংবাদ? কেন, কার কী হয়েছে?

—আমার এক বান্ধবী—শীলা কাপুর, কাল রাত্রে খুন হয়েছে। তার স্বামী একটু আগে টেলিফোন করে জানালেন। পুলিস এসেছে। আমাকে একবার যেতে বললেন। তুমি···তুমি এখন কী করবে?

boiRboi.net

—তুমি যা বল। হোটেলে ফিরে যেতে পারি। যদি তোমার কাজে লাগতে পারি, তাহলে তোমার সঙ্গেও যেতে রাজী।

…নেই ভাল। আমার সঙ্গেই চল। বেশি দূরে নয়—এ-পাড়াতেই, খান দশ-বারো বাড়ি পার হয়ে।

দ্রুতগতিতে ওরা প্রাতঃকৃত্য সেরে নিল। করবীর টুথ-পেস্ট আঙুলে নিয়ে মুখটা ধুয়ে ফেলল। দাড়ি কামাবার প্রশ্নই ওঠে না। করবীর বাড়িতে সে-সব সরঞ্জাম নেই। এক-এক কাপ চা খাওয়া গেল। কাল রাত্রের এঁটো বাসন নেই। মুন্নির মা এখনও আসেনি। দুধটা…যাক, সে যা হবার হবে। করবী ঘরে তালা দিয়ে অলককে নিয়ে পথে নামল। শীলা কাপুরের মোটামুটি পরিচয় দিয়ে দিল পথে যেতে যেতে।

যশোবন্ত কাপুরের বাড়ির সামনে খান দুই-তিন গাড়ি। একটা পুলিসের জীপ. একটা অ্যাম্বুলেন্স আর জি. এম.-এর কালো সিডান-বডি গাড়িটা। পুলিস কাল রাত্রেই এসেছিল। মোটামুটি জবানবন্দি নেওয়া হয়েছে। মৃতদেহ এখনও অপসারিত হয়নি। জি. এম. নিশ্চয় খবর পেয়ে এই সাত-সকালেই এসেছেন!

বাইরের ঘরে ঢুকে দেখল ওঁরা সবাই বসে আছেন ছড়িয়ে-ছিটিয়ে। থানার ও. সি. এবং একজন ইন্সপেক্টর, জি. এম., যশোবন্ত এবং মিস্টার মেহ্‌রা। ডঃ ব্যানার্জি নির্লিপ্তের মত বললেন, এস করবী, বস—

অলকের পরিচয় কেউ জানতে চাইল না। সে বসল এক কোণায়।

পুলিস এসেছে কাল রাত্রেই। মৃতদেহ এখনও অপসারিত হয়নি বটে তবে সারাটা বাড়ি তন্নতন্ন করে সার্চ করা হয়েছে। ফটো নেওয়া হয়েছে। যশোবন্তের জবানবন্দিও নেওয়া হয়েছে। যশোবন্তের ফোন পেয়ে জি. এম. স্বয়ং এসেছেন, সঙ্গে করে নিয়ে এসেছেন আইনজ্ঞ মিস্টার মেহ্‌রাকে। মেহ্‌রা যশোবন্তকে প্রথমেই বলেছিলেন, আপনি কোন কথা বলবেন না। আপনার সলিসিটারের সঙ্গে কথা না বলে কোন কথা না বলার অধিকার আপনার আছে।

যশ প্রত্যুত্তরে বলেছিল, সেটা আমার জানা ছিল, মিস্টার দাসও আমার অধিকার সম্বন্ধে আমাকে সচেতন করেছিলেন—কিন্তু আমার লুকোবার কিছু নেই। আমি সব কথা খোলাখুলিই বলেছি। কাল রাত্রেই লিখিত জবানবন্দি দিয়েছি।

মেহ্‌রা বলেছিলেন, অন্যায় করেছেন। কেন এমন কাণ্ডটা করলেন?

—আয়াম এ স্পোর্টসম্যান আফটার অল!

পাগলের কথা। খুনের মামলার আসামীর খেলোয়াড়ি মনোভাব। এমন কথা

banglainternet.com

কেউ কখনও শুনেছে? যার বউ চোখ উলটে মরে পড়ে আছে পাশের ঘরে সে স্পোর্টসম্যানশিপের বড়াই করছে!

পুলিসের মতে কেসটা সরল। যশোবন্ত বিকাল পাঁচটায় স্ত্রীকে ফোন করে জানায় যে, সম্ভবত আজ রাত্রে সে বাড়ি ফিরবে না; ফিরলেও রাত বারোটার আগে নয়। সংবাদের উৎস—যশোবন্তের নিজের স্বীকারোক্তি। ফলে শীলা স্থির করে আজ রাত্রেই সে গৃহত্যাগ করবে—ঐ বারোটার আগে। শীলার গোছানো স্যুটকেশ এবং চিঠিই তার প্রমাণ। সম্ভবত রাত বারোটা দশের মেল ট্রেনে। রাত দশটায় মিসেস প্রমীলা দাশগুপ্ত শীলার সঙ্গে টেলিফোনে কথা বলেছেন, রাত এগারোটা বত্রিশে যশোবন্ত থানায় ফোন করে। সুতরাং মৃত্যুর সময় রাত দশটা থেকে সাড়ে এগারোটা। অটোপ্সি সার্জেনও সে কথা বলবেন। এখন দেখা যাচ্ছে যশোবন্ত কারখানার গেট থেকে কার্ড পাঞ্চ করে বেরিয়েছে দশটা বেয়াল্লিশে। স্কুটারে করে তার বাড়ি আসতে দশ মিনিট লাগার কথা—অর্থাৎ এগারোটা বাজতে দুইয়ে। ধর এগারোটায়। বাড়ি এসেই সে মৃতদেহটা দেখতে পাবে—তাহলে সে আধঘণ্টা পরে এগারোটা বত্রিশে থানায় ফোন করল কেন? এর একটি মাত্র জবাব হতে পারে, বাড়ি এসে যশোবন্ত শীলাকে মৃত অবস্থায় দেখেনি। শীলা মারা গেছে যশোবন্ত ফিরে আসার পরে! কে হত্যা করেছে তাকে? একটি লোকই হতে পারে!

বলবে—কেন? মোটিভ কী? এভিডেন্স সামনে পড়ে আছে—শীলার চিঠি-খানা। যশোবন্তকে দেখে শীলা নার্ভাস হয়ে পড়ে। চিঠিখানা লুকোবার আগেই সেটা যশোবন্তের হাতে পড়ে। এর পর ক্ষণিক উন্মাদনায় শীলার কণ্ঠনালী দু-হাতে চেপে ধরা কি যশোবন্তের মত ষণ্ডামার্কা একটা স্পোর্টসম্যানের পক্ষে অস্বাভাবিক?

তোমরা বলবে—সে-ক্ষেত্রে শীলার মৃতদেহ কেন ঐ রকম উলঙ্গ অবস্থায় পাওয়া যাবে সাদা চাদরের তলায়? সহজ উত্তর। যশোবন্ত কেসটা ঐ ভাবে সাজিয়েছে। যে কারণে তার আধঘণ্টা দেরী হয়েছে ফোন করতে। মিনিট দশেক লেগেছে ভাবতে—কেসটা কী-ভাবে সাজাবে, মিনিট পাঁচেক লেগেছে স্কুটারের টায়ারটা কোন ধারালো অস্ত্র দিয়ে পাঞ্চার করতে—আর বাকি সময়টা লেগেছে শীলাকে সাজিয়ে তুলতে। সহজ সমাধান।

অভিজ্ঞ কোতোয়ালি-থানার ও. সি. মৃগেন দাসের মতে যশোবন্ত একটি পাকা ক্রিমিনালের মত কেসটা সাজাবার চেষ্টা করেছে বটে কিন্তু শতকরা আশিভাগ সম্ভাবনা তার গিল্‌টি ভার্ডিক্ট হবে!

ডঃ ব্যানার্জি বলেছিলেন, মিস্টার দাস, কাপুর যখন কাউকে জিজ্ঞাসা

BanglaBook.org

না করেই তার জবানবন্দি দিয়ে বসে আছে তখন আমাদের বোধহয় আর কিছু করার নেই?

মেহরা বলেন, কে বলল নেই? মিস্টার কাপুর আদালতে সেটা অনায়াসে প্রত্যাহার করে নিতে পারেন। বলতে পারেন, স্ত্রীর মৃত্যুতে তাঁর সাময়িক চিন্তাশক্তি ব্যাহত হয়েছিল—তিনি কী বলেছেন না বলেছেন তাঁর খেয়াল নেই—

যশোবন্ত প্রতিবাদ করে উঠেছিল, বাট্ দ্যাটস্ নট ট্রু! আমার মাথা ঠিকই ছিল, এখনও আছে। শীলার মৃত্যুতে নিশ্চয় শক্ পেয়েছি—কিন্তু যা বলেছি তা আদ্যন্ত সত্যিকথা।

ওর দিকে জ্বলন্ত একজোড়া চোখের দৃষ্টি মেলে ব্যানার্জি ও. সি.-কে বলেন, কাপুরের জবানবন্দিটা একবার দেখতে পারি?

—আপত্তি নেই কিছু···দেখুন।

যশোবন্ত কাপুর বলেছে, সে রাত দশটা সাতান্ন কি আটান্ন মিনিটে বাড়ির গেটে এসে পৌঁছায়। গেটটা খোলা ছিল। ও স্কুটার থেকে নেমে দেখতে পায় ওর ফ্ল্যাটের দরজা হাট করে খোলা, ঘরে আলো জ্বলছে। স্কুটারটা রাত্রে থাকে গ্যারেজে। যশোবন্ত সেটা স্বস্থানে রেখে চাবি বন্ধ করে বাড়ির দিকে আসতে গিয়েই দেখতে পেল, ওর খোলা দরজা দিয়ে কে একটা লোক প্রথমে হামাগুড়ি দিয়ে পরে উঠে দাঁড়িয়ে ছুটে বেরিয়ে এল। লোকটার পরনে স্যুট। ভদ্রলোক। মুখটা দেখতে পায়নি। যশোবন্ত তখন হাত পনের-কুড়ি দূরে। প্রথমেই তার মনে হল ছুটে গিয়ে লোকটাকে ধরে; কিন্তু চকিতে ওর মনে পড়ল আসবার সময় বাড়ি থেকে কিছু দূরে সে একটা গাড়িকে পার্ক-করা অবস্থায় দেখেছে। একটা অ্যামবাসডার গাড়ি, আর একটা মোটর বাইক! লোকটা যদি কোনক্রমে সেই গাড়িতে অথবা মোটর বাইকে উঠে স্টার্ট দেয়, তবে আর তাকে ধরা যাবে না। যশোবন্ত সামনে না এসে পিছনে ফেরে। একটানে খুলে ফেলে গ্যারেজের দরজা, বার করে স্কুটারটা, স্টার্ট দেয়। গেট পার হয়ে সে দেখতে পায় লোকটা ঐ গাড়িতেই উঠল এবং গাড়িটা চলতে শুরু করল। নম্বরটা পড়তে পারেনি যশোবন্ত। মিনিট পাঁচ-সাত সে ঐ গাড়িটাকে অনুসরণ করে। তারপর দুর্ভাগ্যবশত ওর টায়ার পাঙ্কার হয়ে যায়। বাধ্য হয়ে সেটাকে ঠেলতে ঠেলতে বাড়ি ফিরে আসে। দ্বিতীয়বার যখন বাড়িতে ঢোকে তখন এগারোটা কুড়ি-বাইশ হবে। এইবার সে শীলার মৃতদেহ আবিষ্কার করে। প্রথমে ফোন করে একজন ডাক্তারকে। তারপর থানায়।

করবী যখন ঘরে ঢুকল, তার আগেই এসব অধ্যায় শেষ হয়েছে। যশোবন্ত

boiRboi.net

ও. সি.-কে বললে, আমি কি মিসেস বাসুকে পাশের ঘরে নিয়ে গিয়ে আমার পারিবারিক কথা কিছু বলতে পারি ?

—অফ কোর্স ! যান আপনি, ভিতরের ঘরে গিয়ে কথা বলুন !

ভিতরের ঘর—অর্থাৎ শয়নকক্ষ ! সেখানে আপাদমস্তক একটা সাদা চাদরে ঢাকা দেওয়া পড়ে আছে শীলা করবী দেওয়াল ঘেঁষে দাঁড়াল। কাপুর বললে, মুন্না কাল পশু'র মধ্যেই ফিরবে। সরযূ হয়তো ওকে নিয়ে গিয়ে রাখতে চাইবে, কিন্তু আমি চাই না সেটা। আপনি কি ওকে আপনার কাছে রাখবেন ?

—আপনাকে কি ওরা অ্যারেস্ট করছে ?

—হ্যাঁ। আমার বিরুদ্ধে কেসটা জোরালো—যদি কোনদিন ফিরে না আসি আপনি কি মুন্নার দেখ্‌ভাল করবেন ? টাকা-পয়সার কোন অভাব হবে না, সেসব ব্যবস্থা আমি করব ; কিন্তু একেবারে অফ'ানেজে—

—এসব কী বলছেন ? আপনার বোন, কিংবা ভাই—

—কী জানেন ? ওদের বৃহৎ সংসার ! মুন্না চিরকাল একা একা মানুষ। তাছাড়া—

—ঠিক আছে। আপনি চিন্তা করবেন না। তাছাড়া আপনি ফিরে আসবেন না এ কথাই বা ভাবছেন কেন ?

—দ্য কেস ইজ প্রেটি ব্যাড, মিসেস বাসু ! আমি যে নিরপরাধ এটা প্রমাণ করা অত্যন্ত কঠিন !

একটু নীরবতা। শেষে যশোবন্ত নিজেই বলে, আমাদের অ্যাকোয়ারিয়ামের মাছগুলো আজই নিয়ে যাবেন। বাড়ির চাবি আপনাকেই দিয়ে যাচ্ছি। মাছগুলো তো কোন অপরাধ করেনি—

—ঠিক আছে। সব দায়িত্ব আমি নিচ্ছি—আপনি ফিরে না আসা পর্যন্ত।

যশোবন্ত হাসল, বললে, অমন কথা বলবেন না করবী দেবী। আমি একেবারে নাও ফিরতে পারি।

—সে ক্ষেত্রে আমিই হব মুন্নার মা ! আমারও তো কোন অবলম্বন নেই আপনি জানেন !

—সেই জন্য এত লোক থাকতে আপনাকেই ডেকেছি।

একটু ইতস্তত করে করবী বললে, আপনি কি কোনোদিনই কিছু সন্দেহ করেননি ?

মাথা নেড়ে যশোবন্ত বললে, না ! 'লেগ-স্লিপে' যে ফিল্ডার থাকতে পারে এটা সন্দেহই হয়নি আমার। আচমকা গ্লান্স করে 'ক্যাচ-আউট' হয়ে গেলাম !

boiRboi.net

'লেগ্-স্লিপ্' মানে? 'লেগ' বোঝে···শীলার, স্লিপও বোঝে···পদস্খলন, গ্লান্স তো চকিত চাহনি কিন্তু 'লেগ্-স্লিপ্' কী? সে কথা না তুলে করবী বলে, লোকটা কে আন্দাজ করতে পারেন?

—না।

—পুলিস খুঁজে বার করতে পারবে না?

—পুলিস হয়তো চেষ্টাই করবে না। পুলিসের মতে সে তো খুনী নয়; শীলা প্রাপ্তবয়স্কা! সে যদি সজ্ঞানে ব্যভিচার করে—

—কিন্তু ঐ ক্রিকেট ব্যাটটা এল কেমন করে?

—সেটা তো আমরা ভাবছি। পুলিস বলবে, আমিই কিনেছি—

দরজার ও-পাশ থেকে মিস্টার দাস বললেন, এক্সকিউজ মি, এবার আমাদের যেতে হয়—

ধরাধরি করে শীলার মৃতদেহটা অপসারণ করল ওরা। যশোবন্ত কাপুর গিয়ে বসল গাড়িতে। দরজার চাবিটা হাত বাড়িয়ে করবীকে দিল। বললে, মুন্নাকে বলবেন···হি শুড টেক ইট স্পোর্টিংলি···আমি তাকে···

কথাটা শেষ করতে পারল না, স্পোর্টসম্যান যশোবন্ত কাপুর!

অলক যখন আপ্যায়নে এসে পৌঁছালো তখন বেলা প্রায় বারোটা। ইতিমধ্যেই কাপুরের বাড়ি থেকে সে আবার করবীর বাড়িতেই ফিরেছিল। সেখানেই প্রাতরাশ সারে। কথাবার্তা হয় শীলা কাপুরের বিষয়েই বেশি। শীলা, মুন্না, যশোবন্ত এবং সেই অজ্ঞাত ব্যভিচারী। অলক বোঝে সুর কেটে গেছে—এখন এ পরিবেশে গতকাল রাত্রের সেই নিরুত্তর প্রশ্নটার উত্থাপন শোভন হবে না।

হোটেলে ঢুকতেই নজর হল লাউঞ্জের একপ্রান্তে কয়েকজন জমিয়ে বসেছেন। বেয়ারা তো বটেই, স্বয়ং ম্যানেজারও কাছে-পিঠে ঘুরঘুর করছে। টেবিলের উপর কফি-ট্রে! বসে আছেন ডঃ ত্রিবেদী, মিস মেহ্তা, কোতোয়ালি থানার সেই ও.

boiRboi.net

সি. ভদ্রলোক—কী নাম যেন? মৃগাঙ্ক না মৃণাল দাস? আবার পুলিশ কেন? কিন্তু তার ও-পাশে ঐ চুরুট-মুখো গলাবন্ধ কোট-পরা ভদ্রলোক কি মিস্টার কানোরিয়া নন? খবরের কাগজে দেখা ছবির সঙ্গে বেশ মিল আছে যেন। সম্ভবত আজ সকালেই উনি এসে পৌঁচেছেন। সেই রকমই কথা ছিল তো। অলক আশা করল ডঃ ত্রিবেদী তাঁর সঙ্গে ওর পরিচয়টা করিয়ে দেবেন। তা কিন্তু দিলেন না ডঃ ত্রিবেদী। ওকে দেখতে পেয়েই ডাকলেন, এই যে অলক! কোথায় ছিলে এতক্ষণ? তোমাকে আমি সারা সকাল—খবর শুনেছ?

খবর! হ্যাঁ বিচিত্র সংবাদ! অবিশ্বাস্য! ডঃ ত্রিষুগীনারায়ণ শর্মা মারা গেছে!

শুধু তাই নয়; বিচিত্র অ্যাকসিডেন্ট!

আজ সকালে পাগলা-ঝোরার নিচে—সেই মৃত্যুতীর্থ সুইসাইড স্পটের সাতশ' ফুট নিচে আবিষ্কৃত হয়েছে ডঃ শর্মার মৃতদেহ, আর তার চুর-হয়ে যাওয়া মটোর বাইকখানা। সবচেয়ে বিস্ময়কর সংবাদ শর্মার ছিল ছদ্মবেশ! মুখে ছিল একখানা মুখোশ—সান্টাক্লসের। মৃতদেহ সনাক্ত করতে অসুবিধা হয়নি, ওর পকেটে ছিল মানিব্যাগ···তার গর্ভে ওর নাম-লেখা কার্ড। সংবাদ পেয়ে ডঃ ত্রিবেদী মৃতদেহ চূড়ান্তভাবে সনাক্ত করে এসেছেন মর্গে গিয়ে। এখন থানার বড়বাবু এসেছেন ওঁদের জবানবন্দি নিতে।

অলকের মনে হল—কোথায় নিশ্চয় কিছু ভুল হচ্ছে। শর্মা কী জন্যে মুখে ছদ্মবেশ এঁটে এভাবে আত্মহত্যা করবে মটোর বাইক সমেত? এ হতেই পারে না। ডঃ ত্রিবেদী নিশ্চয়ই ওকে চিনতে পারেননি—ঘটনাচক্রে আর কারও পকেটে ঢুকেছে শর্মার পার্স। লোকটা পকেটমার নয় তো। কিন্তু শর্মা তাহলে কোথায়? থানার বড়বাবু বলছিলেন, আপনি বলছেন এটা আত্মহত্যা নয়, দুর্ঘটনা? কিন্তু অত সকালেও ওখানে লোক ছিল। প্রত্যক্ষদর্শী বলছে ডঃ শর্মা সোজা এসে বেড়ায় ধাক্কা মারলেন—বেড়া ভেঙে ছিটকে নিচে পড়লেন! অত বড় গার্ড-রেল তাঁর নজরে পড়ল না? উনি কি খুব বেশি ড্রিংক করতেন?

—এমন কিছু নয়। মাতাল তাকে কখনও হতে দেখিনি···বললেন ডঃ ত্রিবেদী।

—মাতাল নয়, পাগল নয়, তাহলে ওভাবে ড্রাইভ করলেন কেন?

—অ্যাকসিডেন্ট ইস অ্যাকসিডেন্ট। কোন কারণে সে গার্ড-রেলটা দেখতে পায়নি। সকালে কুয়াশা ছিল, হয়তো ওর মুখোশটা দৃষ্টিকে আবৃত করেছিল—

—কিন্তু ঐ অদ্ভুত মুখোসটা কেন পরেছিলেন উনি?

boiRboi.net

—ওটা সান্টাক্লসের—এবার আলোচনায় যোগ দিল মিস মেহ্‌তা। ডঃ ত্রিবেদীকে বললে, লেট মি এক্সপ্লেন। প্লীজ!

মিস মেহ্‌তা কিছুটা আলোকপাত করতে পারল এ বিষয়ে। পূর্বদিন সান্টাক্লসের একটা মুখোশ হাতে শর্মাকে সে হোটেলে ফিরে আসতে দেখেছিল। প্রশ্ন করে সে জানতে পারে শর্মার সঙ্গে এখানকার একটি স্থানীয় ছেলের আলাপ হয়েছে। বাচ্চা ছেলে—সাত-আট বছর বয়স। শর্মার ইচ্ছা, সান্টাক্লস সেজে সে ওর বাড়িতে রাত্রিবেলা হানা দেবে। বেল বাজিয়ে ডেকে ওর বাবা অথবা মাকে অনুরোধ করবে বাচ্চাকে তুলে দিতে। ঘুম ঘুম চোখে স্বয়ং সান্টাক্লসের হাত থেকে উপহারটা ছেলেটি কী-ভাবে নেয়, তাই দেখবে শর্মা। নিতান্তই একটা ছেলে-মানুষী। ছেলেটি কে তা অবশ্য জানে না মিস মেহ্‌তা।

মিস্টার কানোরিয়া বলেন, দ্যাটস্ ইর্‌রেলিভ্যান্ট! মোট কথা, বোঝা যাচ্ছে যে শর্মা কাল নিতান্তই একটা ছেলেমানুষি করতে বেরিয়েছিল। তারপর ভোর বেলা সে ঐ পাগলা-ঝোরার দিকে যায় এবং দুর্ভাগ্যবশত একটা অ্যাকসিডেন্ট···

অলক উঠে দাঁড়ায়। তার ভীষণ খারাপ লাগছে সব কিছু। একটু নিরিবিলিতে গিয়ে ঠাণ্ডা মাথায় সে সমস্ত ব্যাপারটা ভেবে দেখতে চায়। অলকের স্থানত্যাগ করায় কেউ বিচলিত হলেন না। অলক পায়ে-পায়ে উঠে আসে নিজের ঘরে। কোটটা খোলে, জুতোটা খুলে খাটের উপর শুয়ে পড়তে গিয়ে দেখে ওর খাটের পড়ে আছে একটা মুখবন্ধ খাম। উপরে অলকের নাম লেখা। হস্তাক্ষরটা পরিচিত কিন্তু ঠিক মনে পড়ছে না কার। অলক একটু অবাক হল। বন্ধ-ঘরে এভাবে কে চিঠি রেখে গেল ওর খাটে। তৎক্ষণাৎ হস্তাক্ষরটা চিনতে পারল সে। দ্বৈতশয্যার কক্ষ। পাশের খাটটা শর্মার। তার কাছে ছিল ডুপ্লিকেট চাবি। অলক সারারাত হোটেলে ফেরেনি—শর্মা নিশ্চয় ফিরেছিল। তখনই এই চিঠিখানা সে রেখে গেছে। দ্রুতহাতে সে খামটা খুলে ফেলে। পড়তে থাকে। প্রথমে ধীরে ধীরে, তারপর অত্যন্ত দ্রুতগতিতে:

"অলক,

আমি এইমাত্র একটা মর্মান্তিক কাণ্ড করে বসেছি। আমি একটি মহিলাকে খুন করে ফেলেছি। সেই পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে যাবার আগে তোমাকে জানিয়ে যাচ্ছি। যে মহিলাকে খুন করেছি তাঁর ইন্টারভিয়ু আমি নিয়েছিলাম—তাঁর নম্বরটা মনে নেই, নাম শীলা কাপুর; যশোবন্ত কাপুরের স্ত্রী। কেন খুন করলাম—সে সমস্ত ইতিহাস; কিন্তু বিশ্বাস কর আমি খুন করতে চাইনি···অন্তত মুন্নাকে মাতৃহীন করার কল্পনা আমার সুদূর কল্পনাতেও ছিল

boiRboi.net

না। তবু আমি আমার নিজের হাতে—হ্যাঁ, নিজের হাতে, গলা টিপে তাঁকে মেরে ফেলেছি! আমার একমাত্র কৈফিয়ৎ—আমার মনে হয়েছিল তিনি মুন্নার মা নন, আমার মা! ও তুমিই বুঝবে না, তা আদালতকে কেমন করে বোঝাবো? ···আমি মোটর বাইকটা নিয়ে এখনই রওনা দিচ্ছি। পাগলা-ঝোরায় 'স্যুইসাইড-স্পট' বলে একটা জায়গা আছে। সেখানেই যাচ্ছি আমি। মটোর বাইকটা নষ্ট হবে—কিন্তু ওটাই বোধহয় সবচেয়ে সুবিধাজনক। আমার ত্রিশ-হাজার টাকা জীবনবীমা করা আছে। ওল্ড-এজ-পেনসন স্কীম। ওল্ড-এজ পর্যন্ত তো যেতেই পারলাম না—বুড়ো ভামটাকে বলো সেই টাকা থেকে মটোর বাইকের দামটা মিটিয়ে দিতে। ঐ বুড়ো ভামটাকে আমি কোনোদিনই শ্রদ্ধা করতে পারিনি। ওর এই বৈজ্ঞানিক সমীক্ষা বোধহয় আমার এই কাণ্ডে প্রচণ্ড আঘাত পাবে। তাতে আমার ভারি বয়েই গেল। মুন্না আর মুন্নার বাবা যদি রাজী হয় তবে আমার ইন্সিওরেন্সের বাকি টাকা তাঁদের প্রাপ্য। আমার এই মৃত্যুকালীন স্বীকারোক্তি বলে। ওঁরা না নিলে সে টাকায় যা ইচ্ছে কর। তোমরা মদ খেয়ে উড়িয়ে দিতেও পার! আমার ডায়েরিটা তোমাকে দিয়ে গেলাম—আর হাতঘড়িটা। শর্মা।"

অলকের বালিশের নিচে রয়েছে একখণ্ড ডায়েরি আর শর্মার হাতঘড়িটা।

অলক একটা সিগারেট ধরালো, দু-তিন টান দিয়েই সেটা সে ফেলে দিল অ্যাশট্রেতে। চিঠিখানা হাতে নিয়ে নেমে এল নিচে। জরুরী আলোচনা-চক্র বোধহয় একটু আগেই ভেঙেছে। সবাই উঠে দাঁড়িয়েছেন। কানোরিয়া অনুপস্থিত—বোধ করি তিনি কিছু আগেই উঠে চলে গেছেন নিজের ঘরে। মৃগেন না মৃণাল নামে সেই দারোগা ভদ্রলোক সিঁড়ির মুখে দাঁড়িয়ে কথা বলছিলেন ডঃ ত্রিবেদীর সঙ্গে, অগত্যা তাই মেনে নিতে হবে। নিতান্ত দুর্ঘটনা! কানোরিয়া-সাহেবের অনুরোধটা বোধহয় রাখা যাবে। পাগল নয়, মাতাল নয়,—জাস্ট অ্যান অ্যাকসিডেন্ট!

—ধন্যবাদ! বুঝতেই তো পারছেন, নাহলে এতবড় একটা বৈজ্ঞানিক পরিকল্পনা—

—আর বলতে হবে না। ধন্যবাদ আপনারই প্রাপ্য। আপনি খুবই সহায়তা করেছেন আমাদের তদন্তের।

—আমি শর্মার ঋণ শোধ করেছি মাত্র। আমার বুকের একখানা পাঁজর খসে গেল দারোগা-সাহেব।

—আমি দুঃখিত।

boiRboi.net

বিদায় নিয়ে দারোগা ভদ্রলোক গাড়ির দিকে এগিয়ে গেলেন। ম্যানেজার ছুটে গেল তাঁর কাছে। সিগ্রেট অফার করল। নিম্নস্বরে কী যেন কথা হতে থাকে দুজনে। জীপের পা-দানিতে পা-রেখে সিগ্রেট টানতে টানতে দারোগা ওর বক্তব্য শুনতে থাকেন।

ডঃ ত্রিবেদী এদিকে ফিরতেই অলক বললে, স্যার···

—ও অলক! একটা ঝড় বয়ে গেল যেন! শর্মার এই মর্মান্তিক দুর্ঘটনায়—

—এটা দুর্ঘটনা নয়, শর্মা আত্মহত্যা করেছে!

—পাগল! কে বলেছে তোমাকে!

—শর্মা নিজে!

—মানে?—চমকে ওঠেন ডঃ ত্রিবেদী।

অলক নিঃশব্দে শর্মার চিঠিখানা বাড়িয়ে ধরে। ত্রিবেদীর ভ্রূকুঞ্চিত হয়। একবার অলকের দিকে, একবার কাগজখানার দিকে তাকিয়ে দেখেন। শেষে ওর হাত থেকে চিঠিখানা ছোঁ মেরে নিয়ে দ্রুতগতি চোখ বুলিয়ে যান। অলক চুপ করে অপেক্ষা করে। আদ্যোপান্ত পড়ে ত্রিবেদী মুখ তোলেন—'বুড়োভাম'টা কে জানতে চান না, বলেন—আমি বিশ্বাস করি না!

—শর্মা স্বহস্তে লিখেছে—তাছাড়া আমি জানি শীলা কাপুর নামে একটি মহিলা গতকাল রাত্রে খুন হয়েছেন। বিশ্বাস না হয়, ঐ দারোগাবাবুকে জিজ্ঞাসা করুন। করুন। উনি এখনও চলে যাননি।

ত্রিবেদী দৃঢ়মুষ্টিতে অলকের বাহুমূল চেপে ধরেন, না! এ চিঠির কথা কাউকে জানানো হবে না!

অলক স্তম্ভিত হয়ে যায়। বলে, কী বলছেন আপনি? শীলা কাপুরের স্বামীকে খুনের অপরাধে পুলিসে গ্রেপ্তার করেছে! যদি আসল খুনীর পরিচয়···

—কে আসল খুনী? শর্মা? নাও তো হতে পারে! অনেক সময় মনস্তত্ত্বের রুগী অমন কল্পনা করে। হয়তো শর্মা কোন সূত্রে শুনেছে যে মহিলাটি খুন হয়েছেন। শর্মা কাল রীতিমত পাগলামি করেছে—সান্টাক্লস সেজে···এমনও তো হতে পারে যে সে···

—ডক্টর ত্রিবেদী! শর্মা পাগলামি করুক আর না করুক, আপনি করছেন, এখন—এই মুহূর্তে। শীলা কাপুরের খুনের এতবড় এভিডেন্সটা আপনি চেপে যেতে পারেন না।

হাত বাড়িয়ে সে কাগজখানা ফেরত নেয়।

—ওটা নিয়ে তুমি কী করতে চাও?

boiRboi.net

—ঐ দারোগাবাবুকে দিতে চাই!

—না! অলক কথা শোন! তুমি প্রচণ্ড ভুল করছ। চিঠিখানা আমাকে দাও। আমি আগে মিস্টার কানোরিয়াকে···

—মিস্টার কানোরিয়ার কোন ভূমিকা এর ভিতর নেই। শর্মা চিঠিখানা আমাকে লিখেছেন। আমি এটা নিয়ে যা ইচ্ছে তাই করব।

অলক সিঁড়ি দিয়ে নামতে শুরু করে। ত্রিবেদী পিছন থেকে ওকে বারে বারে ডাকেন, অলক! শোন! আগে শুনে যাও···

অলক তার আগেই মনস্থির করেছে। ডঃ ত্রিবেদী এবং তাঁর পরিকল্পনার প্রতি আর কোন শ্রদ্ধা নেই তার। দৃঢ় পদক্ষেপে সে এগিয়ে যায় জীপের দিকে। দারোগা ভদ্রলোক ঘুরে দাঁড়ান। অলক বললে, এই মাত্র আমার ঘরে আমি শর্মার একখানা শেষ স্বীকারোক্তি পেয়েছি। এতে মিসেস কাপুরের খুনের রহস্য উন্মোচন হবে বলে আমি বিশ্বাস করি। নিন ধরুন।

দারোগা ভদ্রলোক অবাক হলেন। হাত বাড়িয়ে কাগজখানা গ্রহণ করলেন তিনি।

সারাটা দিন অলক পড়ে রইল অর্গলবদ্ধ ঘরে। পাশের খাটটা খালি; আয়াঙ্গার হোটেলে ফেরেনি। ডঃ ত্রিবেদী বা মিস মেহ্‌তা ওর খোঁজ নিতে এল না। করবী অথবা আয়াঙ্গার ওকে সারা দিনে একটা ফোনও তো করতে পারত? তাও আসেনি। এমনকি দুপুরে লাঞ্চ খেতেও নামেনি অলক। কিছু স্যাণ্ডুইচ আর কফি আনিয়ে নিয়েছিল ঘরে। সমস্তটা দিন সে ডুবে রইল শর্মার দিনপঞ্জিকায়। ডায়েরি অবশ্য ঠিক নয়, পরিণত বয়সে কোন একদিন শর্মা তার জীবনটা খতিয়ে দেখতে চেয়েছে—স্মৃতিচারণ বলা যায়। কবে লিখতে শুরু করেছে তার তারিখ নেই, মনে হয় এই চাকরিতে প্রবেশ করার পরে। কারণ কেস-হিস্ট্রির উল্লেখ রয়েছে বারে বারে। পড়তে পড়তে অলকের চোখের সামনে থেকে যেন একটা

boiRboi.net

পর্দা সরে গেল। শর্মাকে সিনিক, খাপছাড়া অদ্ভুত প্রকৃতির মনে হত—স্ত্রীজাতির প্রতিই তার একটা তীব্র বিরূপতা,—অনীহা নয়, সর্বদাই কেমন যেন একটা আক্রমণাত্মক ভঙ্গি! এতদিনে তার একটা কারণ খুঁজে পাওয়া গেল—কেন ওর জীবন এমন ঊষর, নারী-সংস্পর্শ বঞ্চিত, কেন সে বিয়ে করেনি, কেন 'কুত্তি' শব্দটা ব্যবহার করতে ওর মুখ-চোখের ভাব বদলে যায়। বেচারি শর্মা।

বেচারি? মোটেই নয়, বরং বলব—বোকা! সে ছিল ডাক্তার, সে কেন বুঝল না এটা একটা রোগ—মানসিক রোগ। সে একটা অবসেশনে ভুগছে, একটা অবদমনে। রোগমাত্রেরই চিকিৎসা আছে—অন্ততঃ চিকিৎসার প্রচেষ্টা আছে। ব্লাড-ক্যান্সার হলেও লোকে ডাক্তারের কাছে ছোটে—বাঁচবার আশায়। আর শর্মা নিজে ডাক্তার হয়ে একবার চেষ্টা করল না নিজের চিকিৎসার? কোন মানসিক-ভিষকের দ্বারস্থ হল না? সাইকো-অ্যানালিস্ট তো এদেশেও আছে। না! সে দুরন্ত অভিমানে হাত-পা গুটিয়ে সিনিক সেজে বসে রইল। সে কেন এই চাকরি নিয়েছিল? কী খুঁজছিল সে? অঙ্ক ওর ডায়েরি খুঁটিয়ে পড়েছে। আটশ'-বত্রিশটি কেস-হিস্ট্রির উল্লেখ আছে তার খাতায়। একটি বছরে সে প্রায় সাড়ে আটশ বিবাহিতা মহিলার ইন্টারভিয়ু নিয়েছে ডঃ ত্রিবেদীর পিছন পিছন সারা ভারত ঘুরে। তার ভিতর মাত্র সতেরটি কেস-এর কথা শর্মা বিস্তারিত আলোচনা করেছে। এই সতেরটি বিবাহিতা মহিলা ভারতের বিভিন্ন প্রত্যন্ত দেশে বাস করেন। কেউ বাঙালী, কেউ হিন্দুস্থানী, কেউ মারাঠী, কেউ পাঞ্জাবী—তাঁদের বয়স আলাদা, জীবনযাত্রার মান বিভিন্ন, শিক্ষা-দীক্ষা সমাজ-ব্যবস্থায় আশমান-জমিন ফারাক। শুধু একটিমাত্র কমন ফ্যাক্টার! স্বামী-পুত্র বর্তমানে তাঁরা অন্য পুরুষের ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে এসেছেন বলে স্বীকার করেছেন। বেছে বেছে শুধু তাঁদের ইতিকথাই ও লিপিবদ্ধ করেছে। প্রতিবারেই ও জানতে চেয়েছে: কেন?—জবাব পায়নি। জবাব পেয়েছে কোন কোন ক্ষেত্রে, ও সন্তুষ্ট হতে পারেনি। ক্ষ্যাপা যেমন পরশ-পাথর খুঁজে ফিরেছিল সমুদ্রবেলায়, ও তেমনি খুঁজে বেরিয়েছে—গরল। পায়নি।

পেল—লালগড়ে এসে। প্রশ্নের জবাব পেল না, পেল অন্তরালবর্তিনীর পরিচয়। ও ছুটে গিয়েছিল সেই মেয়েটির কাছে—জানতে, কেন এমনটা হয়, কেন তার নিজের জীবনটা এমনভাবে ব্যর্থ হয়ে গেল। মেয়েটি ওর সেই প্রশ্নের জবাব দিল না; নিষ্ঠুর আঘাতে চূর্ণ করে দিতে চাইল ওর কৌতূহল। ক্ষণিক উন্মাদনায় মনের ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেছিল শর্মা। প্রাণ দিয়ে সেই পাপের প্রায়শ্চিত্ত করে গেছে সে।

boiRboi.net

রাত নটা নাগাদ শেষ হল শর্মার স্মৃতিচারণ। অলক খাতাখানা রেখে উঠে বসল খাটে। টেনে নিল টেলিফোনটা। পর পর দুটি ফোন করল। করবীর ফোন বেজেই গেল। করবী ধরল না। বোধ করি সে বাড়ি নেই। দ্বিতীয় ফোনটায় অবশ্য সাড়া পাওয়া গেল। ধরল কেটি। বললে, মায়ের জ্ঞান ফিরেছে। মা ভাল আছে। আয়াঙ্গারকে ডেকে দিল। আয়াঙ্গার ওকে জানালো—নোয়ামি ভাল আছে। আয়াঙ্গার মনস্থির করেছে! ডঃ ত্রিবেদীর চাকরিতে ইস্তফা দেবে! লালগড় হাসপাতালে চাকরি পায় তো ভালই, না হলে সে এখানে প্রাইভেট প্র্যাকটিস করবে।

অলক বলে, শর্মার খবর শুনেছ?

—হ্যাঁ। পুয়োর শর্মা! মাত্রাতিরিক্ত মদ্যপান করেছিল নিশ্চয়। নাহলে এমন অ্যাকসিডেন্ট···

—অ্যাকসিডেন্ট? কে বলেছে তোমাকে?

—সবাই!

—তুমি কখন হোটেলে ফিরবে? অনেক কথা বলার আছে।

—কাল সকালে আসছি।

শুভ-বড়দিনের শুভেচ্ছা জানাতে ভুলে গিয়ে লাইন কেটে দিল অলক।

পরদিন ওর ঘুম ভাঙলো বেলা করে। মুখ-হাত ধুয়ে নিচের খানা-কামরায় নেমে এল প্রাতরাশে। খাবার অর্ডার দিয়ে টেনে নিল সংবাদপত্রটা। শর্মার আত্মহত্যার খবরটা নিশ্চয় বেরিয়েছে। হ্যাঁ—ঐ তো তিন নম্বর পাতার নিচে প্রকাশিত হয়েছে দুঃসংবাদটা। কিন্তু—একী?

সংবাদটা আদ্যোপান্ত পাঠ করে অলকের মনে পড়ল লুই ক্যারল ব্যবহৃত সেই বিচিত্র ইংরাজি শব্দটা—যা অভিধানে খুঁজে পাওয়া যাবে না—কিউরিয়সার অ্যাণ্ড কিউরিয়সার।

"লালগড়ে সান্টাক্লসের মর্মান্তিক মৃত্যু!

২৫শে ডিসেম্বর। আজ ভোর রাত্রে লালগড় কলোনীর অনতিদূরে পাগলা-ঝোরায় এক মর্মান্তিক দুর্ঘটনায় ডঃ টি এন. শর্মা মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছেন। ডঃ শর্মা একজন বিশিষ্ট চিকিৎসক; তিনি প্রখ্যাত যৌনতত্ত্ববিদ ডঃ ত্রিবেদীর সঙ্গে 'পরিবার পরিকল্পনা' সমীক্ষায় নিযুক্ত ছিলেন। ডঃ ত্রিবেদী-লিখিত বহু-প্রশংসিত গ্রন্থ 'লালত্রিকোণের এক কোণ—পুরুষ' গ্রন্থের সংখ্যাতত্ত্ব সংগ্রহে ডঃ শর্মার দান অনস্বীকার্য। সংবাদে প্রকাশ, ডঃ শর্মা পূর্বদিন রাত্রে সান্টাক্লসের ছদ্মবেশে স্থানীয় কয়েকটি বালক-বালিকাকে আনন্দ দিয়েছিলেন।

ঐ সান্টাক্লসের মুখোশ পরেই তিনি মটর সাইকেলযোগে পাগলা-ঝোরার দিকেই যাচ্ছিলেন এবং মুখোশে দৃষ্টিপথ ঢাকা পড়ায় গভীর খাদের ভিতর পড়ে যান। আজ সকালে সান্টাক্লসের বেশে ডঃ শর্মাকে খাদের নিচে আবিষ্কার করা হয়েছে।

"ডঃ শর্মা অবিবাহিত। বয়স পঁয়ত্রিশ! বিজ্ঞানী হিসাবে তিনি সুপ্রতিষ্ঠিত। তাঁর এই আকস্মিক মৃত্যুতে ডঃ ত্রিবেদীর বৈজ্ঞানিক সমীক্ষা একটা প্রচণ্ড আঘাত পেল।"

বাঃ! চমৎকার! শর্মা আত্মহত্যা করেনি, দুর্ঘটনায় মারা গেছে। শীলা কাপুরের প্রসঙ্গই ওঠেনি। আর শর্মার মৃত্যু-সংবাদ জানাবার সময় ডঃ ত্রিবেদীর এবং তাঁর সমীক্ষার প্রসঙ্গ একাধিকবার এসে গেছে। অত্যন্ত দ্রুতগতি অলক কাগজটা উল্টে-পাল্টে দেখল—হ্যাঁ, ঐ তো শীলা কাপুরের মৃত্যুসংবাদও ছাপা হয়েছে পাঁচ নম্বর পাতায়, যশোবন্ত কাপুরের স্ত্রী শীলা কাপুরকে কে বা কারা গতকাল রাত্রে খুন করে গেছে। ঘটনার সময় শ্রীযুক্তা কাপুর বাড়িতে একা ছিলেন। এই নৃশংস হত্যাকাণ্ডের উদ্দেশ্য এখনও কিছু বোঝা যায়নি—যেহেতু শ্রীকাপুরের গৃহের কোন মূল্যবান বস্তুই খোয়া যায়নি, শ্রীযুক্ত কাপুরকে তদন্ত-সাপেক্ষে পুলিসের হেপাজতে রাখা হয়েছে।

চমৎকার! লালগড় উপনিবেশ দুটি মৃত্যুর ঘটনা। বিচ্ছিন্ন, নিঃসম্পর্কিত। একটি তিন নম্বর পৃষ্ঠায় একটি পাঁচ নম্বরে। অতবড় শহরে এমন বিচ্ছিন্ন ঘটনা তো ঘটতেই পারে। গতকাল তাই ঘটেছে। আগামীকালও ঘটতে পারে। দুটি ঘটনার মধ্যে যোগসূত্র কিছুই নেই। কার্য-কারণ সম্পর্কের প্রশ্নই ওঠে না। শীলা কাপুর? অজ্ঞাত আততায়ীর দ্বারা হত—স্বামীকে সন্দেহ করা হচ্ছে। ডঃ শর্মা? দুর্ঘটনায় নিহত। ডঃ ত্রিবেদী? উত্তরোত্তর তাঁর শ্রীবৃদ্ধি ঘটুক। আর ডঃ শর্মার সেই মৃত্যুকালীন স্বীকৃতিপত্র? সেটা আবার কী? কই, সে কথা তো কিছু শুনিনি!

খবরের কাগজখানা হাতে নিয়েই অলক চলে এল ডঃ ত্রিবেদীর ঘরে। তিনিও প্রভাতী সংবাদপত্রে আত্মমগ্ন ছিলেন। অলককে দেখতে পেয়েই বললেন, এস অলক, সুপ্রভাত! তোমাকেই খুঁজছিলাম মনে মনে। কাল শর্মার মৃত্যুতে তোমাকে এতটা বিচলিত হতে দেখলাম যে, সারাদিন আর খোঁজ করিনি। টাইম ইজ দ্য গ্রেটেস্ট হীলার! আঘাত কি আমিই কম পেয়েছি অলক? মনে হচ্ছে আমার বুকের একখানা পাঁজর খালি হয়ে গেল। বস।

অলক বসল সামনের চেয়ারে। সটান নেমে এল সে আসল প্রসঙ্গে। খবরের কাগজখানা বাড়িয়ে ধরে বললে, এটা কেমন করে হল?

ডঃ ত্রিবেদী অবাক হবার ভান করলেন না। মুহূর্তে বুঝে নিলেন অলকের বক্তব্য। বোধ করি এটা আশঙ্কা করে মনে মনে এতক্ষণ প্রস্তুত হচ্ছিলেন তিনি। বললেন, বলছি। সব কথাই গুছিয়ে বলতে হবে। কিন্তু ফার্স্ট থিং ফার্স্ট। কাল একটা ব্লুন্ডার হয়ে গেছে। মিস্টার কনোরিয়ার সঙ্গে তোমাকে ইন্ট্রোডিউস করে দেওয়া হয়নি। উনি তোমাকে খুঁজছেন, কালকেই খোঁজ করেছিলেন, কিন্তু আমি বললাম, বন্ধুর এই আকস্মিক দুর্ঘটনায়—

—দুর্ঘটনা? আপনিও তাই বলবেন। আমাকে? এই জনান্তিক আলাপে—

—না হয় মৃত্যুতেই। কিন্তু কথা হচ্ছে মিস্টার কানোরিয়া তোমাকে কেন খুঁজছেন জানো?

—না। কেন?

—ফরেন-মানি পাওয়ার সম্ভাবনাটা এখন নিশ্চিত। আমাদের বর্তমান সমীক্ষা আমরা এখানেই শেষ করছি। এবার আসল কাজে নামতে হবে। ডঃ কিনযে, ডঃ মেরী স্টোপ্‌স্ আমেরিকায় যা করেছেন—

বাধা দিয়ে অলক বললে, সেটা তো পরের কথা ডঃ ত্রিবেদী। তার আগে এই শর্মার আত্মহত্যার ব্যাপারটা—

অলককেও মাঝপথে থামিয়ে দেন ত্রিবেদী। আচ্ছা সে কথাই হ'ক। তুমি হয়তো জান না—আমাদের টীমে একাধিক ভেকেন্সি ঘটেছে। শর্মা তো গেছেই, আয়াঙ্গারও চাকরিতেই ইস্তফা দিতে চায়। ফলে আমরা এখানেই বর্তমান সমীক্ষাটা গুটিয়ে নিচ্ছি। এখন এটা কম্পাইল করার দায়িত্ব সম্পূর্ণ তোমার। আমি নূতন পরিকল্পনাটা নিয়ে লাগব এখন—অবশ্য তোমাকে সব সময়েই টেকনিকাল হেল্‌প্ দিয়ে যাব। আফটার অল, এ প্রজেক্ট রিপোর্টের আমরা হলাম দুজন জয়েন্ট অথার। এইজন্যই মিস্টার কানোরিয়া তোমাকে খুঁজছেন। উনি তোমার সঙ্গে নূতন কন্ট্রাক্ট করতে চান। বেশি কাজ করাতে হলে বেশি অর্থ বিনিয়োগ করতে হবে বইকি—

—অর্থাৎ বর্তমানে আমি যা মাইনে পাই, তার ডবল্ আমাকে এবার থেকে দেওয়া হবে। এই কথা তো?

—ডবল্? ডবল্ কেন? না, টাকার অঙ্কটা কিছু শুনিনি—

—ডঃ অবনী মজুমদারকে ঐ জাতীয় ঘুষ দেবার প্রস্তাব উঠেছিল কিনা, তাই—

ত্রিবেদী সোজা হয়ে বসলেন। বললেন, অলক, জীবনে এমন সুযোগ দুবার আসে না। হাতের লক্ষ্মী যদি তুমি পায়ে ঠেল—

BanglaBook.net

আবার বাধা দিয়ে অলক বলে, ফার্স্ট থিং কিন্তু ফার্স্ট হচ্ছে না ডঃ ত্রিবেদী। আমি কালকে পুলিসের হাতে শর্মার স্বীকারোক্তিটা দেওয়া সত্ত্বেও খবরের কাগজে এমন একটা খবর কেমন করে ছাপা হল, এটাই আমাদের অ্যাজেণ্ডা অনুযায়ী প্রথম বিবেচ্য বিষয়। এমন ভোজবাজিটা সম্ভব হল কোন্ মন্ত্রে?

—মন্ত্র? হ্যাঁ, শাস্ত্রীয় মন্ত্রও একটা আছে: মা ব্রুয়াৎ সত্যমপ্রিয়ম!—ভেবে দেখ অলক, কী লাভ হত সত্যটা প্রকাশ হলে? শর্মা বেঁচে ফিরে আসত না—তার আত্মীয়-বন্ধু দুনিয়ায় যেখানে যে আছে তাদের জানাবার কী প্রয়োজন যে শর্মা একটা খুন করে আত্মহত্যা করেছে? দ্বিতীয়ত শীলা কাপুর? সে যে ব্যভিচারিণী ছিল এটা খবরের কাগজে ছাপায় কোন্ চতুর্বর্গ লাভ হত? যশোবন্ত এবং মুন্না তাতে সান্ত্বনা পেত?

—কী আশ্চর্য! আপনি ভুলে যাচ্ছেন—যশোবন্ত কাপুর খুনী-মামলার আসামী! সে পুলিস-হাজতে পচছে!

—ধীরে অলক, ধীরে! আমি লোকটা অতটা বর্বর নই। যশোবন্ত বর্তমানে তার বাড়িতে। তার মুক্তির ব্যবস্থা স্বয়ং কানোরিয়া সাহেব সর্বাগ্রে করেছেন! পুলিস এ নিয়ে কেস চালাবে না। যেহেতু পুলিস জানে—খুনী কে; এবং জানে খুনী অ্যাকসিডেন্টে মারা গেছে।

—আবার 'অ্যাকসিডেন্ট'!

—হ্যাঁ! দুর্ঘটনায়। সেটাই মেনে নিতে হবে। না হলে আমাদের এই বৈজ্ঞানিক সমীক্ষাটা কোথায় দাঁড়াবে, তা ভেবে দেখেছ? শর্মা শীলা কাপুরের নাম-ধাম-পরিচয় কেমন করে পেল এ প্রশ্ন উঠবে না? আমার এত কায়দা, এত গোপনীয়তা সবই যে হাওয়া হয়ে উবে যাবে। শুধু শর্মা কেন—আয়াঙ্গার কেমন করে ঐ মেয়েটির সন্ধান পেল? ঐ মিসেস নোয়ামি স্মিথ? সেটা এখনও জানি না আমি! আয়াঙ্গারের কৈফিয়ৎ আমি তলব করব।

—সেটা অহেতুক। আয়াঙ্গারকে সন্ধান দিয়েছি আমি। আমিই মিসেস স্মিথের ইণ্টারভিয়ু নিয়েছি, আমিই তাঁকে খুঁজে বার করেছি—

—বাট হোয়াই? কেন? কোন্ অধিকারে?

অলক একটি সিগারেট ধরালো। বললে, ডঃ ত্রিবেদী, আপনি আয়াঙ্গার আর নোয়ামির সব কথা শুনেছেন?

—মোটামুটি। আয়াঙ্গার টেলিফোনে আমাকে জানিয়েছে—

—তবু আপনি খুশি নন?

—খুশি অ-খুশির প্রশ্ন উঠছে না। এটা কোনও হারানো-প্রাপ্তি-নিরুদ্দেশের

boiRboi.net

অফিস নয়। তোমরা কোন্ অধিকারে ইন্টারভিয়ুড মহিলাদের পরিচয় জানবার চেষ্টা করলে তাই আগে আমাকে বোঝাও। ফার্স্ট থিং ফার্স্ট!

—বোঝাবার চেষ্টা করছি। কিন্তু বুঝতে আপনি আদৌ পারবেন কিনা আমার সন্দেহ আছে। শুনুন। শুধু শর্মা আর আয়াঙ্গার নয়—স্থূল কথাটা আগেই সেরে রাখি, আমিও একটি মহিলার সঙ্গে আলাপ করেছি—যে মহিলার ইন্টারভিয়ু আমি নিয়েছিলাম। আমরা তিনজনেই আপনার মতে ব্রাত্য—আমার মতে আমরা কেউই ভুল করিনি। আপনার ঐ দু-হাজার মহিলার যৌন-জীবনের স্বীকৃতির চেয়ে অনেক-অনেক বড় কথা ঐ নোয়ামির মুখে হাসি ফুটিয়ে তোলার চেষ্টাটা। নরনারীর সম্পর্কের যৌন পর্যায়টাকে আমি ছোট করে দেখতে বলছি না—কিন্তু সেটাই শেষ কথা নয়। সৃষ্টির মূলে ঐ জান্তব ক্রিয়াকলাপের প্রয়োজনও যেমন অনস্বীকার্য, তেমনি একই রকম গুরুত্বপূর্ণ আর একটা বিষয় আছে—তাকে বলে প্রেম, বলে ভালবাসা। সেখানে যৌন-সম্পর্ক যে নেই তা বলব না, কিন্তু সেটাই তার শেষ কথা নয়—

—তুমি আবোল-তাবোল বকছ অলক।

—আমি তো আগেই বলেছি ডক্টর ত্রিবেদী—আপনি আমার কথা বুঝতে পারবেন না। রোমিও আর জুলিয়েট, দেবদাস আর পার্বতী—এদের ভালবাসা আপনার ঐ মাপকাঠি দিয়ে মাপা হয়নি—

—কে বলেছে? দৈহিক আকর্ষণ যদি না থাকত তবে ওরা পরস্পরের দিকে ওভাবে ছুটে আসত না! 'প্লাটোনিক লাভ' শব্দটা অভিধানের বাইরে নেই। স্বামী যে রোজগারের টাকাটা স্ত্রীর হাতে তুলে দেয়, স্ত্রী যে বাড়া-ভাত নিয়ে স্বামীর প্রতীক্ষায় প্রহর গোণে—তার মূলে ঐ জৈবিক প্রেরণা। সব নদীর মতই সব প্রেম শেষ হয় সঙ্গমে।

—আপনি 'সিডনে কার্টন' নামে একটি লোকের কথা শুনেছেন ডঃ ত্রিবেদী? যার বুলি ছিল, 'আই কেয়ার ফর নোবডি অ্যাণ্ড নোবডি কেয়ার্স ফর মি!' লোকটা প্রেমের জন্যই গিলোটিনে মাথা বাড়িয়ে দিয়েছিল বলতে চান—তার মূলেও ঐ যৌনক্ষুধার তাড়না?

—আমি কথা-সাহিত্যের কথা বলছি না অলক—বাস্তবের কথা বলছি।

—অল রাইট! ঐ যে নোয়ামি নামে মেয়েটি···আজ ষোলো বছর ধরে সে বিয়ে করেনি কেন? যৌনক্ষুধার নিরসন কি সে করতে পারত না হাত বাড়ালেই?

—তুমি আসল বিষয়বস্তু থেকে সরে যাচ্ছ অলক। মূল প্রশ্নটা ছিল—কোন্ অধিকারে তোমরা প্রতিশ্রুতি ভাঙলে?

boiRboi.net

—আমি তো তাই বোঝাতে চাইছি ডক্টর ত্রিবেদী। কেন দিয়েছিলাম প্রতিশ্রুতি? না হলে আপনার সমীক্ষার রথচক্র অচল হয়ে যেত! তাই নয়? আরও কারণ আছে। উত্তরদানকারিণীরা সমাজে যাতে বিড়ম্বিত না হন, তাই এ ব্যবস্থা। অর্থাৎ মূল লক্ষ্যটা ছিল—'মঙ্গল'। 'সুন্দর'কে অস্বীকার করে 'সত্য'কে খুঁজছিলেন আপনারা 'শিব'-এর সন্ধানে! 'মঙ্গল'ই আপনাদের মূল লক্ষ্য।

—শীলা কাপুরের খুব মঙ্গল করেছ তোমরা!

—ওটা দুর্ঘটনা। আপনিও জানেন, আমরাও জানি। কথা সেটা নয়, কথা হচ্ছে আমরা সজ্ঞানে প্রতিশ্রুতি ভেঙেছি। তার মূল্য তো আমরা কড়ায়-গণ্ডায় মিটিয়ে দিচ্ছি ডঃ ত্রিবেদী। শর্মা তার দাম মিটিয়েছে প্রাণ দিয়ে, আয়াঙ্গার চাকরিতে ইস্তফা দিয়ে—

না বলে থামতে পারলেন না ত্রিবেদী, আর তুমি?

—এর পর আপনার কাছে আমি নিশ্চয় চাকরি করব না!

ত্রিবেদী উঠে দাঁড়ান। ঘরময় পায়চারি করতে করতে বলেন, পাগলামি কর না অলক। মিস্টার কানোরিয়া—

বাধা দিয়ে অলক বলে, সে কথা আপনি আগেই বলেছেন। আমাকে ডবল মাইনে দেবার প্রস্তাবটা।

ত্রিবেদী দ্বিগুণ মাহিনার কথা বলেননি, কিন্তু তিনি এবার আর প্রতিবাদ করেন না। শান্ত হয়ে নিজের আসনে বসে বলেন, কী করবে স্থির করেছ?

—স্থির এখনও কিছু করে উঠতে পারিনি। যে মহিলাটির পরিচয় সংগ্রহ করে আমি তাঁর সঙ্গে আলাপ করেছি, সেই মহিলাটির জবাবের উপর অনেক কিছু নির্ভর করছে। হাজার-হাজার অজানা মহিলার নয়, আমি ঐ একটিমাত্র নারী-হৃদয়ের একটিমাত্র গোপন কথা শুনতে চাই। নিছক কৌতূহল নয়, আমি দেখতে চাই, তাকে আবার স্বাভাবিক করে তোলা যায় কিনা।

—মেয়েটি অস্বাভাবিক? কত নম্বর?

—হাঁা অস্বাভাবিক। নম্বরটা আপনাকে জানালেও লাভ নেই—কারণ তার রিপোর্টখানা আপনার দপ্তরে নেই। আমার কাছেই আছে তা—

ভ্রূকুঞ্চিত হয় ত্রিবেদীর। বলেন, ওয়েল, আমাকে আবার সেই প্রশ্নটিই করতে হচ্ছে অলক—কোন্ অধিকারে?

এবার আমি অধিকার-বহির্ভূত কিছু করিনি। টেকনিক্যালি সে রিপোর্টটি বাতিল হবার কথা। মেয়েটি আদ্যন্ত মিথ্যা কথা বলেছে। মিথ্যা যে বলেছে একথা সে স্বীকার করেছে আমার সঙ্গে আলাপ হবার পর।

boiRboi.net

ত্রিবেদী অনেকক্ষণ কী-যেন ভাবেন! তারপর বলেন, অলরাইট! তোমার সব কৈফিয়ৎ সন্তোষজনক বলে মেনে নিলাম আমি! আমি সব অভিযোগ প্রত্যাহার করছি।

অলক হেসে বললে, কিন্তু আমি যে আমার একটি অভিযোগও প্রত্যাহার করিনি ডঃ ত্রিবেদী।

—তোমার আবার কী অভিযোগ?

—প্রথম কথা আমি শ্রদ্ধা হারিয়েছি। আপনার এই সমীক্ষার উপর থেকে, আপনার উপর থেকে এবং আপনার পরবর্তী পরিকল্পনার উপর থেকে—

—আমার পরবর্তী পরিকল্পনা সম্বন্ধে তুমি কতটুকু জান?

—যতটুকু আপনি জানিয়েছেন। আপনি বিজ্ঞানের সাধনা করতে চান না—চাঞ্চল্যকর তথ্য-সমন্বিত একটা ঝাঁঝালো 'বেস্ট-সেলার' বাজারে ছাড়তে চান! যৌন-সমীক্ষার ইতিহাসে আপনি 'ইণ্ডিয়ান-কিনযে' হতে চান!

ত্রিবেদী হেসে বললেন, আমি চোখ মেলে দেখছি আমার সহকারীকে, অথচ কণ্ঠস্বর শুনছি আমার প্রতিযোগী অবনী মজুমদারের!

—সহকারী নয়, ডক্টর—প্রাক্তন সরকারী বলতে পারেন।

ত্রিবেদী নড়েচড়ে বসেন। আবার শুরু করেন, আমার কথা থাক, ডক্টর কিনযে, ডঃ স্টোপস্-এর যৌন-সমীক্ষা নর-নারীর সম্পর্ককে কি মধুরতর করে তোলেনি? এটাই কি তোমার ধারণা?

—আমি মনে করি—নরনারীর সম্পর্কটাকে বুঝবার জন্য ডঃ কিনযে বা ডঃ স্টোপস্ যা করেছেন—হাজার হাজার নারী ও পুরুষের যৌন-জীবনের শব-ব্যবচ্ছেদ করে, তার চেয়ে অনেক-অনেক বেশী করতে পেরেছেন কাউন্ট লিও টলস্টয় তাঁর অ্যানা ক্যারেনিনায়, করতে পেরেছেন রবীন্দ্রনাথ লাবণ্য চরিত্র রূপায়ণে, পেরেছেন শরৎচন্দ্র গৃহদাহের অচলা চরিত্র চিত্রণে!

—অ্যানা ক্যারেনিনা, লাবণ্য আর অচলা রক্তমাংসের জীব নয়। ওরা কথা-সাহিত্যের অলীক-কল্পনা!

—আমিও আবার সেই একই কথা বলব ডঃ ত্রিবেদী—ওরা তিনজনে আপনার হাজার হাজার বিবাহিতা মহিলার চেয়ে অনেক-অনেক বেশি বাস্তব—কারণ নারী-হৃদয়ের বাস্তব সমস্যাটা তাদের চরিত্রে আমরা ঠিকমত প্রতিফলিত হতে দেখেছি—তারা আমাদের ভাবতে শিখিয়েছে। ভালবাসা বা প্রেম—নন্দন-তত্ত্বের মূল আপনি ঐ সংখ্যাতত্ত্বের ব্যাপকতায় খুঁজে পাবেন না ডক্টর ত্রিবেদী—তাকে পেতে হবে গভীরতায়। 'এক'-এর মধ্যেই সত্যটাকে হয়তো কোনদিন খুঁজে পেতে পারেন;

boiRboi.net

'লক্ষ' রিপোর্ট হাতে আপনি 'এক'কে পাবেন না! 'লক্ষ' নয় 'এক'ই পৌঁছাবে মূল লক্ষ্যে!

আবার কিছুক্ষণ চুপ করে থাকলেন ত্রিবেদী। তারপর হঠাৎ বললেন, সত্যি কথাটা স্বীকার করবে অলক? অবনী মজুমদার কি তোমাকে চাকরির কোন অফার দিয়েছে?

—হ্যাঁ, দিয়েছিলেন।

—কত টাকা মাহিনা অফার করেছে সেটা জানাবে?

—আপত্তি নেই। বর্তমানে আমি যা পাই, তার অর্ধেক!

ত্রিবেদী ওকে আপাদমস্তক দেখে নিয়ে বললেন, তাহলে তোমার শেষ কথা—

—আজ্ঞে হ্যাঁ। আমি বিদায় নিতেই এসেছিলাম।

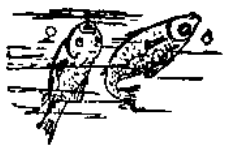

শর্মার ডায়েরিটা ওর হাত থেকে ফেরত নিতে নিতে অলক প্রশ্ন করল, সবটা পড়েছ?

মাথা নেড়ে সায় দিল করবী।

—খুব অদ্ভুত। নয়?

—হ্যাঁ। ভদ্রলোককে আমি দেখিনি—কিন্তু মনে হচ্ছে যেন আমার অনেক দিনের চেনা। আচ্ছা উনি তোমাকে ওঁর ঐ কথাটা কখনও বলেননি?

—কোন্ কথাটা? মায়ের কথা?

—না, ঐ যে উনি একটি মেয়েকে ভালবেসেছিলেন। বিবাহও স্থির হয়েছিল—তারপর একটা চরমতম মুহূর্তে মেয়েটিকে ওঁর 'মা' বলে ভ্রম হল?

—না। সে কথা ও মুখে কোনদিন বলেনি। ছেলেটা খুব চাপা-প্রকৃতির ছিল। আর এসব কথা মুখে বলাও যায় না—

—তা ঠিক।

দুজনেই কিছুটা নীরব। শেষে করবী প্রশ্ন করে, চাকরি তো ছেড়ে দিলে, এবার করবে কী?

boiRboi.net

—তুমি তো জান করবী, সেটা নির্ভর করছে তোমার উপর!

—আমার উপর? মানে?

—তোমার জবাবের উপর। সেদিন আমি যে শেষ প্রশ্নটা করেছিলাম, তুমি তার শেষ জবাবটা জানাওনি। সেটা জেনে নেবার পর আমি পরবর্তী পদক্ষেপের কথা চিন্তা করব।

করবী অনেকক্ষণ জবাব দেয় না। সে ভাবছে। মনস্থির করছে। তারপর বললে, তোমার প্রশ্ন একটা ছিল না, অলক; প্রশ্ন ছিল দুটো। এক নম্বর প্রশ্ন ছিল—কেন তোমাকে অতগুলো মিথ্যা কথা বলেছিলাম; আর দু-নম্বর প্রশ্ন ছিল —আমি···আমি নতুন বন্ধনে আবদ্ধ হতে রাজী আছি কিনা।

অলক বললে. বেশ। মেনে নিলাম। প্রশ্ন দুটোই ছিল।

—তোমার প্রথম প্রশ্নের কৈফিয়ৎ আমি দেব; আর দ্বিতীয় প্রশ্নের জবাবে জানাচ্ছি যে, আমি রাজী নই।

অলক বলে, পীড়াপীড়ি করবার অধিকার আমার নেই—কেন তুমি গররাজী তাও জানতে চাওয়া শোভন নয়। বলতে তুমি বাধ্য নও; কিন্তু করবী, তুমি বলতে চাইলেই যে শুনতে আমি বাধ্য তা-ও তো ঠিক নয়। এক্ষেত্রে প্রথম প্রশ্নের জবাব আমি শুনব না।

করবী চমকে ওঠে। বলে, মানে? কেন তোমাকে মিথ্যা বলেছিলাম, কী আমার অসুখ, তা শুনবে না তুমি? জানতে চাও না?

—না। কোন্ অধিকারে শুনব? ডাক্তারকে যদি তুমি আগেই শুনিয়ে রাখ, মশাই আপনাকে দিয়ে চিকিৎসা আমি করাবো না, তবে আমার উপসর্গগুলোর কথা শোনাব—সে রাজী হবে?

করবী ভাবনায় পড়ল। তারপর বললে, আমার মনে হয় সেটা শুনলেই তুমি বুঝতে পারবে কেন আবার আমি বিয়ে করতে রাজী নই।

—হয়তো শুনলে তা আমি বুঝব। তাতেই বা কী চতুর্বর্গ লাভ হবে আমার? শেষের কবিতার শেষ কবিতায় অমিট্রায়ে সান্ত্বনা পেয়েছিলে কি না তার তো কোন প্রমাণ নেই। তোমাকে আমি ভালবেসেছিলাম—এর আগে এভাবে আর কোন মেয়েকে এমনভাবে চাইনি! তুমি আমার প্রেমকে প্রত্যাখ্যান করলে—এইটুকুই যথেষ্ট; কেন করলে সেটা আমাকেই ভেবে নিতে দাও না করবী। শোভনলালের কাহিনীটা আমি নাই শুনলাম?

—শোভনলাল! মানে?

—যে তোমারে 'দেখিবারে পায় অসীম ক্ষমায়, ভালমন্দ মিলায়ে সকলি।'

boiRboi.net

করবী ওর হাতটা চেপে ধরে, না, অলক, না। আমার জীবনে দ্বিতীয় কোন অমিত রায়, দ্বিতীয় কোন শোভনলালের ভূমিকা নেই। এসব কাব্য-কথা নয়, জৈবিক কাণ্ডকারখানা।—প্লীজ অলক, আমাকে বলতে দাও। কে জানে, হয়তো তুমি সব কথা শুনে আমাকে ঠিকমত পথের সন্ধান দিতে পারবে। আমি হয়তো স্বাভাবিক হয়ে উঠব, সার্থক হয়ে উঠব—ঠিক যেভাবে নোয়ামিকে বাঁচিয়ে তুলেছ তোমরা।

অলক পকেট হাতড়ায়। সিগারেট খোঁজে। বলে, বেশ, শোনাও।

করবী বলে, তুমি ঠিকই আন্দাজ করেছিলে—এ আমার নারীত্বের অপমান। তাই আমার এত সঙ্কোচ, এত লজ্জা। কিন্তু আজ মনে হচ্ছে পারব। ঐ ভদ্রর শর্মার ডায়েরিটা আমাকে পথ দেখিয়ে দিয়েছে। হয়তো সব কথা খুলে বলতে পারব। একে একে আমার সব রহস্য তোমার কাছে সহজ সরল হয়ে যাবে। জানতে চেয়েছিলে—কেন আমি মা হতে পারিনি? দোষটা কার—আমার, না জিতেনের? কেন ডাক্তার দিয়ে আমরা নিজেদের পরীক্ষা করাইনি। কেন জান? উড য়ু বিলীভ মি, অলক, আফটার সেভেন ইয়ার্স অব ম্যারেড লাইফ—আ'য়াম··· আ'য়াম ইয়েট এ ভার্জিন!

অলকের দেশলাই কাঠিটা নিভে যায়। সে সোজা হয়ে বসে।

—বিশ্বাস করা শক্ত, নয়? একই বাড়িতে বাস করে স্বামী-স্ত্রী, একই ঘরে শোয়—অথচ সেই বিবাহিতা নারী আজও কুমারী!

—হ্যাঁ, বিশ্বাস করা শক্ত বইকি।—বললে অলক। সিগারেটটা সে ধরিয়েছে এতক্ষণে। কাঠিটাকে অ্যাশট্রেতে ফেলে প্রশ্ন করল, জিতেন্দ্রনাথ পীড়াপীড়ি, রাগারাগি করেনি?

—করেছে। মতান্তর থেকে মনান্তর, ঝগড়া থেকে মর্মান্তিক প্রহার! সব কিছুই হয়েছে! আমি জিতেনকে দোষ দেব না। দোষ আমার, সম্পূর্ণ আমার। আমি যে এমন সৃষ্টিছাড়া জীব তা কি বিয়ের আগে নিজেই জানতাম ছাই? যখন জানলাম তখন পালাবার আর পথ নেই। জিতেন শেষ পর্যন্ত তার জৈবিক ক্ষুধা অন্যত্র মিটিয়ে আসতে শুরু করল। গোপনে নয়, আমাকে জানিয়েই। আমার রাগ-অভিমান তো হলই না—নিশ্চিন্ত হলাম।

—তাহলে এই বিবাহ-বন্ধনের জের কেন টেনে চলতে রাজী হলেন জিতেন্দ্রনাথ?

—বিবাহ-বিচ্ছেদের কথা উঠেছিল। ওই তুলেছিল। আমি তো এক কথায় রাজী; কিন্তু সোসাল স্ক্যাণ্ডালের ভয়ে জিনিসটা আর অগ্রসর হয়নি। ওর জৈবিক

boiRboi.net

ক্ষুধা অন্যত্র মিটিয়ে নেবার ব্যবস্থা হবার পরে ডিভোর্সের কথাটা আর নূতন করে ওঠেনি। ও সপ্তাহে তিন-চার রাত বাইরে কাটাতো—চাকরির প্রয়োজনে। প্লেন নিয়ে ওকে যেতে হত নানান জায়গায়। এগানে তার দরকার একজন পরিচারিকা—গ্লোরিফায়েড মেড-সার্ভেন্ট। যে শুধু ওর হেড-কোয়ার্টার্সটার দায়িত্বই নেবে না—ওর ইন্সিওরেন্সের প্রিমিয়াম মেটাবে, ইন্‌কাম ট্যাক্সের হিসাব করে দেবে—বন্ধু-বান্ধবীদের অভ্যর্থনা করে সামাজিক মর্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখবে। ফলে···

—বুঝলাম। অর্থাৎ নীরদ মুস্তাফির আঁকা জিতেন্দ্রনাথ-করবীর সঙ্গে বাস্তবের কোন সম্বন্ধ নেই, কেমন?

—আমি কিন্তু কোনদিনই ওকে দোষারোপ করিনি। মাঝে মাঝে অবশ্য ও খুবই আঘাত দিত—কিন্তু বেচারির দোষ নেই। ও আমাকে আদর করে নাম দিয়েছিল 'ফ্রিজ'। ঐ নামেই আমাকে ডাকত জনান্তিকে—

—'ফ্রিজ!' তার অর্থ?

—ইংরাজি 'ফ্রিজিড' শব্দটার সংক্ষিপ্তরূপ। আমি কোন কিছুতেই তাতি না, তাই। অভিযোগটা তো মিথ্যা নয়। আমার কোন যৌন অনুভূতি নেই—

প্রতিবাদ করে ওঠে অলক। বলে, আমি বিশ্বাস করি না। সেদিন রাত্রে আমি যখন তোমাকে—

—ও! চুমো খাওয়া? না, সেটার কথা বলছি না আমি। হ্যাঁ, ঐ পর্যন্ত আমারও ভাল লাগে; কিন্তু তার চেয়ে আর এক পাও অগ্রসর হতে পারি না। গায়ের জামায় হাত পড়লেই আমি আড়ষ্ট হয়ে যাই। একবার জোর করে জিতেন আমার ব্লাউজ ছিঁড়ে ফেলেছিল! আমি চীৎকার করে উঠেছিলাম। ওকে কামড়ে দিয়েছিলাম।

করবী চুপ করে। অলক লক্ষ্য করে দেখে ওর চোখ দুটো জলে ভরে উঠেছে। বললে, কোনও সাইকিয়াট্রিস্টকে দিয়ে দেখাওনি?

—দেখিয়েছিলাম। ও-ই ব্যবস্থা করেছিল। দশ-পনেরটা সিটিং দিয়েছিলাম—কোনও উপকার পাইনি—মনস্তত্ত্বের ডাক্তারবাবু বলেছিলেন, আমি একটি ব্যতিক্রম। এমন রুগী হাজারে একটি আসে। আমার মনের গভীরে নাকি কী-একটা লুকিয়ে আছে।

—সেটা কী, তা উনি খুঁজে পাননি?

—না। কারণ, আমিই তাঁকে ঠিকমত পথের সন্ধান দিতে পারিনি। তখনও আমি বুঝতে পারিনি—

—তার মানে? তুমি এখন জান ব্যাপারটা কী?

boiRboi.net

—গতকাল পর্যন্ত জানতাম না। এখন মনে হচ্ছে বোধহয় বুঝতে পেরেছি। ঐ ডক্টর শর্মা জীবন দিয়ে আমাকে সে ইঙ্গিত দিয়ে গেছে!

উৎসাহে অলক চেপে ধরে করবীর হাতখানা, কী ইঙ্গিত দিয়েছে?

—ডঃ শর্মার সঙ্গে আমার সমস্যাটার খানিকটা মিল আছে। এখন মনে হচ্ছে আমার এই মনোবিকলনের মূলেও আমার মা!

—তোমার মা! মানে?

—অনেক অনেকদিন আগে, জানলে, তখন আমার বয়স সাত-আট বছর! আমার জীবনেও ঐ রকম একটা মর্মান্তিক ঘটনা ঘটেছিল! সেটার কথা মনেই ছিল না আমার। আজ হঠাৎ মনে পড়ে গেল। ঐ ডায়েরিটা পড়তে পড়তে—

—কী ঘটেছিল?

—ঠিক কী ঘটেছিল তা আজ আর স্পষ্ট মনে পড়ে না। তবে সে সময় আমি এসব কিছুই বুঝতাম না। মাত্র সাত-আট বছরের বাচ্চা মেয়ে। এখন একটু-একটু করে মনে পড়ছে। আমাদের পাশের বাড়ির একটি ছেলের সঙ্গে আমার খুব ভাব ছিল। একবয়সী, বোধ করি সে আমার চেয়ে দু-তিন বছরের বড় ছিল। একদিন দুপুরে সে আর আমি কী-একটা কুকীর্তি করছিলাম—'কুকীর্তি' শব্দটা ব্যবহার করছি আজকের আমার ধারণা অনুসারে—সেদিন সেটাকে আমি চুরি করে আমের আচার খাওয়ার চেয়ে গুরুতর কিছু বলে মনে করিনি। সেই ছেলেটির কথা জানি না, অন্তত আমার মনে কোন পাপবোধ ছিল না। মা দেখতে পায়। মায়ের ছিল চণ্ডালে রাগ। আমাকে এমন প্রহার করে যে আমার কাপড়-চোপড় নষ্ট হয়ে যায়—আমি অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলাম। আর কিছু মনে পড়ে না—এখন মনে হচ্ছে হয়তো তারপর থেকেই আমি এই রকম অস্বাভাবিক হয়ে যাই—যেমন রাতারাতি বদলে গিয়েছিলেন ডঃ শর্মা! সে ঘটনার কথাটা ভুলে গিয়েছিলাম—কিন্তু তার পরবর্তী ঘটনাগুলোর কথা মনে আছে। কিশোরী বয়সে, যুবতী অবস্থায় গল্পে-উপন্যাসে দৈহিক-মিলনের বর্ণনা পড়তে গেলেই আমার হাত পা আড়ষ্ট হয়ে যেত—আমি পাতা উল্টে যেতাম!

অলক বললে, করবী, আমার দৃঢ় বিশ্বাস—তুমি তোমার রোগের মূল ঠিকই খুঁজে পেয়েছ। ঐ ঘটনাতেই তোমার মনের উপর এমন একটা ছাপ পড়ে, যাতে স্বাভাবিক দাম্পত্য-জীবনে তুমি অংশ নিতে পারনি। ফিয়ার কমপ্লেক্স! আমি বুঝতে পারছি—এই ব্যাপারটা তোমার কাছে অত্যন্ত লজ্জাকর মনে হয়েছে; তাই সেটা চাপা দিতেই আমাকে সেদিন এক ঝুড়ি মিথ্যা কথা বলেছিলে, শুধু জিতেন্দ্রনাথ নয়, ক্যাপ্টেন বসাককেও···

BanglaBook.org

—ক্যাপ্টেন বসাকের ক্ষেত্রেও আমার একই অভিজ্ঞতা হয়েছিল। সে অগ্রসর হলেই আমি পিছিয়ে আসতাম। সেও জেনে গেছে—আমি করবী নই, আমি 'ফ্রিজ' !

—হয়তো সেইটা তোমার চেতন-মন মেনে নিতে রাজী নয় বলেই তুমি আমাকে মিথ্যা করে বলেছিলে ক্যাপ্টেন বসাকের সঙ্গে তোমার—

—এখন তাই মনে হচ্ছে বটে !

—কিন্তু এ জন্য আবার বিবাহ করবে না কেন তুমি ? অসুখ অসুখই। সেটাকে সারিয়ে তুলতে হবে—

—না অলক ! যদি না সারে ? আমি যে দেখেছি সেটা কী ভীষণ যন্ত্রণাদায়ক, আমার এবং আমার স্বামী জিতেন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে।

—আমি জিতেন্দ্রনাথ নই করবী, আমি অলক রায় !

—সব পুরুষমানুষই একরকম। চিনতে আমার বাকি নেই—

—বাকি আছে ! আমার দৃঢ় বিশ্বাস, আমার ক্ষেত্রে অন্যরকম হবে—

—হবে না। আমি তো আমাকে চিনি !

—না। তুমি তোমাকে চেন না—

হঠাৎ রোখ চেপে যায় করবীর। উঠে দাঁড়ায়। হন্‌হন্ করে এগিয়ে যায়। দরজাটা ঠেলে বন্ধ করে। জানলার পরদাটা টেনে দেয়। অলকের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে বলে, দেন ট্রাই দ্যাট ! চেষ্টা করে দেখ···

অলক হাসে। সেও উঠে দাঁড়ায়। এক হাতে ঠেলে দেয় করবীকে। এগিয়ে যায়। দরজাটা খুলে দেয়। জানলার পরদাটা সরায়। এক মুঠো জ্যোৎস্না অপেক্ষা করছিল বাইরে। হুড়মুড়িয়ে ঘর ঢোকে। অলক করবীর বাহুমূল ধরে তাকে বসিয়ে দেয় ওর সামনে। বলে, না করবী ! তুমি 'চ্যালেঞ্জ' করলে তো পারব না। তোমাকে 'কো-অপারেট' করতে হবে ! সাহায্য করতে হবে—

দাঁত দিয়ে নিচের ঠোঁটটা কামড়ে ধরে করবী বলে, না হয় সে চেষ্টাই করব। কিন্তু দরজা-জানলা খুলে দিলে কেন ?

—'এখনও আমার সময় হয়নি' !

—তার মানে ?

—আজ নয়। আজ তুমি তৈরী নও। তোমাকে তৈরী করতে হবে। করব আমিই। তবে অনেক-অনেক সময় দরকার করবী। অপেক্ষা করতে হবে। তোমাকে এবং আমাকে।

boiRboi.net

—আমি তো তৈরীই—না হলে নিজে হাতে দরজা বন্ধ করব কেন ?

—না। তুমি প্রস্তুত নও। যে কথা আজ সকালে ডঃ ত্রিবেদীকে বলেছি, সেই কথাই আবার বলি। নারী নদীর মতই। কিশোরী অবস্থায় সে ঝরনা, তারপর সে ক্রমে ফুলে-ফেঁপে ওঠে—ভাদ্রের ভরা গঙ্গার রূপ নেয়—হয়তো সাগর-সঙ্গমেই তার পরিসমাপ্তি—কিন্তু সেখানে পৌঁছবার আগে ঘাটে-ঘাটে পারের কড়ি মেটানো হচ্ছে কিনা, সেটা তাকে দেখে আসতে হয়। দীর্ঘ পদযাত্রা! এমনকি মনুষ্যেতর জীবেরও প্রয়োজন হয় কিছুটা প্রাক্‌মিলন শৃঙ্গার —যাকে জীব-বিজ্ঞানীরা বলেছেন সেকেণ্ডারী সেক্সুয়াল বিহেভিয়ার!, মানব সভ্যতা যাকে বলেছে—প্রেম, বলেছে ভালবাসা। জয়ের মুকুট তুমি নিজে হাতেই আমার মাথায় একদিন পরিয়ে দেবে—কিন্তু জয়ের মূল্যও আমাকে দিতে হবে বৈকি, ধৈর্য ধরে।

—অর্থাৎ আমার মুক্তির দ্বিতীয় কোন রাস্তা নেই ; তোমাকে বিবাহ করা ছাড়া ?

—এতক্ষণে একটা বুদ্ধিমতীর মত কথা বলেছ করবী !

করবীর হাতখানা ও তুলে নেয় !

বছর দেড়-দুই পরের কথা।

বর্ষণ-ক্ষান্ত রৌদ্রকরোজ্জ্বল একটি শারদ মধ্যাহ্ন। নিরবচ্ছিন্ন একটানা বর্ষার পর আজ মেঘের কোলে রোদ হেসেছে। পূর্ব-আকাশে পাল-তোলা নৌকার মত স্তূপাকার সাদা মেঘের সম্ভার। উৎসব সাজে সেজেছে লালগড় কেমিক্যাল ওয়ার্কস্-এর জি. এম.-এর বিরাট বাঙলোটা। বাড়ির সামনেটায় প্রকাণ্ড একটা সামিয়ানা খাটানো। প্রবেশপথে বিচিত্র-দর্শন তোরণের উপর নহবৎখানা। প্রাচীনপন্থীই বল আর যাই বল, ত্রিদিবেশ ঐ আধুনিক কায়দায় লং-প্লেইং রেকর্ডে আলি হোসেনের বাজনা শোনাতে রাজী হননি। বায়না দিয়ে এনেছেন সানাইওয়ালা।

ইতস্তত ছড়ানো-ছিটানো সোফা-কৌচ চেয়ার। অন্তত দু-তিনশ' সুবেশ নিমন্ত্রিতে আসর গমগম করছে। এখনও গাড়ি আসছে—পার্কিং-জোনে গাড়ি রেখে উপহার-হাতে এগিয়ে আসছেন উচ্চচূড় বেনারসীর পুঁটলি—এক-গা জড়োয়া-গহনা পরে, এবং পিছন-পিছন আজ্ঞাবহ ওয়ার্স-হাফ। হাত তুলে নমস্কার করছেন—ভীড়ে মিলিয়ে যাচ্ছেন।

উর্দিআঁটা খিদমদ্‌গারদলের ছোটাছুটির অন্ত নেই—কোক্-কফি-চা-আইসক্রিম। প্যাণ্ডেলের ভিতরে টেবিলে স্তূপাকৃত নানান ভোজ্য দ্রব্য—একপাশে আমিষ, একপ্রান্তে নিরামিষ। 'বুফে' বন্দোবস্ত। যথা ইচ্ছা তুলে নাও প্লেটে।

—আর একটু চিকেন-লীভার নিন মিস্টার খাডানি—

—আপনি কিছুই খাচ্ছেন না, মিসেস গুরুবক্সানি, ও কি, ফিশ-রোলটা ডিঙিয়ে গেলেন কেন?

—একি! আপনি এখনই প্লেট নামিয়ে রাখছেন যে? রান্না ভাল হয়নি বুঝি—

যাঁদের বলা হচ্ছে তাঁরা লালগড় উপনিবেশের উচ্চমহলের ধনুর্ধরেরা—অথবা তাঁদের ধর্মপত্নীর দল—সেই যাঁদের দেড়-দু বছর পূর্বে প্রশ্ন করা হয়েছিল, 'প্রাক-বিবাহ কিম্বা বিবাহোত্তর জীবনে আপনি কি স্বামী ভিন্ন ···' থাক! আজকের এই শুভদিনে ওসব অবান্তর অপ্রিয় কথা নাই বা তুললাম। ওহো! আসল কথাটাই বলা হয়নি। এ উৎসবের উপলক্ষ্যটা।

ডঃ ত্রিদিবেশ ব্যানার্জির দৌহিত্রের আজ অন্নপ্রাশন।

ত্রিদিবেশ যেন ধন্য হয়ে গেছেন। রত্না দেবীও তাই। কারণ তাঁদের জামাই তাঁদের সনির্বন্ধ অনুরোধটা এবার রেখেছে। যদি জিদ ধরতো—না, কলকাতাতে অনাড়ম্বর অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে এই অন্নারম্ভের অনুষ্ঠানটা সারতে হবে, তাহলেই বা ঠেকাতো কে? মেয়ে? সে তো এখন অন্য জগতের মানুষ। মেয়ে হয়তো মুখের উপর বলে বসত, সারা জীবন যে ছেলে সাদা-মাটা ডাল-ভাত খাবে তার অন্নারম্ভটা এমন 'চিকেন-লীভার' দিয়ে শুরু করতেই হবে—এর মানে কী? পারে, শমু তা-ও বলতে পারে আজকাল। মায়ের অনুরোধে আজ না হয় ক্রেপ-বেনারসীটা পরেছে—কিন্তু কলকাতায় ওদের সংসারে গিয়ে দেখে এসেছেন তো। সে এক স্বেচ্ছা-কৃচ্ছ্রসাধন। ত্রিদিবেশের কোনও আর্থিক সাহায্য নিতে ওরা স্বীকৃত হয়নি।

ত্রিদিবেশ প্রথমটা প্রচণ্ড ক্ষেপে গেলেও পরে অনুতপ্ত হয়েছিলেন এবং সব চেয়ে বড় কথা তিনি খুশিও হয়েছিলেন এতে। যা কিছু আছে তাঁর—তা তো ওদেরই জন্যে। তবু ছেলেটা যে রুখে দাঁড়িয়েছিল, এবং মেয়েটাও যে তার পাশে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল—এতদিনে সেজন্য একটা গর্বই অনুভব করেন।

boiRboi.net

শ্যামলীর বাচ্চাটা কোল থেকে কোলান্তরে যাচ্ছে। কী সুন্দর হয়েছে দেখতে —ঠিক বাপের মত, চোখটা আবার মায়ের পেয়েছে।

শমু আজ গরবিনী। পুত্রগর্বে। রঙিন প্রজাপতি যেমন ফুল থেকে ফুলে উড়ে বেড়ায়, শমু তেমনি আসরের এ-প্রান্ত থেকে ও-প্রান্তে সকলের তদ্বির করে বেড়াচ্ছে।

—ঐ তো প্রমীলাদি এসে পড়েছেন, আসুন প্রমীলাদি।

পি. আর. ও. মিস্টার দাশগুপ্ত সস্ত্রীক আগিয়ে আসেন। প্রমীলা দেবী প্রকাণ্ড একটা কাঠের ঘোড়া এনেছেন সঙ্গে করে।

আসরের ও-প্রান্তে বসেছে একটা জটলা।

লালগড় হাসপাতালের ডাক্তার আয়াঙ্গার বলছিলেন, মিস্টার মেহ্‌রা কবে ফিরলেন ওয়েস্ট জার্মানি থেকে? কেস মিটল আপনার?

—মিটেছে। ফিরেছি আজ দিনদশেক। আমরাই জিতেছি কেসে।

—ভেরি গুড!

—আপনার কন্যাটিকে দেখছি না যে?

—কে, কেটি? না, ও তো কলকাতায়। কলেজে পড়ছে।

—মিসেস আয়াঙ্গার আসেননি?

মিসেস নোয়ামি আয়াঙ্গার পিছন থেকে এগিয়ে এসে ভারতীয় কায়দায় হাত দুটি জোড় করে বলেন, মেহ্‌রা-সাহেব কি জার্মানীতে চোখ দুটি গচ্ছিত রেখে এসেছেন?

আর একটু এগিয়ে আর একটা দল। মিসেস গুরুবক্সানি প্রশ্ন করেন, যশোবন্ত কাপুরের খবর জানেন কেউ?

মিস্টার থাপার বলেন, মাসছয়েক আগে জানতাম সে কানপুরে আছে।

—আবার বিয়ে করেনি?

—শুনিনি সে রকম কিছু।

সরমা দেবী প্রমীলাদিকে প্রশ্ন করেন, আপনার স্বামীর সেই বন্ধুটির ছবি কবে রিলিজ হবে?

প্রমীলাদি আচমকা ধরতাইটা ধরতে পারেন না, তারপর বলেন, কে? সেই মোহন দত্তর? কী জানি, শুনিনি কিছু। ছবি আদৌ তুলছে কিনা সন্দেহ আছে আমার।

রমলা বললে, আমার কিন্তু একটুও সন্দেহ নেই প্রমীলাদি। লোকটা এক নম্বরের চালবাজ!

বিজলী বললে, প্রথম দিন দেখেই আমার মনে হয়েছিল লোকটা সুবিধের নয়। তোমায় বলিনি সরমাদি?

boiRboi.net

সরমার সে কথা আদৌ মনে পড়ে না। বলে, আমি তো জানতামই।

দেখা গেল সরমা-রমলা-বিজলীরা সকলেই বুঝতে পেরেছিল লোকটা চালবাজ —এক নম্বরের লোচ্চা! চরিত্রহীন! তাই ওরা সবাই তাকে এড়িয়ে চলত। পাত্তা দিত না।

—এই শোন! একটা জরুরী কথা আছে।

প্রণবের ডাকে শ্যামলী দাঁড়িয়ে পড়ে, কী?

—এপাশে সরে এস! আড়ালে বলব।

শ্যামলী একটু আড়ালে সরে এসে নবরত্নের জড়োয়া দুল-সমেত কানটা বাড়িয়ে দেয়। প্রণব তার কর্ণমূলে বলে, তোমাকে আজ ভারি সুন্দর দেখাচ্ছে।

শ্যামলী চোখ পাকায়। কিছু বলবার আগে দেখে গেট দিয়ে ভিতরে আসছে করবী আর অলক। ওরা এখন লালগড়ের বাসিন্দা নয়। থাকে মোহনপুরে। অলক সেখানে কলেজে পড়ায়! ওদের দেখতে পেয়ে শ্যামলী ছুটে এসে করবীকে একেবারে জড়িয়ে ধরে। বলে, তুমি যে শেষ পর্যন্ত আসবে করবীদি আমি ভাবতেই পারিনি। স্টেশন থেকে সোজা আসছ তো? তোমার মালপত্র?

—না। আমরা 'আপ্যায়নে' উঠেছি। কাল সন্ধ্যাবেলায়।

শ্যামলী ঠোঁট উলটে বলল, তোমার সঙ্গে কথাই বলব না।

করবী ওর কানে-কানে বললে, কলকাতায় যখন যাব তোমাদের বাড়িতে উঠব শমু। ছোট খাটে গুঁতোগুঁতি করে শোব, তোমার বরকে সরিয়ে। তুমি নিজে হাতে রেঁধে খাওয়াবে! দেখব, কেমন রাঁধতে পার।

—আসতে হবে কিন্তু। কথা দিলে তো? তা 'আপ্যায়নে' কেন, গেস্ট-হাউসেও উঠতে পারতে—

করবী বললে, আইডিয়াটা তোমার অলকদার। ও বললে, আগে চল 'আপ্যায়নে' দেখি আমার সেই ডবল্-বেড রুমটা খালি আছে কিনা; থাকলে ঐ ঘরেই উঠব। সে ঘরেই উঠেছি।

করবী ওকে বলল না—অলক তার নিজের সেই বিছানাতেই কাল রাত্রে শুয়েছে। আর তার পাশের খাটে শুয়েছিল করবী; আর ডানলোপিলো বালিশে মুখ গুঁজে মনে-মনে বলেছিল—ডক্টর শর্মা! তোমাকে একটা কথা আজ চুপি চুপি বলছি! এই বালিশে মাথা রেখে একদিন তুমি ছটফট করেছ!···আমি···আমি তোমাকে সহানুভূতি জানাতে এসেছি। তুমি ভুল করেছিলে ডক্টর শর্মা! এই পৃথিবীটা সুন্দর। তুমি অভিমান করে ভুল করেছিলে! তোমার আত্মা শান্তি লাভ করুক। মাকে তুমি ক্ষমা কর, কেমন? মা তোমাকে পেটে ধরেছিল!

সে বড় কষ্ট ডক্টর শর্মা! তুমি গাইনকলজিস্ট হলে কী হয়। তুমি তা জান না··· মা হবার যন্ত্রণা···মা হবার আনন্দ!

হঠাৎ শ্যামলী দেখতে পায় ডঃ অবনী মজুমদার এসে গেছেন।

—এক মিনিট করবীদি! ডঃ মজুমদার আসছেন—

শ্যামলী ও-দিকে এগিয়ে যায়। সঙ্গে সঙ্গে আসে নোয়ামি! বলে, তোমার সঙ্গে একটা কথা ছিল করবী।

—বলুন।

কিন্তু নোয়ামির কথাটা আর বলার সময় হয় না। তার আগেই প্রমীলাদি এগিয়ে আসেন। বলেন, করবী যে? কেমন আছ?

—ভালই।

—তুমিও চাকরি করছ শুনলাম?

—করছিলাম। এখন ছুটিতে—

—ডঃ ত্রিবেদীর নতুন বইখানা পড়েছ?

—হ্যাঁ পড়েছি। আপনার কী মনে হয়েছে?

—পর্নোগ্রাফিক লিটারেচার! যত্ত সব বাজে কথা লিখেছেন ভদ্রলোক! আমাদের এই লালগড় সম্বন্ধে কী লিখেছেন দেখেছ? ওঁর সেই মারাত্মক প্রশ্নের জবাবে নাকি এখানকার মহিলারাই সবচেয়ে বেশি সংখ্যায়···

—কোন্ প্রশ্নটার কথা বলছেন?

—তোমার কর্তাকে জিজ্ঞাসা কর। সবটা আমার মুখস্থ নেই। 'সেই যে —'প্রাক-বিবাহ কিংবা বিবাহোত্তর জীবনে স্বামী ভিন্ন···'

—ও অপ্রিয় আলোচনাটা অন্তত আজকের দিনটায় বাদ দিন না মিসেস দাশগুপ্তা?

প্রমীলা দেবী ঘাড় ঘুরিয়ে দেখেন ডঃ অবনী মজুমদার কখন এসে দাঁড়িয়েছেন তাঁর পাশে।

করবী একটু সরে এসে নোয়ামিকে জনান্তিকে টেনে নিয়ে বললে, আপনি কী একটা কথা বলবেন বলেছিলেন যেন?

নোয়ামি ওর হাতটা তুলে নিয়ে বললে, করবী! কথাটা গোপন। আমি জানি যে, তুমি জান। আমাদের সব কথা। তোমার স্বামীর কাছে আমি কৃতজ্ঞ। তোমরা দুজন 'আপ্যায়ন' ছেড়ে আমাদের বাড়িতে চলে এস। এখন তো আমরা বি-টাইপ কোয়ার্টার্স পেয়েছি। চারখানা বেডরুম। ক'দিন আমাদের কাছে থাক। তোমার স্বামীও আমার স্বামীর—

boiRboi.net

করবী বললে, তাহলে আমিও একটা গোপন কথা বলি মিসেস আয়াঙ্গার। আমি জানি যে, তুমি জান না। আমার সব কথা! তোমার স্বামীর কাছে আমি এবার কৃতজ্ঞ হতে চাই—

—আই ডোন্ট ফলো—

—অতবড় গাইনোকলজিস্ট আমি কোথায় পাব পাড়াগাঁয়ে? ওঁকে দিয়ে আমি একবার আমাকে পরীক্ষা করাতে চাই। ত্রিশ বছরে ফার্স্ট কনফাইনমেন্ট তো! এতটা বয়েসে—

নোয়ামি ওকে জড়িয়ে ধরে, ওমা সত্যি! হাউ গ্লোরিয়াস! তুমিও তাহলে মরেছ এই বুড়ি বয়েসে; আমার মতো?

—তোমার মতো?

—হ্যাঁ। এই সাঁইত্রিশ বছর বয়সে। আঠারো বছর বাদে! তবে আমারও ঘাবড়াবার কিছু নেই। আমার চেয়েও বয়স্কা একজন আমারই মতন ঝুলছেন! আমরা পাশাপাশি তিনটি কেবিন নেব! আমরা তিনজনই ডঃ আয়াঙ্গারের পেশেন্ট!

—সেই তিন নম্বর ভাগ্যবতীটি কে? আমি চিনব?

—তুমি তাঁকে দেখনি। পরিচয়ে চিনবে। আমার সেই প্রাক্তন প্রতিবেশীর ধর্মপত্নী। মিসেস রঙ্গচারী!

হেসে ফেলে করবী। বলে, তোমার কর্তা আর আমার কর্তা নিজেদের বলতো 'থি মাস্কেটিয়ার্স'। তাহলে আমরা তিনজন কী নোয়ামি?

—আমরা লালগড়ের লাল-ত্রিকোণের তিনটি সাকসেসফুল কোণ। 'থ্রি মিউটিনাস্ মাদার্স!' লেট লাল-ত্রিকোণ বি ব্লোন্, অ্যাওয়ে ফ্রম আস—টু দ্য 'হ্যান্ড-নটস্'।

কুলু ব্যক্তিগত পাঠাগার
www.Banglaclassicbooks.blogspot.in